আমার সৈনিক জীবন

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

মে. জে. মনজুর রশীদ খান (অব.)

মনজুর রশীদ খান এ বইয়ে তাঁর সৈনিক জীবনের ঘটনাপরম্পরা তুলে ধরেছেন সরস ঘরোয়া ভঙ্গিতে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি ক্যাডেটদের কঠোর জীবন, একাত্তরের ২৫ মার্চের আগে ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বাঙালি সেনাদের অবিশ্বাসের চোখে দেখা, তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত হয়রানিমূলক নানা ব্যবস্থা, পাকিস্তানে আড়াই বছরের বন্দিজীবন শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে তাঁর যোগদান, ১৯৭৫ সালে সেনাবাহিনীতে সৃষ্ট গোলযোগে উচ্ছৃঙ্খল সেনাসদস্যদের নিয়ন্ত্রণে তাঁর ভূমিকা, প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান-পূর্ব এবং পরবর্তীকালের কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্যে সমৃদ্ধ এ বই। পাশাপাশি জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনামল, সামরিক সচিব হিসেবে তাঁর দেখা রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক নানা ঘটনা এবং নব্বুইয়ের এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন, তাঁর পদত্যাগ, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের শাসনাধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন এবং পরবর্তীকালে উদ্ভূত জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রায় অনুপুঙ্খ বিবরণও লেখক তুলে ধরেছেন। ফলে এ বই হয়ে উঠেছে দেশের দীর্ঘ এক কালপর্বের সামরিক-রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসের অঙ্গীভূত অংশ।
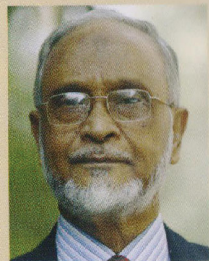
আলোকচিত্র : সাহাদাত পারভেজ

মনজুর রশীদ খান

জন্ম ১৯৩৯ সালে বর্তমান গাজীপুর জেলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোট রণাঙ্গনে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ। ১৯৭১ সাল থেকে প্রায় আড়াই বছর পাকিস্তানে অন্তরীণ জীবনযাপন। ১৯৭৩ সালে দেশে ফিরে মেজর হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ রাইফেলস ও সেনা সদর দপ্তর, দুটি আর্টিলারি ও পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন। ১৯৮৬ সালে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার প্রধান হিসেবে যোগদান। প্রথমে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ এবং পরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সামরিক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৯০ সালে এরশাদ-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। অবসর গ্রহণ ১৯৯৫ সালে। প্রকাশিত গ্রন্থ *এরশাদের পতন ও সাহাবুদ্দীনের অস্থায়ী শাসন : কাছে থেকে দেখা* ইত্যাদি।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

আমার সৈনিক জীবন : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪২২, জুলাই ২০১৫
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪১৮, ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৫৫০ টাকা

Amar Sainik Jiban : Pakistan Theke Bangladesh
by Manzur Rashid Khan
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8110081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 550 only

ISBN 978 984 33 3879 2

উৎসর্গ

মরহুম আবদুর রশীদ খান
মরহুমা কুরসিয়া বেগম
আমার মা-বাবা

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

১৯৯১ সাল। মাস ও তারিখের কথাটা এখন আর মনে নেই। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (১৯৯০) অধীনে সাধারণ নির্বাচন তখন হয়ে গেছে। নির্বাচনী ফলাফলে বিএনপি বিজয়ী হয়। পরাজিত হয় আওয়ামী লীগ। দেশে তখনো রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা বহাল। এ নিয়ে চলছে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক। আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থার পক্ষে বিএনপি। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। সেই উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে রাজপথের বিক্ষোভ বা মিছিলে।

এ রকম উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের প্রেস সচিব, আমাদের সংবাদপত্র জগতের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব তোয়াব খান একদিন হঠাৎ করেই আমাকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানান। আমি তখনো বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র সাপ্তাহিক *একতা*র সম্পাদক। তবে দলীয় রাজনীতিতে তেমন সক্রিয় নই। তোয়াব খানের সঙ্গে দেখা করার পর দেশের চলমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশ খোলামেলা আলাপ-আলোচনা হলো।

আমাদের আলোচনার একপর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মনজুর রশীদ খান আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। সে জন্যই আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি। মনজুর রশীদ খান দেশের রাজনীতিতে চলমান উত্তপ্ত ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে রাজনীতির বাইরের কিছু ব্যক্তির সঙ্গে মতবিনিময় করতে চান। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আমার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মনজুর রশীদ খানের পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা কথা বলি অন্তরঙ্গভাবে। এভাবেই জেনারেল মনজুর রশীদের

সঙ্গে আমার সম্পর্কের সূচনা। সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশ খোলামেলা আলোচনা হলো। সেদিন এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থান ছিল সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে। যত দূর মনে পড়ে, শেষ পর্যন্ত তাদের ওই অবস্থান সংকট নিরসনে সহায়ক হয়েছিল।

গত দুই দশকে নানা উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে মনজুর রশীদ খানের সঙ্গে সেই সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। বঙ্গভবনের দায়িত্ব ছেড়ে যখন তিনি গাজীপুরের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে যোগ দেন তখনো যেমন, তেমনি পেশাগত জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরও আমাদের সেই সম্পর্ক অব্যাহত রয়েছে। এমনকি তা পারিবারিক পর্যায় পর্যন্ত গড়ায়। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা ঘটনা নিয়ে আলোচনায় বহু সময় কেটেছে আমাদের। মনজুর রশীদ খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আমাদের সুহৃদ মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেন চৌধুরীর সঙ্গেও আমাদের অনেক আন্তরিক সময় কেটেছে। মঈনুল হোসেন চৌধুরীর কথা খুব মনে পড়ে।

মনজুর রশীদ খানের পেশাগত জীবন যেমন বহু বর্ণিল, তেমনি ঘটনার ঘনঘটায় ভরপুর। দেশের নানা পর্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম তিনি ক্ষমতার বলয় থেকে চাক্ষুষ করেছেন। পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণও করেছেন তাতে। ফলে নির্লোভ ও নিরহংকারী এই মানুষটিকে নিজের সমৃদ্ধ জীবনকথা লেখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রাণিত করতে থাকি। আমার এই অনুরোধের ফল ফলতে শুরু করে। আমি যখন দৈনিক *ভোরের কাগজ* পত্রিকার সম্পাদক, তখন তিনি সরাসরি জীবনকথা না লিখলেও রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে এ পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি আত্মস্মৃতি লেখার কাজেও হাত দেন। এভাবেই শুরু। ১৯৯৮ সালে *প্রথম আলো* প্রকাশিত হলো। এ কাগজেও লিখতে শুরু করলেন তিনি। এ সময় আমি তাঁকে বারবার তাঁর পূর্বাপর আত্মজীবনী লেখার জন্য তাগিদ দিয়েছি। বলা যায়, অনেকটা আমার সেই অনুরোধেরই ফসল মনজুর রশীদ খানের *আমার সৈনিক জীবন : পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ*।

পেশাগত জীবনে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট থেকে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন মেজর জেনারেল পদে। ছিলেন প্রথমে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের, পরে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সামরিক সচিব। তাঁর সামরিক জীবন শুরু হয় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কাকুল সামরিক একাডেমিতে যোগ দেওয়ার ভেতর দিয়ে। এ গ্রন্থের সুবাদে পাঠক জানতে পারবেন সামরিক

বাহিনীতে নির্বাচনী পরীক্ষায় তাঁর উতরে যাওয়ার কাহিনি, ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও তার তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং ওই যুদ্ধের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি সেনাসদস্যদের নানা বিড়ম্বনার কাহিনি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে সৃষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া, ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চের রাতে পাকিস্তানি বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করার পর পশ্চিম পাকিস্তানে থাকা বাঙালিদের নিরাপত্তাহীনতা, অবাঙালি-পাঞ্জাবি সেনা কর্মকর্তা ও সাধারণ সেনাসদস্যদের সন্দেহের তীরে তাঁদের বিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি চরম গ্লানিকর জীবনযাপন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাঙালি সেনাসদস্যদের রীতিমতো বন্দিত্বের জীবন যাপন করার বর্ণনাও পাঠককে রীতিমতো রোমাঞ্চিত করবে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস লেখকসহ তাঁর অন্য সেনা সতীর্থদের মনোভাব তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে, 'যুদ্ধ লাগলে অফিসার ও সেনাদের পরিবারকে যে দারুণ অসুবিধায় পড়তে হয়, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় ভালো করেই টের পেয়েছিলাম। তখন ব্যাচেলর ছিলাম বলে বাঙালি পরিবারগুলোর দুর্দশার সামান্যই দেখেছি। পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের বউ-ছেলেমেয়েদের তাদের আত্মীয়স্বজন এসে বাড়িতে নিয়ে যায় বা কেউ এসে বাসায় থাকে। কিন্তু বাঙালিদের কোনো উপায় থাকে না। নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চলছে। প্রকাশ্যে না হলেও পশ্চিমা সহযোগী ও সহকর্মীদের সঙ্গে আমাদের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। সামনে এই দূরত্ব আরও বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।'

সত্যিই তা-ই হয়। দেশমাতৃকার মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে না পারার দুঃখ তাঁদের মর্মে গেঁথে থাকে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জয়-পরাজয় লেখকেরও জয়-পরাজয় হয়ে ওঠে। তারও বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এভাবে, 'ওদিকে সকাল নাগাদ আরও উত্তেজনাকর খবর পেলাম—মিত্রবাহিনী ঢাকা দখল করে নিয়েছে। আগামীকাল পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। তাহলে যুদ্ধ থামছে। আর কোনো চিন্তা নেই। মন খুশিতে ভরে গেল। আমাদের দেশ আজ স্বাধীন বাংলাদেশ।' এখানেই শেষ নয়। এ গ্রন্থের চমকপ্রদ সব অধ্যায়ের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের হতাশাগ্রস্ত জেনারেলদের নিয়ে যে অধ্যায়টি রচনা করেছেন লেখক, তা-ও কম চমকপ্রদ নয়। তারপর আছে লেখকের পাকিস্তানে অন্তরীণ থাকা পৌনে দুই বছরের কথা, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নতুন করে তাঁর অন্তর্ভুক্তির কথা, বাংলাদেশ রাইফেলসে তাঁর

কর্মমুখর সাড়ে তিন বছরের কথা, সীমান্তে চোরাচালান দমনে তাঁর সুদৃঢ় ভূমিকার কথা। এ গ্রন্থের কোনো অধ্যায়কেই কম গুরুত্বপূর্ণ বলে অবহেলা করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। মনজুর রশীদ খান ১৯৭৫ সালের আগস্ট-নভেম্বরের চরম বিয়োগান্ত ও জটিল ঘটনাবলি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি জেনারেল এরশাদের শাসনামল ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাচারের কথা তুলে ধরতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। পাশাপাশি এ বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের বাঁক-ফেরা সব ঘটনা এবং তাঁর পতনের শেষ দিনগুলোর কথা। অনুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ ও তা পালনের বিবরণ। তাঁর অস্থায়ী শাসনামলে উদ্ভূত রাজনৈতিক জটিলতাগত সমস্যার সমাধানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে ভূমিকা পালন করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। মোট কথা, এ গ্রন্থ শুধু জেনারেল মনজুর রশীদ খানের আত্মকথা নয়, তা হয়ে উঠেছে এ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ কালপর্বের তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক দলিলগত আধারবিশেষ।

মনজুর রশীদ খান তাঁর এই আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে কিছুটা সময় নিয়েছেন। কারণও ছিল। শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি এ সময় ভাইসহ কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুবিয়োগের মতো ঘটনা ঘটেছে তাঁর জীবনে। ফলে সাময়িকভাবে তাঁকে লেখালেখি বন্ধ রাখতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি থেমে থাকেননি। তাঁর আত্মজীবনী রচনার কাজ শেষ করার পর পাণ্ডুলিপিটি যখন আমাদের হাতে তুলে দেন, তখন আমরা আনন্দিত হই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমার ও *প্রথম আলোর* সঙ্গে মনজুর রশীদ খানের অত্যন্ত আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা সব সময়ে উচ্চমূল্য দিয়েছি। তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মনজুর রশীদ খানের এ গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই গর্বিত।

ঢাকা
জানুয়ারি ২০১২

মতিউর রহমান
সম্পাদক, প্রথম আলো

আমার কিছু কথা

শৈশবে যখন প্রথম সেনাদল দেখলাম, তখনই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম সেনাবাহিনীর প্রতি। এই পেশার আকর্ষণ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পার হওয়ার পরও থেকে গেল। যোগ দিই সেদিনের পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। তারপর যোগ দিলাম জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব ও গর্ব নিজ দেশ স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে। জানি না, কজনের জীবনে ছেলেবেলার লক্ষ্য বাস্তবে পরিণত হয়। আমার বেলায় হয়েছে। কেউ হয়তো বলবেন, এটা একটা কাকতালীয় ঘটনা, হয়তো বা তা-ই। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা সম্ভব হয়েছে মহান সৃষ্টিকর্তা পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়। তাঁকে সব সময় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসছি। আর কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মরহুম মা ও বাবাকে, যাঁদের সার্বক্ষণিক দোয়া আমার বড় পাথেয় ছিল।

আমি একজন সাধারণ সেনা কর্মকর্তা, বড় মাপের কোনো বাহাদুরি বা কৃতিত্বের দাবিদার নই। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছি ক্যাডেট হিসেবে, অবসর নিয়েছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়ে। প্রত্যেকেরই কর্মজীবনে থাকে ছোট-বড় নানা ঘটনা—কিছু মধুর, কিছু তিক্ত, কিছু আবার গুরুত্ববহ ও ঘটনাবহুল। আমার জীবনেও তেমনই কিছু ঘটনা রয়েছে, যা এ বইয়ে তুলে ধরেছি। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাবলে কখনো বা বিশেষ সুবিধাবলে জ্ঞাত ঘটনাবলির উল্লেখ রয়েছে এখানে। যা দেখেছি, উপলব্ধি করেছি, কার্যকর ভূমিকা নিয়েছি বা নিতে পারিনি কিন্তু বিশ্বাস করেছি, তারই বিবরণ ধরা থাকল এই স্মৃতিকথায়।

আমি লেখক নই। এই স্মৃতিকথা আমার সৈনিক জীবনের শুরু থেকে অবসর গ্রহণ সময়ের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করেছি। সৈনিক জীবনে লেখালেখির একটা ক্ষীণ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। তবে

সামান্য কিছু প্রস্তুতি ছিল। ঘটনাচক্রে লেখালেখির আগ্রহ দেখা দেয়, যখন জাতীয় জীবনের কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। তা ছিল নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি এরশাদের পতন এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সময়কে ঘিরে। আরও কিছু রাষ্ট্রীয় ঘটনার সঙ্গে উল্লেখ করার মতো সম্পৃক্ততা ছিল আমার, যা এ বইয়ে স্থান পেয়েছে। জানা ও সত্য প্রকাশের অধিকার গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ, যা আমাদের দেশে প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। আকাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত, প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রকদের ভূমিকা জানার অধিকার রয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের। তাই জাতিকে আমার জানা তথ্য জানানো অবশ্যকর্তব্য মনে করে আসছি। যা সত্য বলে মনে করেছি, তারই সঠিক চিত্র তুলে ধরেছি। এতে কেউ আহত হলে আমি দুঃখিত। আমার এই উদ্যোগ অকৃত্রিম ও অতি ন্যায়নিষ্ঠ বলে দাবি করছি। যাঁরা সত্য, অমিশ্র-অবিকৃত তথ্য নিয়ে দেশের নানা ঘটনার ইতিহাস রচনা করতে চান, তাঁরা আমার এই স্মৃতিকথায় অনেক উপাদান পাবেন।

আমার লেখার জগতে প্রবেশে যিনি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন, তিনি বন্ধুবর মতিউর রহমান। তাঁরই সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়ে প্রথমে দৈনিক *ভোরের কাগজ* পত্রিকায় (তখন তিনি সম্পাদক) লেখা শুরু করি। আমার লেখা ১৯৯৫-এর শেষ দিকে দৈনিক *ভোরের কাগজ*সহ কয়েকটি ইংরেজি ও বাংলা দৈনিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেসব রচনা নিয়ে *এরশাদের পতন ও সাহাবুদ্দীনের অস্থায়ী শাসন: কাছে থেকে দেখা* নামে বইটি প্রকাশ করা হয়। তা কিছুটা সংশোধিত আকারে এই স্মৃতিকথার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

এই স্মৃতিকথা লিখতে অনেক বন্ধু, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের একজন *প্রথম আলো*র সম্পাদক মতিউর রহমান। তিনি এর প্রকাশনারও ভার নেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। আরও অনেকে আছেন, যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার এই স্মৃতিকথা সচেতন পাঠকদের সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

পুরাতন ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা
আগস্ট ২০১১

মনজুর রশীদ খান

প্রথম পর্ব

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে

প্রথম অধ্যায়

পাকিস্তান আর্মিতে যোগদান-পর্ব

নির্বাচনী পরীক্ষায় উতরানোর কাহিনি

ছোটবেলা থেকেই আর্মিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা জাগতে থাকে। ১৯৪৬ সাল, নোয়াখালীর কয়েকটি এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। চাকরিসূত্রে আমার ডাক্তার বাবা তখন রায়পুরে। আমাদের বাসার কাছেই আর্মির একটি দল ক্যাম্প করেছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিরই কোনো একটি অংশ হবে। সেই প্রথম দেখলাম, ইংরেজ (যাদের গোরা বলা হতো), পাঞ্জাবি, শিখ ও গোর্খাদের। বাবার কাছে মাঝেমধ্যে একজন ক্যাপ্টেন আসতেন। তিনি ইংরেজ ডাক্তার। তাঁর গায়ের রং যেন টকটকে লাল। বাবা বলতেন, অফিসার শ্রেণীর সবাই ইংরেজ। জিপের সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে সাদা চামড়ার যিনিই বসা থাকতেন, তাঁর দাপটই যেন অন্য রকম। পেছনে বসা থাকত দুজন। তাদের মাথায় পাগড়ি, হাতে রাইফেল। লোকে বলত এরা নাকি শিখ। দূরে ডাকবাংলো ও স্কুলের মাঠেও ক্যাম্প করেছিল আরও কয়েকটি দল। স্কুলের মাঠের দলটি ছিল গোর্খা এবং অন্যটিতে শিখ ও পাঞ্জাবি। খুব সকালে হাফ প্যান্ট পরে সামনের রাস্তা দিয়ে ছোট ছোট দলে তারা দৌড়ে দৌড়ে যেত। আমরা বড়দের সঙ্গে এসব কিছু খুব অবাক হয়ে দেখতাম। সেই থেকে মাথায় চাপল সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে। কলেজ পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে থাকার সময় এই ইচ্ছাটা আরও প্রবল হয়ে উঠল। আমার সঙ্গে জুটল সমমনা আরও কয়েকজন। আমার মামা মিলিটারি বিষয়ে খুব খোঁজখবর রাখতেন। তাঁর বাসায় আইয়ুব খানের ইয়া বড় এক

ছবি ছিল। দেখা হলেই আলাপ জুড়তেন কোন দেশে কে কমান্ডার ইন চিফ, ভারতের কে পরবর্তী চিফ, কে এয়ারফোর্স চিফ, মুসার পর কে পাকিস্তানের কমান্ডার ইন চিফ হবেন, কোন জেনারেল পাঠান, কে পাঞ্জাবি ইত্যাদি। তাঁদের মধ্যে খাজা ওয়াসিউদ্দিন ছাড়া উচ্চপদে বাঙালি কেউ নেই বলে আফসোস করতেন। খাজা ওয়াসিউদ্দিনের (তখন তিনি সম্ভবত ব্রিগেডিয়ার) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ ১৪ ডিভিশনের জিওসি নিয়োগের খবর শুনে মামা খুবই উৎফুল্ল। তিনি কবে ঢাকায় পৌঁছাচ্ছেন, সে অপেক্ষায় রইলেন। একদিন সকাল সকাল আমাকে তিনি নিয়ে গেলেন তেজগাঁও এয়ারপোর্টে। খাজা ওয়াসিউদ্দিন আসছেন। গিয়ে দেখি, তাঁকে দেখার জন্য প্রচুর লোকের সমাগম। তেজগাঁও পুরোনো এয়ারপোর্টের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখলাম তিনি বিমান থেকে নেমে আসছেন। আর্মি ও ঢাকার নওয়াব পরিবারের লোকজন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। একটা কালো রঙের গাড়িতে উঠে একসময় তিনি এয়ারপোর্ট ছেড়ে গেলেন।

যা-ই হোক, মামা ও আমাদের দুজন আত্মীয়—একজন ডাক্তার মেজর জিয়াউর রহমান (পরে লে. কর্নেল ও মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ হন) এবং অন্যজন এয়ারফোর্সে স্কোয়াড্রন লিডার ওয়াহিদুল্লা (পরে এয়ার কমোডর, প্রয়াত) সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। প্রসঙ্গত, সে সময় মিলিটারিতে যোগ দেওয়াটা অনেক পরিবারেরই অপছন্দ ছিল। মা চাইতেন না আমি তাতে যোগ দিই। তবে বাবা আমাকে উৎসাহ দিতেন। এভাবে আমি একদিন মনস্থির করে ফেললাম যে আর্মিতে আমাকে যেতেই হবে। অবশ্য এ সময় আমার কিছু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা করে আবার বলত, 'তুই লম্বাটম্বা আছিস, তোর জন্য আর্মিতে যাওয়াই ঠিক হবে।'

ফজলুল হক হলে থাকার সময়ই আর্মিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলাম। সঙ্গে আরও কয়েকজনকে পেয়ে গেলাম। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ২৭তম পিএমএতে (পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি) লং কোর্সের জন্য ছাপানো ফরমে তথ্যাদি দিয়ে আবেদনপত্র পাঠালাম। যথাসময়ে লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাক এল। সে পরীক্ষায় পাস করায় ইন্টারভিউ দিতে গেলাম ১৪ ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের মেসে। সেই প্রথম আমার আর্মির হোমরাচোমরাদের মুখোমুখি হওয়া। যাক, ইন্টারভিউয়েও টিকে গেলাম। এবার এল মেডিকেল টেস্টের পালা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের তৈরি সিএমএইচের (কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল) বিভিন্ন বিভাগ ছিল ভিন্ন ভিন্ন

ব্যারাকে। লাইন করে দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভিন্ন ডাক্তারি পরীক্ষা শেষে দিনের প্রায় শেষভাগে যাঁর কাছে যেতে হলো, তিনি একজন সার্জিক্যাল স্পেশালিস্ট মেজর। স্টেথিস্কোপ লাগিয়ে বুক পরীক্ষা করে বললেন, 'তোমার হার্টের সমস্যা আছে। ছয় মাস পর আবার পরীক্ষা করাতে হবে।' খুব নিরাশ হয়ে ভাবনায় পড়ে গেলাম। কোনো দিন তো ডাক্তারের কাছে যেতে হয়নি। নিয়মিত খেলাধুলা করে আসছি। আর্মিতে যাব বলে শরীরটা আরও শক্ত-সমর্থ করার চেষ্টার অন্ত নেই। আর আমার কিনা হার্টের অসুখ আছে বলে সন্দেহ করছে! এ অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ডাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

যা হোক ছয় মাস পর মেডিকেল টেস্টের জন্য আবার ডাক এল। এবার সার্জিক্যাল স্পেশালিস্ট হিসেবে পেলাম অন্য অন্যজনকে। তিনি নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন। দেখার পর হার্টের বিষয়ে কিছুই বললেন না। সব ধরনের পরীক্ষা শেষে আমি মেডিকেলি ফিট বলে জানিয়ে দিলেন। পরের কোর্সের আইএসএসবির (ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড) জন্য অপেক্ষা করতে বলা হলো। ছয় মাস পিছিয়ে গেলাম। আইএসএসবির সিলেকশন-পদ্ধতি খুবই কঠিন। সে সময় এখনকার মতো কোচিং সেন্টার ছিল না, গাইড বইও পাওয়া যেত না। এ ব্যাপারে সাহায্য চেয়ে করাচিতে চাকরিরত আমার আত্মীয়কে চিঠি লিখলাম। তিনি এয়ারফোর্সের একজন স্কোয়াড্রন লিডার। কয়েক পাতার চিঠি লিখে পুরো পদ্ধতি বিষয়ে সুন্দর বর্ণনা দিয়ে কোন বিষয়ে কী প্রস্তুতি নিতে হবে, পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর চিঠি আমার খুব কাজে দিল। যথাসময়ে আইএসএসবিতে হাজির হওয়ার ডাক এল। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সে সময়কার চেহারা এখনো চোখের সামনে ভাসে। বিকেলে বাসে চড়ে সেখানে হাজির হলাম। সেনা ব্যারাকে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। জীবনে এই প্রথম সেনা ব্যারাকে থাকা।

পরের দিন পরীক্ষা শুরু হলো। সেখানেই পরিচিত হলাম শাফায়াত জামিল (মুক্তিযোদ্ধা, বীর বিক্রম, পরে কর্নেল হিসেবে অবসর নেন) ও কে এম ওয়াহেদসহ (পরে মেজর জেনারেল হিসেবে অবসর নেন) সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহী বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। তিন দিন টেস্টের পর ফলাফল ঘোষণা করা হলো। আমি ও ওয়াহেদ নির্বাচিত হলাম। শাফায়াত জামিল পরেরবার আইএসএসবিতে টিকে যান ও আমার সঙ্গী হন। সাধারণত প্রথমবারে টিকে যাওয়াদের সংখ্যা থাকে খুবই কম। আসলে তখনকার দিনে সশস্ত্র বাহিনীতে সুযোগ পাওয়া ছিল একটা বিরাট ব্যাপার। নিজের সাফল্যে মনটা খুশিতে ভরে গেল। প্রবল উৎসাহ নিয়ে কাকুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। অপেক্ষা করতে থাকলাম কবে জিএইচকিউ (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদর

দপ্তর) থেকে কাকুলস্থ পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে যোগ দেওয়ার চিঠি আসবে। কিন্তু সেই চিঠির পাত্তা নেই।

এর মধ্যে একদিন স্টেডিয়ামের সামনের রাস্তায় ওয়াহেদের সঙ্গে দেখা। তিনি যা বললেন, তা শুনে আমি হতভম্ব। তাঁর কলআপ চিঠি এসে গেছে। দিন দুয়েকের মধ্যে তিনি কাকুলের পথে রওনা দিচ্ছেন। অথচ আমার কলআপ চিঠি এখনো এল না। আরও দিন দুই অপেক্ষা করে আশা ছেড়ে দিলাম। আইএসএসবিতে সিলেক্ট হওয়ার পর মিলিটারি একাডেমিতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ পায়নি, এমনটা কখনো কেউ শোনেনি। আসলে আমার ভাগ্যটা খারাপ। সেনাবাহিনীতে বাঙালি যত কম নেওয়া যায়, সেটা যে পশ্চিম পাকিস্তানিদেরই ষড়যন্ত্রের একটি অংশ, সেই তত্ত্ব আমার মনে আরও জোরালো হলো। কয়েক দিন খুবই নিরাশা আর অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কাটালাম। ঠিক করলাম, জিএইচকিউতে চিঠি লিখব। লেখার মাস খানেক পর জবাব মিলল। লিখেছে, তারা দুঃখিত। কোর্স শুরু হয়ে গেছে। এখন আমাকে ডাকার সময় নেই। তবে লিখেছে, ইচ্ছা করলে আমি আবার চেষ্টা করতে পারি। জেদ ধরলাম, আবার চেষ্টা করব। ব্যাপারটার শেষ আমাকে দেখতেই হবে। এবার ২৯তম পিএমএ লং কোর্সের প্রাথমিক সব পরীক্ষা শেষ করে আইএসএসবিতে গেলাম এবং এবারও সিলেক্ট হলাম। শেষমেশ বহু আকাঙ্ক্ষিত পিএমএতে যাওয়ার কলআপ চিঠি পেলাম। আমি এক বছর পিছিয়ে পড়লাম, অর্থাৎ দুটি ব্যাচের জুনিয়র হলাম।

কাকুল যাত্রা

অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার সময় আসছে ভেবে মন উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরে গেল। তবে নানা অজানা শঙ্কা আর ভয়ভীতিও মনে জায়গা করে নিতে শুরু করল। অন্যদিকে মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে যাওয়ার বেদনাও কম নয়। ১৯৬১ সালের ২৩ নভেম্বর সকালে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে এলাম। সেদিন পিআইএর চার ইঞ্জিনের সুপার কনিস্টিলেশন বিমানে চড়ে বসলাম। জীবনের প্রথম বিমানযাত্রা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর লাহোর বিমানবন্দরে নামলাম। সেই থেকে শুরু হলো জীবনের অন্য এক অধ্যায়। নিজের দেশ হলেও ভৌগোলিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান যে বিদেশ, পদে পদে সেটা টের পেতে লাগলাম। বিমানেই দেখা হলো কয়েকজন সিনিয়র টার্মের ক্যাডেটের সঙ্গে। দু-একজন তো খুবই আন্তরিক হয়ে আমাদের ব্রিফিং করলেন। দিলেন নানা উপদেশ। আবার বেশ কয়েকজন গাম্ভীর্য বজায়

রাখলেন। বুঝলাম, সিনিয়র। ফলে এখন থেকেই বুঝিয়ে দিতে চান, তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। নভেম্বরে ঢাকায় রীতিমতো গরম। লাহোরে বেলা আড়াইটা কিন্তু আমাদের দেশের ডিসেম্বর মাসের সকালের মতো শীত। অল্পস্বল্প শীতের কাপড় নিয়ে গিয়েছিলাম। তাতে সে শীত মানার কথা নয়। সোজা চলে গেলাম লাহোর রেলস্টেশনে। সিনিয়র ক্যাডেটরাই বলে দিয়েছিলেন কীভাবে কোথায় যেতে হবে। রাত ১০টার খাইবার মেইলে রাওয়ালপিন্ডি অভিমুখে রওনা হতে হবে। সেখান থেকে জিটিএস বাসে করে অ্যাবোটাবাদ। বাস ছাড়বে বেলা দুটোয়। পৌঁছাবে রাত আটটায়। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে কাকুল, আমাদের মূল গন্তব্যে।

লাহোর রেলস্টেশনে পৌঁছে লাগেজ-রুমে মালপত্র রেখে ঘুরতে বের হলাম। রাত আটটার দিকে রেলস্টেশনে ঢুকে দেখি, সে এক এলাহি কাণ্ড! লোকে লোকারণ্য। টিকিট কেনার চেষ্টা করলাম। কোনো ক্লাসেই সিট নেই। এখন কী হবে, কীভাবে যাব, ভেবে সবাই অস্থির। আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে বিমানে দেখা একজন ক্যাডেট এগিয়ে এলেন। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'চিন্তা কোরো না। আরও অনেক নতুন ক্যাডেট যাচ্ছে। একটা কিছু করা যাবে।' অনেক সিনিয়র ক্যাডেট দেখলাম। পরনে সবুজ রঙের ব্লেজার ও পিএমএর টাই। ব্লেজারের বুকপকেটে ইংরেজি বড় বড় হরফে পিএমএ লেখা। সঙ্গে আরবিতে লেখা কোরআন শরিফের আয়াত 'রাব্বি জিদনি ইলমা'। দেখলেই চেনা যায়। তাঁদেরও দু-একজন আমাদের খোঁজখবর নিলেন। ভরসা পেলাম। খাইবার মেইল করাচি থেকে আসে। অপেক্ষা শেষে ট্রেন যখন প্ল্যাটফরমে ঢুকল, তখন কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। যত যাত্রী নামল, ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি লোক। আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা কিছু গতি হয়ে যাবে, এই আশায়। একজন ক্যাডেট এসে জানিয়ে গেল, ট্রেনের সঙ্গে আমাদের জন্য একটা তৃতীয় শ্রেণীর বগি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়া আর্মির একটা দলের সঙ্গে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ট্রেন ছাড়ার কয়েক মিনিট আগে কামরায় উঠে বসলাম। আমাদের কামরায় ২০-২৫ জন ক্যাডেট ছাড়া অন্য কোনো যাত্রী ছিল না। ট্রেন চলতে শুরু করল। এবার মুখোমুখি হতে হলো আরেক সমস্যার। কামরার দরজা-জানালা সব বন্ধ। তবু প্রচণ্ড শীত। সারা রাত কাটাব কী করে! বিছানাপত্র তো কিছুই আনিনি। কেউ বলেনি এমন অবস্থা হবে। বসেই কাটাব স্থির করলাম। দেখি, শাফায়াত যে হোল্ডঅলটা নিয়ে এসেছিল, সেটা থেকে বের করল একটা লেপ। শীতের জন্য মহামূল্যবান

সামগ্রী। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ছোট কাঠের সিটে দুজন শোব কী করে! শাফায়াতই বুদ্ধি বের করল। বলল, 'চল, তোর মাথা আর আমার পা একদিকে, আর আমার মাথা আর তোর পা অন্যদিকে দিয়ে ঘুমাই।' সেভাবেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই!

সকালে লোকজনের হইচইয়ে ঘুম ভাঙল। ট্রেন তখন পিন্ডি স্টেশনে দাঁড়িয়ে। এখানে তো আরও বেশি শীত। নেমে কোথায় যাব, কী করতে হবে—সিনিয়র ক্যাডেটদের ব্রিফিংয়ের ফলে এরই মধ্যে এ সম্পর্কে জানা হয়ে গেছে। একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বাঙালি ক্যাডেটরা নাকি ওখানেই ওঠে। অবশ্য মাত্র ঘণ্টা কয়েকের ব্যাপার। হোটেলে শেভটেভ করে, গোসলটোসল সেরে ফিটফাট হয়ে নিলাম। যখন পিএমএতে পৌঁছাব তখন যাতে স্মার্ট লাগে। না হলে বিপদ আছে! এসবই ছিল সিনিয়র ক্যাডেটদের ব্রিফিংয়ের অংশ। আরেকটা মূল্যবান ব্রিফিং ছিল এ রকমের যে, যে যত দেরিতে পৌঁছাবে, তার জন্য সেটা তত ভালো। বাসের জন্য অগ্রিম টিকিট লাগে, এমন কিছু ঢাকা বা কোথায়ও এর আগে দেখিনি বা শুনিওনি। বেলা দুটোর আগেই বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলাম। অ্যাবোটাবাদের বাস দাঁড়িয়েই ছিল। বেশ বড়সড় ও আরামদায়ক। এ রকমের বাসের কথা বাংলাদেশে তখন কল্পনারও অতীত ছিল। বাসে বসে থাকতে থাকতেই দেখলাম আরও ক্যাডেট আসছে। তাদের কয়েকজন বড় বড় গাড়ি থেকে নামল। তাদের বিদায় জানাতে মা-বাবা, ভাইবোনসহ অনেকেই এসেছে। যথাসময়েই বাস ছাড়ল। পিন্ডি ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই নজরে পড়ল রাস্তার দুই পাশেই গাছপালাশূন্য ছোট-বড় পাহাড়। ঘণ্টা দুই চলার পর বুঝতে পারলাম, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা ধরে বাস আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে। ওদিকে সন্ধ্যা যতই গড়িয়ে আসছে, শীতও জাঁকিয়ে ধরছে। এভাবে রাত আটটা নাগাদ অ্যাবোটাবাদে এসে পৌঁছালাম। বাস থেকে নামতেই ট্যাক্সি ও টাঙ্গাঅলারা ঘিরে ধরল। টের পেলাম, এখানে শীত আরও তীব্র। আমি, শাফায়াত ও আরেকজন (নাম মনে নেই) ট্যাক্সি নিয়ে রওনা দিলাম বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই কাকুল মিলিটারি একাডেমির উদ্দেশে। কাকুল অ্যাবোটাবাদ থেকে আরও ওপরে।

বাইরে তখন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ট্যাক্সির হেডলাইটের আলোয় দেখা যায় না। এভাবে যেতে যেতে একসময় নজরে পড়ল পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির গেট। গেট থেকে রাস্তা আরও ওপরের দিকে চলে গেছে। একটা ব্যারাকের সামনে ট্যাক্সি এসে থামতেই ১০ থেকে ১২ জন ক্যাডেট

আমাদের ঘিরে ধরল। বুঝলাম, এরা সিনিয়র ক্যাডেট। আমাদের বিশেষ অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিল। এই 'বিশেষ অভ্যর্থনাকে' অনেক কারণেই বিশেষ বলা হয়ে থাকে। এখানে তার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এককথায়, বাংলা প্রবাদে প্রথম 'রাতে বিড়াল মারা' আর ইংরেজিতে 'কাট টু সাইজ' বলা যেতে পারে। এই অভ্যর্থনার মাধ্যমেই শুরু হয়ে থাকে একজন সিভিলিয়ান যুবকের সামরিক জীবন। আর সেই সূচনা বা প্রারম্ভকালের আছে নানা পন্থা ও প্রক্রিয়া। মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনের যে ধারা চলে, প্রথম দিনে খুবই কঠোর মনে হলেও পরে সবকিছু সহনীয় হয়ে ওঠে। এর প্রয়োজনীয়তা যে রয়েছে, তা-ও মানতে হয়। কখনো কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যে যায় না তা নয়। মানসিক ও শারীরিক চাপ সহ্য করার সামর্থ্য অর্জন করতে হলে এ ধরনের কঠোর প্রশিক্ষণ-প্রক্রিয়া অপরিহার্য। আমাদের জন্য সেটাই এখন থেকে শুরু হয়ে গেল।

আগে থেকে কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি থাকায় প্রাথমিক ধাক্কাটা মোটামুটিভাবে কাটিয়ে উঠতে অসুবিধা হয়নি। এ ক্ষেত্রে বাঙালি সিনিয়র ক্যাডেটদের সাহায্য-সহানুভূতি ও উপদেশ আমাদের জন্য বড় ধরনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সে সময় পিএমএর প্রশিক্ষণকালের সীমা ছিল আড়াই বছর। এই আড়াই বছর আবার ভাগ করা ছিল পাঁচটি টার্মে। প্রতি টার্ম পাঁচ মাসের, যার সমাপ্তিতে একবার চার সপ্তাহের, পরের বার ছয় সপ্তাহের ছুটি থাকত। অবশ্য মিডটার্মে এক সপ্তাহের ছুটি হতো। এক টার্ম পর পর সরকারি খরচে দেশে অর্থাৎ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে আসার সুযোগ মিলত। দেশে আসাটা যে কী মধুর ও আনন্দঘন ছিল, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ওই সময় মোট তিনবার দেশে আসতে পেরেছিলাম। অন্য ছুটিতে বাঙালি ক্যাডেটদের সঙ্গে কাকুলেই কাটাতে হতো। মনটা তখন খুবই খারাপ থাকত। সারা একাডেমি খালি, তাতে বসবাসকারী বলতে কেবল আমরা ২০-৩০ জন। আড়াই বছর দীর্ঘ কঠিন কঠিন সামরিক প্রশিক্ষণগত জীবনের কথা মনে করলে এখনো আঁতকে উঠতে হয়। ভাবতে অবাক লাগে, সেই সুদূর পরবাসে বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও সার্বিক বৈরী অবস্থায় কীভাবে পাঁচ-পাঁচটি টার্ম পার করে কমিশন লাভ করতে পেরেছিলাম। ছোটবেলা থেকেই বাংলায় কথা বলে এসেছি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে একটু একটু উর্দু বলতে শিখেছিলাম। অবশ্য ম্যাট্রিকে অপশনাল হিসেবে উর্দু শিখতে হয়েছিল। কিন্তু পরে আর মনে থাকেনি। পিএমএতে প্রকাশ্যে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলা নিষেধ

ছিল। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যতটুকু ইংরেজি শিখতে হয়েছিল, তাতে ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস তেমন ছিল না। ফলে ওইদেশীয় লোকজনও আমাদের উচ্চারণ নিয়ে বেশ হাসিঠাট্টা করত। অবশ্য তাদের অধিকাংশেরও উচ্চারণ ভালো ছিল না। যারা পাবলিক স্কুল বা ক্যাডেট কলেজ পার হয়ে এসেছে, তারা ভালো ইংরেজি বলত। ব্যাটম্যান ও মেসের বয়-বেয়ারাদের সঙ্গে উর্দু, পাঞ্জাবি বা পশতুতে কথা বলা সম্ভব হতো না। ফলে প্রথম দিকে বেশ অসুবিধাই হতো। ভাষার পরে আসে খাবার ও আবহাওয়ার কথা। ঢাকার বাসায় মাঝেমধ্যে রুটি খেতে দিলে রাগ করতাম। এখানে আসার পর থেকে সপ্তাহে দুই বেলা মাত্র পোলাও খেতে দেওয়া হতো। পরে রাতে অবশ্য বাঙালি ক্যাডেটদের জন্য ভাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাদের মতো যারা এ রকম বাস্তবতার ভেতর দিয়ে দিন পার করেছে, কেবল তাদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব কেমন কঠিন ছিল আমাদের সেই সময়কার দিন। আমার সেই দূরসম্পর্কের মামা, যিনি তখন মেডিকেল কোরে মেজর, তাঁর কয়েকটি কথা খুবই মনে করতাম। তিনি বলতেন, 'মানসিক দৃঢ়তা ও দৃঢ় সংকল্প হবে তোমার বড় শক্তি, যে অবস্থাতেই থাকো, মনে রেখো, তোমাকে টিকে থাকতেই হবে।' তিনি আরও বলতেন, 'তুমি ফেরত আসতে পারবে না। এলে তোমার লাশই শুধু আসবে।' প্রথম দুই টার্মই ছিল সবচেয়ে কঠিন। এ সময় কিছু কিছু ক্যাডেট ঝরে পড়ত, অর্থাৎ তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আমাদের কোর্সে মোট ৮৪ জনের মধ্যে মাত্র আটজন ছিলাম বাঙালি। এর মধ্যে আমরা সাতজন কমিশন লাভ করতে পেরেছিলাম।

কমিশন লাভ

সর্বশক্তিমান করুণাময় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সব বাধাবিপত্তি কাটিয়ে কমিশন লাভের দিনটি এসে গেল। ১৯৬৪ সালের ১৮ এপ্রিল তৎকালীন এয়ারফোর্স চিফ এয়ার মার্শাল আসগর খান আমাদের পাসিং আউট প্যারেড রিভিউ করেন ও কমিশন্ড অফিসার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দেন। দিনটি সব অফিসারের জীবনের এক বিশেষ দিন। সেই প্যারেডে উপস্থিত থাকার জন্য ক্যাডেটদের আত্মীয়স্বজনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে একজন ছাড়া কারও আত্মীয়স্বজন সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এমন একটি বিশেষ দিনে স্বজনদের উপস্থিতি যে কত আনন্দময়, সে দেশীয়দের ক্ষেত্রে সেটা ঘটতে দেখে মনটা আরও বিষণ্নতায় ভরে উঠেছিল। চৌদ্দ শ মাইল দূরে মা-বাবা, ভাইবোনেরা দেখতে না পারলেও আমি যে

কমিশন পেয়ে গেছি, এটাই ছিল আমার বড় সান্ত্বনা। কমিশন পাওয়ার কিছুদিন আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়, কে সেনাবাহিনীর কোন শাখায় (আর্মস অ্যান্ড সার্ভিস/কোর), কোথায়, কোন ব্যাটালিয়ন, রেজিমেন্ট বা কোরে যোগ দেবেন। আমি আর্টিলারিতে (গোলন্দাজ) ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্টে পোস্টিংয়ের নির্দেশ পাই। শাফায়াত, মাহমুদ (প্রয়াত) ও শাহাবুদ্দিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে, আবদুল্লা আর্টিলারিতে, বাশার (মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ হন) এসঅ্যান্ডটিতে ও জাহেদ ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে কমিশন পান। শাফায়াতের ব্যাটালিয়ন রংপুরে, মাহমুদের ব্যাটালিয়ন আর আবদুল্লার আর্টিলারি রেজিমেন্ট তখন যশোরে। এরা ছাড়া বাদবাকিদের পোস্টিং হয় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে। ১০ দিনের ছুটি পেলেও আমরা কয়েকজন কাকুলেই থেকে গেলাম। ছুটি কাটিয়ে আমি যোগ দিই ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারিতে। এই রেজিমেন্ট ছিল তখন পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে। ২৬ এপ্রিল বিকেলবেলা এসে পৌঁছালাম শিয়ালকোট রেলস্টেশনে। আমাকে নিতে এসেছিল লেফটেন্যান্ট মতলুব, আমার দুই কোর্স সিনিয়র। মালপত্রসমেত একটা টাঙ্গায় চেপে সাত-আট মাইল দূরের শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্টের মেসের এক ব্যারাকে এসে উঠলাম।

পরের দিন সকালেই রেজিমেন্টে গিয়ে উপস্থিত হয়ে যোগদানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলাম। এখান থেকেই শুরু হলো সামরিক জীবনের আসল অধ্যায়। আগে ছিলাম ক্যাডেট, এখন অফিসার। তবে অফিসার র‍্যাংকের কনিষ্ঠতম স্তরে। কয়েক দিনের মধ্যেই টের পেলাম সামনের রেজিমেন্টের কর্মগত জীবন কত কঠিন। আমার রেজিমেন্টে বিভিন্ন র‍্যাংকের মোট ২৭ জন অফিসার থাকার কথা থাকলেও তখন ছিল মাত্র ১১ জন। সিওর (কমান্ডিং অফিসার) নেতৃত্বে চারজন মেজর, তিনজন ক্যাপ্টেন, দুজন লেফটেন্যান্ট আর আমি। রেজিমেন্টের থাকে তিনটি ব্যাটারি—পাপা, কিউবেক ও রোমিও। প্রতিটি ব্যাটারির কমান্ডার একজন মেজর। আমাকে যোগ দিতে বলা হলো রোমিও ব্যাটারিতে। রেজিমেন্টের সব অফিসার আমাকে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন, তবে একজন ছাড়া। তিনি হলেন আমার ব্যাটারি কমান্ডার মেজর আইয়ুব তনোলি। খাস পাঞ্জাবি। জেলাম জেলার কোথাও তাঁর বাড়ি। সবাই আমার সঙ্গে কথা বললেও কেন জানি না তিনি আমাকে এড়িয়ে চলেন। দেখেও যেন দেখেন না। ব্যাটারি সুবেদারের মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ আসে, এটা করো, সেটা করো। প্রায় পাঁচ-ছয় দিন পর সুবেদার বলল, ব্যাটারি কমান্ডার ১১টায় আপনাকে তাঁর

সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। তাঁর সঙ্গে এটাই হতে যাচ্ছে আমার প্রথম ফরমাল সাক্ষাৎ।

একটা ব্যারাকের ছোট্ট রুমে তাঁর অফিস। আর্মির যথাযথ কায়দায় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মে আই কাম ইন, স্যার?'

হুকুম হলো, 'ইয়েস।'

মার্চ করে রুমে ঢুকে অ্যাটেনশন হয়ে স্মার্ট এক স্যালুট ঠুকে দিলাম। ব্যাটারি কমান্ডার ব্যাপারটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে বললেন, 'অফুল! দিস ইজ ইওর স্যালুট। গেট আউট।'

আমি তো হতভম্ব। হুকুম নিয়ে আবারও ঢোকার চেষ্টা করলাম। এবারও বললেন, 'গেট আউট।' তৃতীয়বার গ্রহণ করলেন আমার স্যালুট আর জানালেন, পিএমএ থেকে সদ্য আসা কারও স্যালুট এমন খারাপ হতে পারে না। হুমকি-ধমকি দিয়ে শেষে বললেন, আমার জন্য একজন হাবিলদারকে দেবেন, সে নতুন করে আমাকে স্যালুট শেখাবে। কথা শেষে আরও অনেক আদেশ-নির্দেশ দিলেন। প্রায় আধঘণ্টা অ্যাটেনশন হয়ে সবকিছু শুনলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মেসে আসার পর অন্য জুনিয়র অথচ আমার সিনিয়র অফিসাররা জানতে চাইল আমার সঙ্গে কী হয়েছে। তাদের কাছে সবকিছু খুলে বললাম। তবে অনেকেই হাসিঠাট্টা করল। নানা মন্তব্য করে বিষয়টা হালকা করে দিল।

দিন কয়েক পর সিওর সঙ্গে ফরমাল সাক্ষাতের দিনক্ষণ ঠিক করা হলো। খুব ঘাবড়ে রইলাম।

ব্যাটারি কমান্ডার যে অবস্থা করেছিলেন; সিওর মুখোমুখি আরও বেশি বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ব কি না—এ রকম একটা গভীর শঙ্কা পেয়ে বসল। প্রথম থেকেই লক্ষ করলাম, সিওকে রেজিমেন্টের সবাই যমের মতো ভয় করে। পারতপক্ষে কেউ তাঁর সামনে পড়ে না। যা-ই হোক, যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এর আগে তাঁকে দূর থেকে দেখেছি। এবার প্রথম সামনাসামনি। নাম লে. কর্নেল শাহ মোহাম্মদ। ব্রিটিশ আমলের অফিসার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। বসতে বললেন। রেজিমেন্টের পক্ষ থেকে আমাকে তিনি স্বাগত জানালেন। অনেক উপদেশ দিলেন। বললেন, একজন ভালো অফিসার হতে হলে ক্যারিয়ারের প্রথম থেকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পালন করতে হবে শৃঙ্খলা। বললেন, নিজ প্রফেশনে (এখানে গানার অফিসার) উচ্চদক্ষতা অর্জন করতে হলে এখন থেকেই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করতে হবে। আমার জন্য গানারিসহ নানা

বিষয়ে তিনি বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন বলে জানালেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, তিনি একজন প্রকৃত পেশাদার, পিতৃতুল্য ও আন্তরিক স্বভাবের অফিসার।

ভারত-পাকিস্তানে ব্রিটিশ শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে স্থাপিত ক্যান্টনমেন্টগুলোর মধ্যে অন্যতম শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্ট। এখানকার সেনাসদস্যদের ব্যারাক, অফিসার্স মেস ও অন্য সব বাড়িঘর সবই পুরোনো। পাশাপাশি ক্যান্টনমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু দোকানপাট, দু-একটি রেস্টুরেন্ট, ব্যাংক, ডাকঘর ইত্যাদিও রয়েছে। ভূগোলে পড়তাম, শিয়ালকোট খেলাধুলার সামগ্রী, স্টেনলেস স্টিলের ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ও ছুরি-কাঁচি-চামচ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখান থেকে মাইল কয়েক দূরেই জেলা শহর। ছুটি পেলেই সিনেমা দেখা ও বিশেষ ধরনের টিক্কা কাবাব খাওয়ার জন্য সেখানে চলে যেতাম। শিয়ালকোট পৌঁছার কিছুদিনের মধ্যেই যোগাযোগ হলো দুজন বাঙালি ব্যাচেলর অফিসারের সঙ্গে। এঁদের একজন নজমুল হক (মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেন। একাত্তরের ২৭ সেপ্টেম্বর শহীদ হন)। তিনি জগন্নাথ কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। পিএমএতে আগে যোগ দিয়ে আমার সিনিয়র হয়ে যান। অবশ্য দুই কোর্স আমরা একত্রে ছিলাম। তাঁকে এখানে পেয়ে বেশ সুবিধা হলো। সিনিয়র হলেও আগের মতোই বন্ধুত্বের অটুট বন্ধন। ছুটির দিনে তাঁর সঙ্গে যেতাম সপরিবারে বসবাসকারী বাঙালি অফিসারদের বাসায়। তাঁদের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। ছুটির দিনগুলো প্রায়ই কাটাতাম কারও না কারও বাসায়। খাবারটাই ছিল বিশেষ আকর্ষণ। সবাই ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তাঁদের মধ্যে, বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় লে. কর্নেল এম এম হক ও তাঁর স্ত্রী মিসেস হকের কথা (মেডিকেল কোরের লে. কর্নেল এম এম হক পরে কর্নেল এবং একসময় বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা হন। ১৯৮৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন)। শিয়ালকোটে তিনিই ছিলেন বাঙালিদের মধ্যে সিনিয়র। আরও ছিলেন আর্টিলারির মেজর সিরাজুল ইসলাম, মেডিকেল কোরের মেজর আবদুল আউয়াল প্রমুখ (প্রয়াত)। এঁদের সবাই আমাদের আপনজন বলেই মনে করতেন। তাঁদের সান্নিধ্যে থাকলে মনে হতো, যেন দেশেই আছি। সপ্তাহ কয়েক বাসায় না গেলে মিসেস হক তো মেসে লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন। তাঁরাই আমাদের আপনজনদের অভাব পূরণ করতেন।

শিয়ালকোটে আসার পাঁচ মাসের মাথায় আর্টিলারি বেসিক কোর্স করতে যেতে হলো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নওশেরার আর্টিলারি স্কুলে।

এখানে কোর্স না করা পর্যন্ত গানার অফিসার হওয়ার যোগ্য হওয়া যায় না। কোর্স শেষে আবার শিয়ালকোটে পৌঁছালাম। কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। আমার ওপর ব্যাটারি কমান্ডার মেজর আইয়ুবের আক্রোশ যেন বেড়ে গেল। বেসিক কোর্সে আমার ফল ভালো হওয়ায় সিওসহ সবাই আমাকে বাহবা দিলেন একমাত্র মেজর আইয়ুব ছাড়া। অন্যদের মুখে শুনেছি, তিনি নাকি ওই কোর্সে সর্বনিম্ন গ্রেডের অধিকারী। বেসিক কোর্সে আমার ভালো ফল তাঁর মানসিক বেদনার কারণ হয়ে থাকতে পারে। ফলে আমার ওপর তাঁর অত্যাচার (মানসিক) বেড়ে গেল। অফিসের ও বাইরের সব ধরনের কাজ আমার ওপর চাপানো হতো, যা আমার পক্ষে ঠিকভাবে করা কঠিন ছিল। তাই কিছু ভুলভ্রান্তি হতে লাগল। আর তিনি সেই ভুল ধরে আমার ওপর আরও চড়াও হতে লাগলেন। অনেক কাজ আবার আমাকে সন্ধ্যার পর ইউনিট লাইনে অফিসে এসে করতে হতো। যখন অন্য অফিসাররা মেসে কিংবা শিয়ালকোট শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাকে তখনো কাজ করতে হচ্ছে। মেজর আইয়ুবের থিওরি হলো, অধস্তনদের কোনো কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা যাবে না, কোনো না কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি (খুঁত) বের করতেই হবে এবং তাদের সর্বক্ষণ চাপে রাখতে হবে। তাঁর সেই নীতিই আমার ওপর পুরোপুরি খাটানো হচ্ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ

পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে যুদ্ধাবস্থান

নওশেরা থেকে শিয়ালকোট ফেরার মাস দুয়েক পরের কথা। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাস। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ ও ভারতের গুজরাট সীমান্তের 'রান অব কচ্ছ' এলাকায় দুই দেশের সেনা মোতায়েন করা হয়েছে এবং উত্তেজনা বিরাজ করছে। একদিন শহরে সিনেমা দেখতে গিয়েছি। হঠাৎ ঘোষণা করা হলো, সেনাবাহিনীর আমরা যারা সিনেমা দেখছি, তারা যেন তখনই ইউনিট লাইনে চলে যাই। দ্রুত মেসে চলে এলাম। ঢুকতেই দেখি ট্রেইলারসহ জিপ দাঁড়িয়ে। আমার পাঞ্জাবি ব্যাটম্যান জিপে মালপত্র ওঠাচ্ছে। বলল, 'সাব, লড়াইকে লিয়ে সরহদ জানা হ্যায়।'

জিপ সামরিক সাজ-সরঞ্জামে ভর্তি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে ইউনিট লাইনে এসে পৌঁছাতেই দেখি এক এলাহি কাণ্ড। ছোট-বড় গাড়িতে আমার ব্যাটারির ছয়টি গানের (কামানগুলো গান নামে পরিচিত) পাশাপাশি অস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও রসদপত্র ওঠানো হচ্ছে। এসে পৌঁছাতেই ডাক পড়ল অ্যাডজুট্যান্ট অফিসে। ঢুকতেই অ্যাডজুট্যান্ট এই বলে চেঁচাতে লাগলেন, 'তোমার বিসি (ব্যাটারি কমান্ডার) কোথায়?'

আমি তো তাঁর খবর জানি না, আর জানার কথাও নয়। শুনে তিনি বললেন, 'তোমার ব্যাটারি নারোয়াল বর্ডারে ফার্স্ট লাইটের আগেই ডিপলয় (মোতায়েন) করতে হবে।'

রাত তখন ১১টা হবে। ঘণ্টা খানেক পর বিশালদেহি মেজর আইয়ুব তনোলি এসে উপস্থিত। এরই মধ্যে সাজ-সরঞ্জাম বোঝাই করা ব্যাটারির গাড়িগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়ে গেছে। এসবই যুদ্ধ-প্রস্তুতি (অপারেশনাল প্রসিডিউর) পদ্ধতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। ব্যাটারির একজন গানার (সর্বনিম্ন পদের সেপাইকে আর্টিলারিতে গানার বলা হয়) থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ব্যাটারি কমান্ডার পর্যন্ত সবারই যার যার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি নির্ধারিত থাকে। হুকুম পাওয়ার পরপরই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। সবাই যুগপৎ কাজ করতে থাকে।

যাত্রা-প্রস্তুতির সব কাজ তদারকি শেষ করে আমি অপেক্ষা করছিলাম ব্যাটারি কমান্ডারের নির্দেশের জন্য। তিনি আসার পর আমার ম্যাপখানা বের করতেই একটি জায়গা দেখিয়ে বললেন, সূর্যের আলো দেখার আগেই সেখানে পৌঁছাতে হবে। জায়গাটি পাকিস্তান-ভারত বর্ডার লাইন থেকে কয়েক মাইল ভেতরে। অল্প কিছু নির্দেশ দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করতে বললেন। সামরিক জীবনে এই প্রথম যুদ্ধযাত্রা। এর আগে বেশ কয়েকবার যুদ্ধমহড়ার জন্য গিয়েছি। তবে সীমান্ত এলাকায় কখনোই যাওয়া হয়নি। মনে দারুণ শিহরণ ও চাপা ভয়মিশ্রিত উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ছোট-বড় ধরনের গাড়ি ও ছয়টি ১০৫ এমএম গানসহ মোট ২৯টি গাড়ির বহর নিয়ে রওনা হলাম। বহরের পুরো ভাগে আমি একটি মাঝারি মাপের গাড়িতে। পেছনে পর্যায়ক্রমে গাড়িগুলো সাজানো। একটি গাড়িবহর নিয়ে যুদ্ধ এলাকায় পৌঁছাতে নানা ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। আমাদের নির্ধারিত গন্তব্যের দূরত্ব ৮০ মাইলের ওপর। শিয়ালকোট শহর এলাকা পর্যন্ত হেডলাইট জ্বলবে, তার পর থেকে শুধু সাইড লাইট জ্বালিয়ে যেতে হবে। এমপির (মিলিটারি পুলিশ) মোটরসাইকেল আরোহী কয়েকজন সদস্য গাড়িবহরের সামনে থেকে আমাদের শহরের বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দিল। এবার হেডলাইট নিভিয়ে শুধু স্বল্প আলোর সাইড লাইটের ওপর নির্ভর করে আমাদের গাড়িবহর চলতে লাগল। গাড়িতে দাঁড়িয়ে আগে-পিছে লক্ষ রেখে চলতে হচ্ছে। গোপনীয়তার প্রয়োজনে ওয়্যারলেস বন্ধ রাখতে হচ্ছে। পেছনের সারির কোনো গাড়ির কিছু হলে জানার উপায় হলো, কিছুদূর গিয়ে গিয়েই থেমে থেমে চেক করা। নারোয়াল থেকে বর্ডার আরও প্রায় ১২ মাইল। রাত তিনটায় সেখানে পৌঁছে গাড়িবহর থামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। বাকি রাস্তা লাইট পুরোপুরি নিভিয়ে চলার কথা আবারও সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। অন্ধকার কমে আসার আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেলাম। সাময়িক যুদ্ধ-প্রস্তুতিগত ব্যবস্থা যথারীতি শেষ করতে করতে ভোরের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এরই মধ্যে দেখি,

ব্যাটারি কমান্ডার তাঁর জিপ নিয়ে উপস্থিত। এসেই হুমকি-ধমকি শুরু করে দিলেন। বললেন, 'তুমি এ কী করছ? ঠিক দুশমনের সামনেই আস্তানা করেছ! (দুশমন বলতে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বোঝালেন) তোমার সবকিছু তো তারা লক্ষ করছে।'

তাঁর কথা শুনে আমি তো অবাক। তিনি যেদিকে দুশমনের অবস্থানের ইঙ্গিত দিলেন, সেটা একেবারেই ভুল। একটা উঁচু বাঁধের পেছন থেকে আমি ভালো করে রেকি করার পরই এখানে অবস্থান নিয়েছি। ফলে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে যখন তাঁকে বললাম যে দুশমন ওদিকে নয়, এদিকে অর্থাৎ বাঁধের বিপরীত দিকে, তখন তিনি রীতিমতো চুপ হয়ে গেলেন। এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল চা-নাশতা। তিনি শুধু চা খেয়ে চলে গেলেন ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যোগ দিতে।

আমাদের ব্যাটারিকে একটি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের আর্টিলারি ফায়ার সাপোর্টের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এরই অধীনে ৩ এফএফ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের সঙ্গে আমাদের মোতায়েন করা হলো। সারা দিন রেকি করে রাতে গানগুলো ডিপ্লয় করে ফেললাম। গান ব্যাটারি সাধারণত প্রতিরক্ষা লাইনের তিন থেকে পাঁচ মাইল ভেতরে ডিপ্লয় করা হয়ে থাকে, যাতে সহজেই শত্রুপক্ষের সম্মুখ-অবস্থানের ওপর গোলা নিক্ষেপ করা যায়। কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের সামরিক অবস্থান ও অন্যান্য প্রস্তুতির মাধ্যমে আরও মজবুত আস্তানা গড়ে তুললাম। পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়েই বর্ডার। এই জেলা অনেকটা বাংলাদেশের মতোই। সামনেই বিভক্ত পাঞ্জাবের ভারতীয় অংশ। সেখানে রাভি নদী দুই দেশের সীমানা জুড়ে আছে। যে এলাকায় আমরা অবস্থান নিয়েছি, তার আশপাশে আবাদি কৃষিজমিতে গমের ছড়াছড়ি। গ্রামগুলো দূরে দূরে। বাংলাদেশের মতোই গ্রামের মাঝামাঝি অবস্থানে কোথাও ছোট, কোথাও বা বড় আকারের কৃষিজমির মাঠ। গ্রামের আশপাশে গাছগাছালির ঝাঁক। প্রতিটি মাঠেই রয়েছে পানি সেচের ব্যবস্থা। কূপ থেকে মোষের সাহায্যে টেনে পানি তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। কোথাও কোথাও রয়েছে বিদ্যুচ্চালিত সেচযন্ত্রের গভীর কূপও। আমাদের অবস্থানের পাশেই ছিল ছোট একটা গ্রাম। সকাল থেকেই লোকজন মাঠে নেমে যায় কাজে। মাঠের কাজে মেয়েদের সংখ্যাও লক্ষ করার মতো। এদিকে দিন কয়েকের মধ্যেই আমরা বেশ গুছিয়ে নিলাম। স্থানীয় বা গ্রামের লোকজনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখার তেমন সুযোগ ছিল না। দূর থেকে তারা আমাদের দেখত, আমরাও তাদের একইভাবে দেখতাম। খুব প্রয়োজন হলে কাউকে কাউকে ডেকে নিয়ে আসা

হতো। ব্যাটারি কমান্ডার একবার এখানকার গ্রামের প্রধানদের ডাকলেন। তাঁরা খুব খুশি হলেন আমাদের কাছে আসতে পারায়। যুদ্ধে মোতায়েন থাকা অবস্থায় সাধারণত তেমন কাজ থাকে না। যুদ্ধ বেধে না যাওয়া পর্যন্ত এ রকম একটা অবস্থা ভালোই। অবশ্য সেনানিবাসে স্থায়ী বাসস্থানের যে সুযোগ-সুবিধা, মাঠে সেটা অনুপস্থিত। বিদ্যুৎ নেই। ছয়-সাত ফুট নিচে বাংকারে থাকার ব্যবস্থা আমাদের। আবহাওয়া সবে বিরূপ হতে শুরু করেছে। দিনের গরমে গাছের ছায়ার আশ্রয়ে বসাও কঠিন।

প্রায় মাস তিনেক এভাবে কাটানোর পর ক্যান্টনমেন্টে ফেরার আদেশ হলো। পুরোনো জায়গায় আবার ফিরে এলাম। আবারও শুরু হলো একঘেয়েমি রেজিমেন্টাল জীবন। যত দিন বর্ডারে ছিলাম, ব্যাটারি কমান্ডার মেজর আইয়ুব আমাদের কাছে তেমন আসতেন না। সে সময় তাকে যেতে বা থাকতে হতো ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের ট্যাকটিক্যাল হেডকোয়ার্টার যেখানে থাকে, ঠিক সেখানে। ব্যাটারির যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ তিনি আমার ওপরই ছেড়ে দিলেন। কোনো বিষয়ে তিনি কিছুই বলতেন না। অথচ মূল দায়িত্ব তাঁরই। স্বাভাবিকভাবে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তখন আমার সামান্যই। অনেক বিষয়েই কিছু জানতাম না। যুদ্ধের সময় আসল গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপারস্যাপারের ওপর। প্রশাসনিক বিষয়গুলো যথেষ্ট জটিল। ফাইল, কাগজপত্র, নিয়মকানুন ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে আছে খাবার সরবরাহ থেকে শুরু করে সবকিছুর ব্যবস্থা ও হিসাবপত্র। একটি সেনাদল যখন মাঠে নামে, তখন তার পরিচালনাগত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ফাঁকফোকর থাকে না। খাওয়ার পানিটাও গ্রামের টিউবওয়েল থেকে নেওয়া যাবে না। পানি সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। সেখান থেকে ট্রেইলারে করে পানি আসবে। তেমনিভাবে খাবারদাবারের, অর্থাৎ রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। রান্নার কাজটা কেবল নিজেদের বাবুর্চিরা করবে। সবকিছুই রুটিনমাফিক চলে, কাগজে যার হিসাবপত্র রাখা সত্যিই এক কঠিন ব্যাপার। ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসার পর শুরু হলো হিসাব-নিকাশের পালা। রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টার থেকে সবকিছুর লেজার ফাইলপত্র দেখাদেখি শুরু হলে টনক নড়ল ব্যাটারি কমান্ডারের। তিনি তো কোনো কিছুই দেখতেন না। সুতরাং, অনেক কিছুর ঘাটতি দেখা দিল। আমি তো এসবের সামান্যই বুঝতাম। আসলে ব্যাটারির এসব কাজ চালাতেন সুবেদার, হাবিলদার মেজর, হাবিলদার কোয়ার্টার মাস্টার, করণিক প্রমুখ (যাকে বলা হতো বাবু)। সই করার জন্য আমার কাছে নিয়ে এলে নির্দিষ্ট জায়গায় আমি সই করে দিতাম। ফলে হলো কি, মেজর আইয়ুব সব দোষ আমার ওপর চাপিয়ে

দিলেন। কখনো বলতেন তিনি আমাকে কোর্ট মার্শালে দাঁড় করাবেন, আবার কখনো বলতেন চাকরিচ্যুত করবেন ইত্যাদি। এ রকমভাবেই চলল কিছুদিন। এদিকে রেজিমেন্টে আরও কয়েকজন অফিসারের পোস্টিং হলো। দুজন আমার জুনিয়র। সব মিলিয়ে আমরা জুনিয়ররাই দলে ভারী। সবকিছু সত্ত্বেও এরই মধ্যে আমার প্রমোশনও হয়ে গেল। এখন থেকে আমি লেফটেন্যান্ট। আমার সঙ্গে মেজর আইয়ুব যে বাড়াবাড়ি করছেন, তত দিনে রেজিমেন্টে সেটা বেশ চাউর হয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি অনেকটাই চুপ।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা

ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এসে মনে করলাম, কঠিন দিনগুলো পার করে এসেছি। কিন্তু না, আমার সে ধারণা ভুল। আবার পাকিস্তান-ভারত সম্পর্ক অবনতির দিকে। সম্ভবত সেটা জুলাই মাস। কাশ্মীর সীমান্তে তখন ছোটখাটো সংঘর্ষ বাধতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল তার পরিমাণ। এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যায় ব্যাটম্যান এসে খবর দিল, 'সাব, জং কা লিয়ে সরহদ জানা হায়।'

ততক্ষণে জিপ এসে গেছে। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যা যা দরকার, তা নিয়ে রেজিমেন্টের অবস্থানে চলে গেলাম। এবার শুধু আমার রোমিও ব্যাটারি নয়, রেজিমেন্টের সবাইকে যেতে হচ্ছে। শিয়ালকোটে অবস্থিত পুরো ১৫ ডিভিশন এবার যুদ্ধের জন্য সীমান্তে অবস্থান নিতে যাচ্ছে। ক্যান্টনমেন্টজুড়ে শুরু হয়ে গেছে রীতিমতো তাণ্ডব। ভোর হওয়ার আগেই যার যার নির্ধারিত এলাকায় নিজেদের মোতায়েন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমার ব্যাটারিকে সেই নারোয়াল সীমান্তের পুরোনো জায়গায় মোতায়েন করতে হবে। আমার জন্য কোনো অসুবিধাই হলো না, বরং ভালোই হলো। এবার ব্যাটারিতে মেজর আইয়ুব ছাড়া আরও আছেন ক্যাপ্টেন হামিদুল্লা খান সোম্বল। তিনি কিছুদিন আগে যোগ দিয়েছেন। অবজারভারের দায়িত্ব পালন করবেন। আর আমি জিপিও হিসেবে তো আছিই। ভোর হওয়ার আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গে গান ডিপ্লয় করে প্রাথমিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। ব্যাটারির সবাই যার যার জায়গায় সত্বরই পৌঁছে গেল। আগেকার অভিজ্ঞতা খুব কাজে এল। শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণ শুরু হলে যাতে ত্বরিত প্রতি-উত্তর দেওয়া যায়, সে রকম প্রাথমিক প্রস্তুতি নেওয়ার পরপরই আমাদের অবস্থান আস্তে আস্তে আরও শক্ত করে নিলাম।

এভাবে দেখতে দেখতে প্রায় দুই মাস পার হয়ে গেল। এর মধ্যে ব্যাটারির দু-তিনটা অবস্থান বদল করতে হয়েছে। এমনটা করতে হয় সাধারণত রণকৌশলগত কারণে।

প্রচণ্ড গরম। ফিল্ডে থাকাটা যথেষ্ট কঠিন। তবে সবকিছুতে এখন মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ক্যান্টনমেন্টের স্থায়ী অবস্থান ছেড়ে ফিল্ডে এসে তুলনামূলকভাবে অনেকটা ভালো বলতে হবে। নিজস্ব কর্মপরিধি বলে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনেক স্বাধীনতা রয়েছে। জুনিয়র অফিসার হলেও ব্যাটারির গান পজিশনের পূর্ণ কমান্ড জিপিওর হাতেই থাকে। জনবল, অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদির প্রায় ৯৫ শতাংশই থাকে গান পজিশনে। এর নেতৃত্বে থাকে জিপিও, যিনি লেফটেন্যান্ট বা ক্যাপ্টেন র‍্যাংকের হয়ে থাকেন। ব্যাটারি কমান্ডার (যিনি মেজর) ও তিনজন অবজারভার (ক্যাপ্টেন র‍্যাংকের) থাকেন ফ্রন্ট লাইনে ইনফ্যান্ট্রি কোম্পানি ও ব্যাটালিয়ন অবস্থানের সঙ্গে। বাস্তব যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখি এদের অবস্থান। প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ছোট দল থাকে, যা প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ি ও ওয়্যারলেস সেট ইত্যাদিতে সজ্জিত। যুদ্ধ বেধে গেলে তাঁরাই ওয়্যারলেস সেটে নির্দেশ দিয়ে শত্রুর অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণ করান। ব্যাটারি আমার অধীন—এটাই আমার বড় গর্ব। গর্বের মূলে ছিল প্রায় দেড় শ গানার (সেনা), যাদের সঙ্গে নিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টা জড়িত ছিল। বস্তুত, এ রকম পরিস্থিতিতেই গড়ে ওঠে যুদ্ধকালীন বিশেষ সম্পর্ক। বিপদ-আপদে একসঙ্গে থাকার ফলে সেনা ও অফিসারের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগগত সুন্দর বন্ধন গড়ে ওঠে। আমার ব্যাটারিতে মোট ১৬ জন ছিল বাঙালি, বাদবাকি সবাই পাঞ্জাবি। আমার প্রতি প্রত্যেকেরই আনুগত্য ও আস্থা ছিল প্রচুর। নুরুল ইসলাম নামের এক বাঙালি গানারের কথা এখনো মনে পড়ে। সে আমার জন্য মাঝেমধ্যে ভাত ও মাছ রান্না করে খাওয়াত। একদিন বাজার থেকে নিয়ে এল আহমেদের এক বোতল আমের আচার। ভাতের সঙ্গে খেতে চমৎকার লাগত। ওই স্বাদটা এখনো যেন ভুলতে পারি না।

আগস্টের মাঝামাঝি জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্ত থেকে প্রতিদিনই ছোটখাটো সংঘর্ষের খবর আসছিল। কয়েক জায়গায় পাকিস্তানি ও ভারতীয় বাহিনী একে অন্যের এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। হতাহতের খবরও পাওয়া যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একদিন সকালে দেখি, একটি ছোট ভারতীয় জঙ্গি বিমান খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। সেটাকে ধাওয়া করছে দুটি পাকিস্তানি এফ-১০৪ জঙ্গি বিমান। অল্পক্ষণের মধ্যেই খবর পেলাম, নারওয়ালের কাছে ভারতীয় বিমানটি নেমে পড়েছে। ওখানে একটি পুরোনো রানওয়ে ছিল। খবর শোনামাত্র জিপ নিয়ে সেখানে ছুটে গেলাম। পৌঁছাতেই দূর থেকে দেখি বিমানটির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন পাইলট। গ্রামের কিছু লোকজন ঘিরে রেখেছে পাইলট ও বিমানটি। আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন সোম্বলও পৌঁছে গেলেন। তিনিই প্রথম হাত বাড়িয়ে পাইলটের সঙ্গে

হ্যান্ডশেক করলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে ঘটনাস্থলে আরও লোকজন জড়ো হয়ে গেল। একজন ফটোগ্রাফার ভারতীয় পাইলট ও তাঁর বিমানসহ আমাদের ছবি তুললেন। এই প্রথম ভারতীয় জঙ্গি বিমানের একজন পাইলটকে তাঁর বিমানসহ কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। ঘুরে দেখে নিলাম বিমানটি। আকারে ছোট 'ন্যাট' নামের ফ্রান্সের তৈরি বিমান। স্থলযুদ্ধরত বাহিনীকে সাহায্য করতেই এটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার লেজে শোভা পাচ্ছে ভারতীয় পতাকা এবং পেটে বিমানবাহিনীর গোল চিহ্ন আঁকা। ককপিটের ঘড়িতে চলমান ভারতীয় সময়সংকেত। সোম্বল জিপে বসিয়ে পাইলটকে ডাকবাংলোয় নিয়ে চললেন। আমিও চললাম তাঁদের পেছনে পেছনে। ডাকবাংলোর সঙ্গেই ৩ এফএফের (ফ্রন্টিয়ার ফোর্স) ক্যাম্প। একটি রুমে তাঁকে ঘিরে আমরা কয়েকজন বসলাম। ভারতীয় পাইলটের চোখ-মুখে আতঙ্ক ও বিষণ্নতার ছাপ। মানসিকভাবে যে তিনি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে, সেটা তাঁর মুখের ভাবভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। নামধাম জিজ্ঞেস করা হলে উত্তর দিলেন ইংরেজিতে। স্কোয়াড্রন লিডার তিনি। নাম সিকান্দ। জাতিতে শিখ। বাড়ি পূর্ব পাঞ্জাবের কাপুরথলা জেলায়। অর্থাৎ এখান থেকে তাঁর বাড়ির দূরত্ব ১০০ মাইলের কম হবে। ক্যাপ্টেন সোম্বল ও আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবিতে কথা বলতে শুরু করলেন। এদিকে ডাকবাংলোর বাইরে আনন্দে আত্মহারা হাজার হাজার মানুষের ভিড়, যেন একটা বিরাট বিজয় হয়েছে আমাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন। এ ঘটনায় সবারই মন খুব চাঙা। পরে শুনলাম, ওই দিন ছাম্ব-জোড়িয়া সেক্টরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই প্রথম পাকিস্তানি ও ভারতীয় জঙ্গি বিমানও ডগফাইটে (আকাশে সম্মুখযুদ্ধ) লিপ্ত হলো। এই সেক্টরের যুদ্ধ যে আরও ছড়িয়ে পড়বে, এমন আশঙ্কা দেখা দিলেও বড় আকারে যুদ্ধ শুরু হবে বলে মনে হচ্ছিল না। অন্তত আমাদের স্তরের অফিসার, যারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে শত্রুপক্ষের সামনাসামনি অবস্থান করছিল, তাদের অনেকেরই এমনই ধারণা ছিল।

১৯৬৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পরপরই আমি যথারীতি গান পজিশনগুলো ঘুরে দেখতে বের হলাম। আমার সঙ্গে আছেন ব্যাটারি সুবেদার ও হাবিলদার মেজর। দুজনই কমান্ড পোস্টে টেকনিক্যাল কাজেও পারদর্শী। হাবিলদার মেজর কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, যুদ্ধ কি শুরু হবে?'

আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, কেন? ভয় পাচ্ছ নাকি?

ভ্যাবাচেকা খেয়ে সে বলল, 'না, ভয় পাচ্ছি না, তবে মনে হচ্ছে যুদ্ধ লাগবে।'

বললাম, তাহলে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকবে। আমাদের পজিশনগুলো শক্ত করেই প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি গান অর্ধেকটা পর্যন্ত মাটির নিচে এবং চারদিকে বালুর বস্তার দেয়াল; গোলাগুলি করার জন্য আলাদা বাংকার। গানারদের থাকারও ব্যবস্থা আলাদা বাংকারে। প্রায় ছয় ফুট গভীরে কমান্ড পোস্টের বাংকার। ছাদটাও মজবুত কাঠ ও টিনে ছাওয়া। তার ওপর আবার মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে। এর পাশেই জিপিও, অর্থাৎ আমার থাকার বাংকার। সেটাও মজবুত করে তৈরি করা। আবার অন্যান্য ব্যবস্থাও এ রকমেরই মজবুত ভিত্তির ওপর গড়ে তোলা। যুদ্ধ শুরু হলে গান পজিশনগুলো শত্রুপক্ষের দূরপাল্লার গান ও বিমান হামলার শিকার হয়। এমন অবস্থায় টিকে থেকে নিজেদের গানগুলো থেকে গোলা নিক্ষেপ করার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে। আমার নিত্যসঙ্গী ছিল একটি চার ব্যান্ডের ছোট ন্যাশনাল রেডিও। খবর শোনা, বিশেষ করে বিবিসির খবর ও রেডিও সিলনের গান শোনা। বিনোদন বলতে এটুকুই ছিল সম্বল। ১০টা বা সাড়ে ১০টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়তাম।

৬ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে তিনটার দিকে প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। গোলা ফাটার ও অন্যান্য ছোট-বড় অস্ত্রের গোলাগুলির শব্দ সচকিত চারদিক প্রথমেই আঁচ করতে চাইলাম গান পজিশনের ওপর আক্রমণ হচ্ছে কি না। এরই মধ্যে হাবিলদার মেজর ঢুকে বলল, 'স্যার, ফ্রন্ট লাইন থেকে শব্দ আসছে। মনে হয়, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।'

তাকে ব্যাটারি স্ট্যান্ড টু (প্রস্তুতি) পজিশনের নির্দেশ দিতে বলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে কমান্ড পোস্টে গিয়ে ঢুকলাম। একটি ব্যাটারি গান পজিশনের কেন্দ্রবিন্দু হলো কমান্ড পোস্ট। এখানেই গানগুলো থেকে শত্রুর অবস্থানের ওপর গোলা নিক্ষেপের সব টেকনিক্যাল ডাটা বা তথ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়। প্রতিটি গানের অবস্থানের কাছে টেনয়ের মাধ্যমে (সে সময়ের একধরনের ইন্টারকম সিস্টেম) কমান্ড পোস্টের নির্দেশ যায়, যেটা গানাররা উচ্চ স্বরে শুনতে পায় এবং গানের দিক ও দূরত্বের ডাটা বসিয়ে গোলা ছোড়ার জন্য গানগুলোকে তৈরি করে। অন্যদিকে অ্যামুনিশন বাক্স থেকে সেল, কার্টিজ ও চার্জগুলো বের করে পূর্ণাঙ্গ গোলা সংযোজন করতে হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি গান সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলাম।

ওদিকে একটু থেমে থেমে গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসছে। ওয়্যারলেস সাইলেন্স ভঙ্গ করে ব্যাটারি কমান্ডার ও অবজারভার অফিসারদের কলের অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু তাঁদের দিক থেকে কোনো সাড়া নেই।

অন্যদিকে আমার টেলিফোন অপারেটর ৩ এফএফের ট্যাকটিক্যাল হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তাদের ওপরই অতর্কিত হামলা হওয়ায় টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কমান্ড পোস্ট ওয়্যারলেস অপারেটর বারবার তাদের ডেকে চলেছে। কোনো উত্তর বা সাড়াশব্দ নেই। এদিকে সামনের অবস্থান থেকে গোলাগুলির শব্দের বিরাম নেই। সে অবস্থানটা একটু বাঁ দিকে। বুঝলাম, সেখানে ৩ এফএফের যে কম্পানি রয়েছে, তার ওপরই শত্রুপক্ষের আক্রমণ হয়েছে। সেখানে আবার আর্টিলারি গান সাপোর্টের জন্য অবজারভার দেওয়া হয়নি। দুজন অবজারভারই ডান দিকের কোম্পানিতে ছিল। কাজেই কেউ গান সাপোর্টের জন্য আমাকে নির্দেশ দিতে পারছে না। এদিকে দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। আমরা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছি, গানাররাও বারবার জানতে চাচ্ছে, কখন ফায়ার করব! তারাও বুঝতে পারছে, হামলা হয়েছে অথচ আমরা পাল্টা ফায়ার করতে অর্থাৎ গোলাবর্ষণ করতে পারছি না।

এরই মধ্যে শুনলাম, ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মুজাফ্ফর আহমেদ কমান্ড পোস্টে আসছেন (কয়েক বছর পর মেজর জেনারেল হয়ে ঢাকায় ১৪ ডিভিশনের জিওসি হয়েছিলেন)। বাইরে আসতেই আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'তুমি কাজ করে যাও।'

তিনিও ভেতরে ঢুকলেন। আমি জানালাম, আমরাও সব দিক দিয়ে তৈরি আছি। কেবল ফায়ার কলের (নির্দেশ) অপেক্ষায় আছি।

এরই মধ্যে ওয়্যারলেস সেটে ব্যাটারি কমান্ডারের প্রথম ফায়ার কল পেলাম। তিনি একটা টার্গেট দিলেন। সাতটা পাঁচ মিনিটে আমাদের প্রথম পাল্টা গোলা শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করে ছোড়া হলো। এর পর থেকে একটার পর একটা টার্গেট কল আসতে থাকল। আর আমরা প্রবল উৎসাহ নিয়ে ফায়ার সাপোর্ট দিয়ে যেতে লাগলাম। কখনো ক্যাপ্টেন সোম্বল কখনো মেজর আইয়ুব টার্গেট নির্দেশ করে আমাদের দিয়ে ফায়ার করাতে লাগলেন। এভাবেই চলল সারা দিন ও সারা রাত। দুই পক্ষের মধ্যেই চলতে লাগল প্রচণ্ড যুদ্ধ। আমরা একটু পেছনে বলে যুদ্ধের আসল রূপটা দেখতে পারছিলাম না। তবে গোলাগুলির শব্দ ও ওয়্যারলেস সেটে চলা নানা কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি। প্রায় ৩০ ঘণ্টার মতো আমি কমান্ড পোস্ট বাংকারে থেকে ফায়ার পরিচালনা করেছি। একবারও বাইরে আসার সময় ও সুযোগ হয়নি। এর মধ্যে কখনো কিছু খেয়েছি বা বিশ্রাম নিয়েছি বলে মনে পড়ে না। দুই দিন পর সকালের দিকে যুদ্ধের তীব্রতা কমে এল। ফায়ার সাপোর্টের জন্য আর টার্গেট

কল আসছিল না। আমার হাবিলদার মেজর বলল, 'স্যার, বাইরে আসুন।' বলেই দস্তুর মতো ধরে আমাকে ওপরে নিয়ে এল। কমান্ড পোস্টটা ছিল দুটি আখখেতের মধ্যে। দেখি, একটা দেশি খাটিয়া (সে দেশের একধরনের সহজে বহনযোগ্য চারপাই) সেখানে পাতা। বলল, 'স্যার, এই দুই দিন আপনি কিছু খাননি, রেস্ট নেননি, ঘুমাননি পর্যন্ত। এখন রেস্ট করুন, ফায়ার চাইলে আমি দেখব।'

পাশেই ছিল ছোট একটা গ্রাম। বলল, গ্রামের লোকেরা জড়ো হয়েছে। তারা এখানকার অফিসারকে, অর্থাৎ আমাকে দেখতে চায়। অনেকের হাতে খাবার ও দুধের হাঁড়ি। আরও দেখলাম, গ্রামের লোকজন দূরে থেকে আর্টিলারির গোলা বয়ে এনে আমাদের গানগুলোয় পৌঁছে দিচ্ছে। রাতে অ্যামুনিশন রিপ্লেনিশকারী বাহিনী রাস্তার পাশে গোলাগুলো রেখে গিয়েছিল। হাবিলদার মেজরকে জিজ্ঞেস করলাম, ওদের ডাকলে কেন?

বলল, তারা স্বেচ্ছায় এ কাজ করে দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত বিশ্রাম হলো না। এক গ্লাস দুধ ও কিছু রুটি খেয়ে গানারদের দেখতে গানগুলোর অবস্থানে চলে গেলাম। আসল কাজ, অর্থাৎ গোলা ছোড়ার কাজ তারাই করছে। শারীরিক ধকল তাদের ওপর দিয়ে গেছে। কেউ কেউ খুবই ক্লান্ত। গান লোডিং করতে করতে কোনো কোনো লোডারের হাত পর্যন্ত জখম হয়ে গেছে। সেদিনটা অবশ্য কিছুটা নিরুপদ্রবেই কাটল। তবে সামান্য বিরতি দিয়ে দিয়ে ভারতীয় জঙ্গি বিমানকে খুব নিচু দিয়ে এদিক-সেদিক ওড়াউড়ি করতে দেখতে পেলাম। এই অবস্থায় আমাদের নিজস্ব এয়ার অ্যালার্ট সেন্ট্রি বাঁশি বাজালে সবাই বাংকারে গিয়ে আশ্রয় নিই। তখন হেভি মেশিনগান নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয়। কোনো বিমান যদি গান পজিশন দেখতে পায়, তাহলে আর রক্ষা নেই। তৃতীয় দিনের মাথায় রাতের বেলা আমরা গান পজিশন বদলালাম। দুই দিন নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে অন্য কোথায় কী হচ্ছে, জানতে পারিনি। শুধু এটুকু জানি, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় সীমান্ত অতিক্রম করেছে। সময় পেলেই রেডিওতে খবর শুনি আর রাতে বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠান শুনি। বুঝতেই পারছিলাম, উভয় দেশের রেডিওই নিজ নিজ পক্ষের বিজয়ের খবর শোনাচ্ছে। কে কার পক্ষের কতটি বিমান ঘায়েল করেছে, কত জন নিহত হয়েছে, কোন এলাকা কতটা দখল করেছে—এসবই মূল বা বিশেষ খবর।

ভারতীয় বাহিনীর বেষ্টনীর মুখে

নতুন গান পজিশনে পৌঁছে খুব সকালেই (সম্ভবত চতুর্থ দিন) শত্রু এলাকার টার্গেটে ফায়ার করা শুরু হলো। প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। ফায়ার চলার সময় হঠাৎ করেই ব্যাটারি কমান্ডার কথা বলার জন্য ওয়্যারলেস সেটে আমাকে ডাকলেন। জবাব দিতে কমান্ড পোস্টের বাইরে এলাম। তিনি শুধু কয়েকটি কথা বলে সেট ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'তুমি এখনই ব্যাটারি নিয়ে গুজরানওয়ালা হয়ে শিয়ালকোটের দিকে যাত্রা করো।' ১০ মিনিট পর আবার ডাকলেন। ডেকে জানতে চাইলেন, আমি রওনা হয়েছি কি না। বললেন, 'এক্ষুনি যাত্রা শুরু করো, শুধু গানগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। নন এসেনশিয়ালগুলো বাদ দাও।'

তখন সকাল ১০টা বাজে। তাঁর হুকুম শুনে তো আমি তাজ্জব। দিনের বেলায় ব্যাটারি নিয়ে বের হওয়া তো আত্মহত্যার শামিল। গতকাল দিনের দিকে ভারতীয় জঙ্গি বিমানগুলো খুবই তৎপর ছিল। শুনেছি, নারোয়ালের কাছে কয়েকটি ট্রাকের ওপর রকেট হামলা করা হয়েছে। শুধু এতটুকু বুঝলাম, পরিস্থিতি খারাপ। আমাদের কথাবার্তা ইংরেজিতে হয়েছে। আশপাশের সেনারা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। আমি নিজে খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলাম। পরিস্থিতি যে গুরুতর, সেটা বুঝতে পারলে সেনাদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। খুব ভোরেই হাবিলদার মেজর আমাকে বলেছিল, ইনফ্যান্ট্রির একটি দল গত রাতে আমাদের অবস্থানের ঠিক পেছনেই ট্রেঞ্চ খুঁড়ছিল। আমি খবরটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। এখন মনে হলো ইনফ্যান্ট্রির কোনো দল যদি আর্টিলারি গান পজিশনের পেছনে অবস্থান নেয়, তাহলে বুঝতে হবে তারা ফ্রন্ট লাইনে টিকে থাকতে পারছে না, অর্থাৎ উইথড্র (পশ্চাদপসরণ) করছে। আমি স্বাভাবিক অবস্থার সময়ের মতোই গান উইথড্র করার আদেশ দিলাম। গান পজিশনে সাধারণত বড় গাড়িগুলো, যা দিয়ে গানগুলো টানা হয়, সেগুলো থাকে না। দূরে, সুবিধাজনক অবস্থানে সেগুলো লুকানো থাকে। গান মোতায়েন ও উইথড্রয়ের কাজ বিশেষ পদ্ধতিতে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে হয়। যাক, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পজিশন ত্যাগ করে প্রায় তিন ডজন গাড়ি নিয়ে কাঁচা রাস্তা পার হয়ে নারোয়ালের সড়কে যখন উঠলাম, তখন যে দৃশ্য নজরে পড়ল, সেটা আমাকে অবাক না করে পারল না। পুরো রাস্তায় সামরিক গাড়ির জট। কোথাও চার-পাঁচটি সারিবদ্ধ গাড়ি, কোথাও বা একটি গাড়ি। আর তাদের সবই পেছনের দিকে যাচ্ছে। বুঝতে আর বাকি রইল না, আমরা পিছু হটছি। সম্ভবত ভারতীয় বাহিনী বড় এলাকার একটা বড়

অংশে ঢুকে পড়েছে। নারোয়াল শহরের ভেতর দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন শত শত লোক রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছে। মনে মনে ভাবলাম, দিনের বেলায় যে আমরা পিছু হটছি, তারা কি বুঝতে পারছে না, কী হচ্ছে? ততক্ষণে আমার মনে অনেক দুশ্চিন্তা ভর করেছে। ভাবলাম, আমরা তো সরে পড়ছি, কিন্তু এই লোকগুলোর কী হবে! এদের রক্ষা না করেই আমরা সরে পড়ছি! আরও সামনে যখন এগোলাম, দেখি ১০-১২টা ট্যাংকও রাস্তার দুই পাশ দিয়ে পেছনের দিকে যাচ্ছে। আমার এখন বড় চিন্তা, কখন না আবার ভারতীয় জঙ্গি বিমান এসে যায়! তাদের জন্য এখানে চমৎকার টার্গেট তৈরি হয়ে আছে—গান, ট্যাংক ও গাড়ির বহর। গতকাল আকাশে তাদের যে তৎপরতা দেখেছি, সে রকম কিছু হলে তো আর উপায় নেই। নিশ্চিত একটা ম্যাসাকার হয়ে যাবে। সর্বক্ষণ আল্লাহর নাম নিচ্ছি। চার-পাঁচ মাইল অগ্রসর হওয়ার পর দেখি, গাছগাছড়ায় ঘেরা রাস্তার একটি অংশে মিলিটারি পুলিশসহ বেশ কিছু সেনা। দূর থেকেই তারা আমাদের থামার ইশারা করল। কাছে আসতেই দেখলাম ব্রিগেড কমান্ডার দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারের ভড়কে যাওয়ার দশা। সে গাড়ি থামাবে না। আমাকে বলল, 'স্যার, ইয়ে তো জাসুস হ্যায়।' তার ধারণা, ভারতীয়রা আমাদের ধরে ফেলছে। গাড়ি থামিয়ে কমান্ডারের কাছে যেতেই তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'তোমরা নিরাপদ, কোনো ভয় নেই। ফিরে গিয়ে আগের গান পজিশনেই ডিপ্লয় করে তৈরি থাকো।'

আশ্বস্ত হয়ে গাড়িগুলো ঘুরিয়ে আগের পজিশনে এসে ডিপ্লয় করতে করতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেলেও কোনো ভারতীয় জঙ্গি বিমানের দেখা পেলাম না। নিশ্চয়ই আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে রক্ষা পেয়েছি।

ব্যাটারি কমান্ডার ও অবজারভারের সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও যোগাযোগ স্থাপন করা যাচ্ছিল না। তাদের ওয়্যারলেস সেটগুলো হয় বন্ধ, না হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর অবজারভার, অর্থাৎ ক্যাপ্টেন সোম্বল সেটে কথা বললেন। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাটারি কমান্ডার কোথায়, কী অবস্থায় আছেন? জবাবে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে জানালেন। শুধু এটুকুই বললেন, এখন থেকে তিনি ব্যাটারি কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করবেন। আমরা সবাই এখন মেজর আইয়ুবের জন্য চিন্তিত। সে রাতে আমাদের ফ্রন্টে, অর্থাৎ নারোয়াল-জাফরওয়াল বর্ডারজুড়ে সুনসান নীরবতা। গোলাগুলির কোনো শব্দ নেই। রাতে ব্যাটারি কমান্ডারের পার্টির সঙ্গে যে দলটি থাকে, তার দলনেতা হাবিলদার মোহাম্মদ হোসেন এসে উপস্থিত। আমার ব্যাটারিতে তিনি

বাঙালিদের মধ্যে সিনিয়র। তাঁর কাছ থেকে গত দু-তিন দিনের যুদ্ধের বর্ণনা শুনলাম। প্রথম রাতেই ৩ এফএফের আলফা কোম্পানির ওপর হামলা হয়। সেখানে রাভি নদীর ওপর যে পরিত্যক্ত ব্রিজ ছিল, তার ওপর দিয়ে ভারতীয়রা এপারে চলে আসে। পরের দিন আমাদের পাল্টা আক্রমণে তারা পিছু হটে যায়। আমাদের তরফেও হতাহতের কিছু ঘটনা ঘটেছে; তাদেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কয়েকজনের লাশ নদীর পাড়ে পড়ে ছিল। কিন্তু তৃতীয় রাতে আবারও ভারতীয়রা আক্রমণ করে ও প্রচণ্ড গোলাগুলি চলে। সে সময় আমাদের ব্যাটারি থেকে যে অবিরাম গোলাবর্ষণ করেছি, তাতে নাকি খুব কাজ হয়েছে। ভারতীয়দের এপারে আসা থেমে গেছে। তবু একপর্যায়ে ৩ এফএফ ভয় পেয়ে পিছু হটে পালিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে ব্যাটারি কমান্ডারও পালিয়ে যান। তিনি জানালেন, তাঁর জিপ আর মালপত্র ওখানেই রয়ে গেছে। ৩ এফএফেরও গাড়ি ও নানা সরঞ্জামও পড়ে আছে। রাভি নদীর এপারটা ছিল আমাদের দখলে। হাবিলদার মোহাম্মদ হোসেনের মতে, পুরো জায়গাটা তখন খালি পড়ে ছিল, দুই পক্ষের কেউই সেখানে নেই। তাদের দলের চারজন কিছুটা দূরে পেছনে এসে লুকিয়ে ছিল। সন্ধ্যার দিকে যখন বুঝতে পারল কেউ নেই, তখন আস্তে আস্তে তাদের গাড়ির কাছে যায় এবং ওয়্যারলেস সেটসহ সরঞ্জামাদি নিয়ে চলে আসে। আরও বলল, ৩ এফএফের অবস্থান একেবারেই লোকশূন্য। বহু মালপত্র সেখানে পড়ে আছে। ব্যাটারি কমান্ডারের জিপও পড়ে আছে সেখানে। পরে আস্তে আস্তে পুরো যুদ্ধ-পরিস্থিতি বোঝা গেল। এই ফ্রন্টে আক্রমণের দুই দিন পর ভারতীয় বাহিনী একটি সাঁজোয়া (আরমার্ড) ডিভিশন নিয়ে পাসরুর সীমান্তে আক্রমণ করে পাকিস্তানি বাহিনীর ১৫ ডিভিশনের মূল অবস্থানের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারা প্রায় আট মাইল অভ্যন্তরে অর্থাৎ শিয়ালকোট-পাসরুর রেললাইন পর্যন্ত এসে গেছে। শিয়ালকোট-পাসরুর সড়ক তখন হুমকির সম্মুখীন এবং নারোয়াল-জাফরওয়াল সীমান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। এমন অবস্থায় সেই অবস্থানের সবাইকে পিছু হটার হুকুম দেওয়া হয় এবং সৃষ্টি হয় চরম বিশৃঙ্খলা। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই পাসরুর সীমান্তে অগ্রসরমাণ ভারতীয় বাহিনীকে প্রতিহত করা সম্ভব হয় এবং প্রত্যাহার করা হয় পিছু হটার আদেশ। এ যুদ্ধে তাদের প্রতিহত করতে পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান ও স্থলবাহিনীর হেভি গানগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সে সময়ই লাহোরের কাছাকাছি সীমান্তে ভারতীয়দের কিছু সাফল্যের ফলে ওই শহর পতনের আশঙ্কা দেখা দেয়। প্রসঙ্গত, ওই সীমান্তে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট চলমান যুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছিল।

এদিকে দুই দিন পার হয়ে গেলেও ব্যাটারি কমান্ডার মেজর আইয়ুবের খবর নেই। আমাদের ফ্রন্টে যুদ্ধের কোনো তৎপরতাও নেই। তবে অন্যান্য সীমান্তে যে তুমুল যুদ্ধ চলছে, সে খবর রেডিও মারফত পাচ্ছি। বিকেলবেলা বাংকারের বাইরে গাছের নিচে বসে আছি, হঠাৎ দেখি, দূরে একটা জিপ আমাদের অবস্থানের দিকেই আসছে। দুরবিন দিয়ে লক্ষ করে দেখি, জিপে ক্যাপ্টেন সোম্বল ড্রাইভারের সিটে আর পাশে মেজর আইয়ুব। ব্যাটারির অনেকেই জমায়েত হলো তাঁকে দেখার জন্য। সেই ছয় ফুট লম্বা মোটাসোটা গড়নের লোকটা কেমন শুকিয়ে গেছেন। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কেমন লম্বা হয়ে গেছে মুখটা। ইউনিফরমের দশাও মলিন। কোমরে তাঁর বেল্ট আর পিস্তল নেই। জিপ থেকে নেমে ঢুলতে ঢুলতে এসে গাছের নিচে বসে পড়লেন। বসেই গালাগাল শুরু করে দিলেন। এবার আমাদের কাউকে নয়, গালাগাল শুরু করলেন ইনফ্যান্ট্রির লোকদের, অর্থাৎ ৩ এফএফ ব্যাটালিয়নকে, যাদের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে আর্টিলারি সাপোর্টের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। ব্যাটালিয়নটি রাতে কখন যে চুপচাপ তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়ে, তিনি টেরই পাননি। মনে হয়, ভারতীয় বাহিনীর বড় ধরনের আক্রমণের আশঙ্কা করে তারা বিশৃঙ্খলভাবে পিছু হটে যায়, যা কিনা পালিয়ে যাওয়ারই নামান্তর। ব্যাটারি কমান্ডার সকালের দিকে ব্যাপারটা যখন টের পান, তখনই আমাকে অস্ত্রগুলো নিয়ে পেছনে চলে যেতে বলেন। তিনি নিজে জিপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ফেলে রেখে হেঁটেই রওনা হন। বলেন, অনেক দিন নয় মাইলের টেস্ট দেননি, ফাঁকি দিয়েছেন, এবার তাঁর ২৭ মাইল দৌড়ানো হয়ে গেছে। এখন থেকে আর মেজর আইয়ুবের সেই হম্বিতম্বি নেই। আমার খুব প্রশংসা করলেন, বাহবা দিলেন খুব কার্যকর ফায়ার সাপোর্ট দিতে পেরেছি বলে। তিনি এ-ও উল্লেখ করলেন, আমাদের ব্যাটারির অবিরাম গোলাবর্ষণের ফলে ভারতীয় বাহিনী নাকি রাভি ব্রিজ পার হয়ে এপারে এসে পড়লেও আবার পিছু হটে যায়। তাদের অনেক সেনা হতাহত হয়েছে। রণক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ আমার জন্য তিনি খেতাবের সুপারিশ করবেন বলেও জানালেন। সেই থেকে মেজর আইয়ুবের বদলে যাওয়া শুরু। আমার প্রতি তাঁর সহৃদয়তার ভাব বেড়ে গেল। কথিত খেতাব না পেলেও তাঁর সুপারিশে কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেন হয়ে গেলাম রেজিমেন্টের আমার সিনিয়র দুজনকে ডিঙিয়ে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা পর্যন্ত শিয়ালকোট সেক্টরেই বিভিন্ন অবস্থানে ছিলাম। ছোটখাটো যুদ্ধে দক্ষতার সঙ্গে আপন দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলাম—এটাই ছিল বড় সান্ত্বনা।

যুদ্ধোত্তর বিড়ম্বনা

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধবিরতির দুই মাস পরই আমাদের ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্টকে লাহোর সেক্টরের খেমকরনে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ আসে। খেমকরন ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের একটি সীমান্তবর্তী ছোট শহর। এটি পাকিস্তান সেনাবাহিনী দখল করে নেয়। সেখানে কয়েক মাস ছিলাম। এরই মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নওশেরাতে পোস্টিংয়ের আদেশ এসে গেল। প্রায় নয় মাস পাঞ্জাব সীমান্তে অবস্থানের পর ক্যান্টনমেন্টে বসবাসের সুযোগ পেলাম। সেখানে চীনের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নতুন নবম ডিভিশন গঠন করা হচ্ছিল। এরই অধীনে আর্টিলারির ৫৪ ফিল্ড রেজিমেন্টের গঠন-প্রক্রিয়ার পর্যায়ে আমার পোস্টিং হলো। ছয় মাসের মধ্যেই নবম ডিভিশন পাঞ্জাবের খারিয়াঁতে চলে আসে। এই রেজিমেন্টে মাস দুয়েক থাকার পর আবার পোস্টিং হলো আরেক নতুন রেজিমেন্টে। এবার বদলি হলাম আর্টিলারির ৬৬ মিডিয়াম রেজিমেন্টে। এটি তখন শিয়ালকোটে অবস্থিত ৮ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের। এই রেজিমেন্টও নতুন করে গড়ে তোলার কাজ চলল। কয়েক মাস পর ওই রেজিমেন্টের সঙ্গে গেলাম লাহোরে। মাস তিনেকের মধ্যে আবারও পোস্টিং হলো। এবার গেলাম একটি অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট (বিমানবিধ্বংসী) রেজিমেন্টে, যা করাচির নিকটবর্তী মালির ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত। শত্রুবিমান ভূপাতিত করার লক্ষ্যে এমন রেজিমেন্ট বিমানবিধ্বংসী কামানে সজ্জিত থাকে। অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট আর্টিলারি ফিল্ড আর্টিলারি থেকে ভিন্ন ধরনের। এর জন্য মালিরেই আমাকে পাঁচ মাসের একটি কনভারসন কোর্স করতে হলো। কোর্স শেষ হলে পোস্টিং হলো ৬৭ অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট আর্টিলারি রেজিমেন্টে। পেশোয়ারের অদূরে খাইবার পাসের মুখে জমরুদ ফোর্টে অবস্থিত ছিল এই রেজিমেন্ট। জমরুদ ফোর্টে দুই মাসের ছুটিতে থাকার সময়ই দেশে আসি। এবার এসে বিয়ে করতে হলো। সেটা ছিল ১৯৬৯ সালের প্রথম দিক। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। ৯ ফেব্রুয়ারি আমাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পাঁচ দিনের মাথায় একাই ঢাকা ছাড়ি। শহরে তখন কারফিউ চলছিল। এর মধ্যেই কোনো রকমে তেজগাঁও বিমানবন্দরে পৌঁছাই। কর্তব্যস্থান জমরুদ ফোর্টে দুই সপ্তাহ কাটানোর পর একটি অ্যাডভান্স কোর্সে আবার যেতে হলো করাচির মালির ক্যান্টনমেন্টে। এ সময়ই আমার স্ত্রী করাচিতে আসেন। প্রথমে ড্রিগ রোডে আমার আত্মীয় এয়ারফোর্সের উইং কমান্ডার ওয়াহিদুল্লার বাসায় সস্ত্রীক উঠি। কিছুদিনের মধ্যে মালির ক্যান্টনমেন্ট সরকারি বাসা পেয়ে গেলাম। এখান থেকেই শুরু হয় আমাদের বিবাহিত জীবন। কোর্স শেষে সস্ত্রীক গেলাম খারিয়াঁয়। বাংলাদেশের

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অপসারিত হওয়া এবং অন্তরীণ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ক্যান্টনমেন্টেই ছিলাম।

খারিয়াঁ ক্যান্টনমেন্টে তখন দুটি ডিভিশনের অবস্থান। এখানে আমার দ্বিতীয়বারের মতো পোস্টিং। খারিয়াঁয় তখন ৬ আরমার্ড ডিভিশন ও ৯ পদাতিক ডিভিশনের অবস্থান। আমি ৬ আরমার্ড ডিভিশনের আর্টিলারি ব্রিগেডের অধীন একটি এসপি (সেলফ প্রপেল্ড আর্টিলারি) ব্যাটারিতে ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হই। আমার ব্যাটারি আরমার্ড ডিভিশন-উপযোগী বিমানবিধ্বংসী কামানে সজ্জিত। ক্যাপ্টেন হিসেবে যোগ দিলেও কিছুদিনের মধ্যেই মেজর পদে পদোন্নতি হলো। এখানে অবস্থান করার সময়ই আমার সামরিক বাহিনীর চাকরিজীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের সম্পৃক্ত নানা কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৬৯ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় তিন বছর এখানে আমি ছিলাম। আর কোনো ক্যান্টনমেন্টে একনাগাড়ে এত দিন থাকার সুযোগ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তায় নির্মিত খারিয়াঁ ক্যান্টনমেন্টটি খুবই ছিমছাম ও সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত। সে সময় এখানে ১০-১২ জন বাঙালি অফিসার তাঁদের পরিবার নিয়ে থাকতেন। মেসে বসবাস করতেন সাত-আটজন অবিবাহিত অফিসারও। অফিসারদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। ছুটির দিনে তাঁরা একে অন্যের বাসায় যেতেন এবং ছোটখাটো নানা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তাঁদের দিনগুলো ভালোই কাটছিল। পরিবার নিয়ে যাঁরা বসবাস করতেন, তাঁদের বাসায় বাঙালি ব্যাচেলর অফিসাররা প্রায়ই যেতেন। পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের বাসায় আমাদের যাওয়া-আসার ব্যাপারটা খুবই সীমিত ছিল। অফিসের কাজকর্মের বাইরে এবং বিশেষ মেস ফাংশন ছাড়া তাঁদের সঙ্গে কোনো ধরনের সামাজিক মেলামেশা হতো না বললেই চলে। পুরো খারিয়াঁ ক্যান্টনমেন্টে দুটি বাঙালি পরিবার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের সঙ্গে অন্য আর কোনো বাঙালিকে সামাজিকভাবে ঘনিষ্ঠ হতে দেখিনি। তাঁরা অবশ্য অন্য বাঙালি পরিবারগুলোর কাছ থেকেও দূরে দূরেই থাকতেন। যাঁরা একটু সিনিয়র, তাঁরা কালেভদ্রে হয়তো কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারের বাসায় 'কলঅন' করতেন। আমি খারিয়াঁয় থাকার সময় সপরিবারে কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারের বাসায় কলঅন করেছি বলে মনে পড়ে না। অবশ্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণই ছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে

প্রথম অধ্যায়

দেশ যখন স্বাধীনতার পথে

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

১৯৭০ সালের ১২ কিংবা ১৩ অক্টোবর সকালে খারিয়াঁর বাসা থেকে বের হচ্ছিলাম আমার অধীন ব্যাটারি নিয়ে ডিভিশনের ট্রেনিং মহড়ায় যোগ দেব বলে। এ সময় গেটে পিয়নকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তার হাতে একটি টেলিগ্রাম। খুলনা থেকে পাঠানো টেলিগ্রামে আমার পুত্রসন্তান জন্মের সুখবর। মনটা মুহূর্তে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মাত্র মাস কয়েক আগে আমার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী দেশে যান। খবরের অপেক্ষায় ছিলাম বেশ কদিন ধরেই। ওদিকে দেশে যাওয়ারও পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। তাই প্রশিক্ষণ মহড়া শেষ করে দুই মাসের ছুটি নিয়ে ১০ নভেম্বর ঢাকায় পৌঁছলাম। পরের দিনই গ্রামের বাড়িতে মা-বাবাকে দেখতে গেলাম। সেদিন বিকেল থেকেই মেঘলা আকাশ। রাতে শুরু হয় থেকে থেকে ঝোড়ো বাতাস ও বৃষ্টির দাপট। ১৪ তারিখ সকালে পিআইএর ফ্লাইটে যশোরে পৌঁছলাম। প্লেনে বসেই দুই দিন আগের রাতে উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে, তার খবর পড়লাম। তবে তখনো সেই মহা ধ্বংসযজ্ঞের তেমন বিস্তারিত খবর বের হয়নি। কিন্তু পরের দিন থেকে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাজুড়ে ছবিসহ নানা ধরনের খবর প্রকাশিত হতে লাগল। এরই মধ্যে দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর প্রথম পৃষ্ঠায় মওলানা ভাসানীর ছবি দেখলাম। দেখলাম ইয়াহিয়া খান ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য কয়েকজন নেতার ছবি। তাদের ছবি ছেপে ব্যানার হেডিং করা হয়েছে এই শিরোনামে 'এরা কেউ আসেনি'। মওলানা ভাসানী এ সময়ই পশ্চিম

পাকিস্তানিদের 'আসসালামু আলাইকুম' বলে বিদায় জানানোর কথা বলেছিলেন। এই প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশি লোক গৃহহীন হয়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে জান-মালের যে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়, সে ব্যাপারে ইসলামাবাদের সরকার তেমন কোনো গুরুত্বই দেয়নি। তিন দিন পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চীন সফর করে ফেরার পথে এক দিনের জন্য ঢাকায় যাত্রাবিরতি করেন। তিনি হেলিকপ্টারের বদলে একটি বিমানে করে উপদ্রুত এলাকা দেখতে যান। তবে উপদ্রুত এলাকার কোথাও নামেননি। পরের দিনই চলে যান। তিনি ওই সাইক্লোনকে সাধারণ মাত্রার বলে আখ্যা দেন। ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সময়ে বিধ্বস্ত অঞ্চলে চিকিৎসা ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানো ও পুনর্বাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তান সরকারের অবহেলা, নিস্পৃহতা ও বিমাতাসুলভ আচরণ বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। বিশেষ করে, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীকে ব্যাপকভাবে নিয়োগ করা হয়নি। বিশ্ব সম্প্রদায় যেভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সে তুলনায় সরকারের সাড়া ছিল নগণ্য। দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে এসব খবর অবিরত বের হচ্ছিল। দেশে তখন সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোর। ১৯৬৯ সালের শুরু থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে গণরোষ সৃষ্টি হতে থাকে, ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত জনপদের মানুষের প্রতি তাদের চরম অবহেলা যেন আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। কাকতালীয়ভাবে ওই সময়ই দুই মাসের ছুটিতে আমার দেশে আসা। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে, পরে সারা দেশে, বিশেষ করে ঢাকার রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অভূতপূর্ব উত্তেজনামিশ্রিত নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়, তা প্রত্যক্ষ করলাম। ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন শেষে রেডিওতে নির্বাচনের ফলাফল জানতে অন্যদের সঙ্গে সারা রাত জেগে ছিলাম। ১৬৭টি আসনেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী জয়ী হয়েছে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এই অভূতপূর্ব সাফল্য অদূর ভবিষ্যতে দেশে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে, সে আশায় তখন সবাই বিভোর।

১৯৭১ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে স্ত্রী ও নবজাত পুত্রসন্তান নিয়ে খারিয়াঁয় ফিরলাম। এখানে ফেরার কিছুদিনের মধ্যে ঢাকার উত্তপ্ত হওয়ার খবর পেতে থাকি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টাতে শুরু করল। আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, বিশেষ করে পাঞ্জাবি প্রধান সামরিক কর্তাদের যে হতবাক ও আতঙ্কিত করে তোলে, সেটা লক্ষ করার মতো ব্যাপার হয়ে ওঠে। আমাদের

স্তরের অফিসারদের মধ্যেও সেটা সংক্রমিত হয়। তবে আমাদের পারস্পরিক অবস্থানগত দূরত্বের কারণে সাধারণ সেনাসদস্যদের মধ্যে চলমান ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়াটা কেমন, সেটা লক্ষ করা সম্ভব হতো না। ইয়াহিয়া খান যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে ইঙ্গিত করলেন, তখন থেকে তাঁদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটা আরও স্পষ্ট হতে থাকে। সেই দেশি অফিসারদের সঙ্গে দেখা হলে এ সময় তাঁদের কেউ কেউ ঠাট্টা করে অভিনন্দন জানাতেন এই বলে যে, 'এখন তোমার দেশের নেতা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, তোমরাই দেশ চালাবে, সামনের দিন তো তোমাদেরই।' শুভেচ্ছা বিনিময় বা আলাপচারিতার সময় কখনো তামাশা করে কখনো তির্যক ও কুটিল মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁরা যে মনোভাব প্রকাশ করতেন, তাতে বুঝতে বাকি থাকত না যে তাঁরা আসলে ভয়মিশ্রিত চরম অন্তর্জ্বালায় ভুগছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩২টি সিটের মধ্যে পিপলস পার্টি (পিপিপি) ৮১টি সিট পেয়ে তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং জাতীয় সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হলো। জুলফিকার আলী ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা বনে গেলেন। সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন স্তরে সবাই যে তাঁর সমর্থক, সেটা বুঝতে পারছিলাম। ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ অধিবেশনে পিপিপি যোগ দেবে না বলে ভুট্টো যে ঘোষণা দিলেন, তাতে অনেকেই খুশি হলেন। এর পরপরই ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করলে পুরো দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমূল পাল্টে গেল। ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা, বিশেষ করে ছাত্রমহল ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মিছিল-সমাবেশসহ ধর্মঘট পালন করতে শুরু করে। মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ আন্দোলন দমাতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে থাকে; শহরে কারফিউ জারি করা হলেও জনতা তা অমান্য করে অব্যাহত রাখে তাদের বিক্ষোভ মিছিল, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি। এ পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। প্রতিদিনই বহু লোক হতাহত হতে থাকে। এসব প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব লাগাতার ধর্মঘট আহ্বান করে।

খারিয়াঁয় লাহোরের ইংরেজি পত্রিকা আসত। তবে এসব পত্রিকায় খবরাখবর পড়ে পরিস্থিতি তেমন খারাপ বলে মনে হতো না। ঢাকার খবরের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। বিদেশি রেডিও, বিশেষ করে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা (মূলত বাংলা বিভাগ) ও অল ইন্ডিয়া রেডিও হয়ে ওঠে আমাদের ভরসার স্থল। সেখানে বসবাসরত সব বাঙালিরই ছিল একই

কথা—দেশে কী হতে যাচ্ছে! সাতই মার্চ রেসকোর্স মাঠে অনুষ্ঠেয় বিশাল সমাবেশকে ঘিরে নানা জল্পনা-কল্পনা শুনতে লাগলাম। বঙ্গবন্ধু সেদিন একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা দেবেন বলেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম। পাকিস্তানি অফিসাররাও তা-ই ধারণা করেছিলেন। তাঁদের কারও কারও মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ও অস্বস্তির ভাবও লক্ষ করা যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু সত্যি সত্যি স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন কি না, এ রকম ভাবনায় আমরা উদ্বেগাকুল ছিলাম। অবশ্য ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও তাঁর ভাষণে তিনি যা বললেন, সেটা যে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রায় কাছাকাছি কিছু, বিবিসি ও অন্যান্য বিদেশি বেতারের ভাষ্য থেকে তেমনটাই মনে হলো। সুযোগ পেলেই আমরা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভাব বিনিময় করতাম। পাঞ্জাবি অফিসারদের সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করার সুযোগ ছিল খুবই কম। তাঁরা সাধারণত আমাদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতেন। যতই দিন যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে কোনো মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে আস্তে আস্তে ভোল পাল্টাচ্ছেন, সেটা আমাদের মতো অরাজনীতিকদেরও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। দেখাই যাচ্ছিল, ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়া খান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ জেনারেলদের দহরম-মহরম বাড়ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা, বিশেষ করে পাঞ্জাবি জেনারেলরা কোনো বাঙালিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কখনো মেনে নেবে বলে আমি ভাবতে পারতাম না। আমার কাছে ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু বলেই মনে হতো। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলার পর থেকে এখানকার অফিসার মহলের কথাবার্তায় একটা চাপা ক্ষোভ ও তাঁদের অস্বাভাবিক কিছু আচার-আচরণ লক্ষ করছিলাম। তাঁদের মধ্যে এমন আলোচনাও শুনছিলাম যে বাঙালি অফিসাররাই এখন সব প্রমোশন পেয়ে ওপরে উঠে যাবে। তখন তাঁদের অবস্থা কী দাঁড়াবে!

মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে তিনি যে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার খবরাখবর রেডিও ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পারছিলাম। এরই মধ্যে ভুট্টোও ঢাকায় গেলেন। এ পর্যায়ে মনে হলো, সংকটের বুঝি সমাধান হতে যাচ্ছে।

২৬ মার্চ সকালে এক পরীক্ষাকেন্দ্রে (সামরিক বিষয়ে) পরিদর্শক হিসেবে আরও কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছিলাম। দিন কয়েক ধরেই দেশের অবস্থার অবনতির খবর পাচ্ছিলাম। মনটা তাই খারাপ। দেশে

যে মারাত্মক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে পাকিস্তানিরা যে শক্ত হাতে দমন-পীড়নের ব্যবস্থা নেবে, এ রকম একটা ভয় মনে দানা বাঁধছিল। সেদিনও পরীক্ষার বিরতির মাঝখানে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকজন আলাপ করছিল। মনটা এমনিতেই খারাপ। চুপচাপই বসে ছিলাম। আমারই এক কোর্সমেট (ব্যাচমেট) মেজর আকবর পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা নিয়ে তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা ফলাও করে বলছিল। মাস কয়েক হলো সে যশোর থেকে এখানে এসেছে। সেখানে আইএসআইতে (পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা) তার পোস্টিং ছিল। সে এমন সব তথ্য দিচ্ছিল, যা শুনে শেষ পর্যন্ত সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। বলছিল, মুসলমান আর হিন্দুর মধ্যে তফাত নেই। মুসলমানরা হিন্দুদের কথায় চলে, তাদের চলাফেরাও হিন্দুদের মতোই। তাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দু ছিল। পাকিস্তানের চেয়ে তারা ইন্ডিয়াকেই বেশি পছন্দ করে। শক্ত হাতে এদের দমন করলে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সে কিছু কটূক্তিও করে বসল। আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না। আমি খুব কড়া ভাষায় তার এসব উক্তির জবাব দিতে গেলেই ব্যাপারটা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেল। কয়েকজন মিলে থামিয়ে দিল। এক পাঠান সিনিয়র মেজর আমাকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন। আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললেন, 'মনজুর, তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি। দিনকাল ভালো নয়, সামনে আরও খারাপ দিন আসছে। তুমি একদম চুপ থাকবে। এসব বিষয় নিয়ে কারও সঙ্গে মুখ খুলবে না।'

বিষণ্ন মনে বাসায় ফিরলাম। তখনো জানি না গত রাতে অর্থাৎ ২৫-২৬ মার্চ রাতে রাজধানী ঢাকায় ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কী বর্বর হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে! বাসায় থাকলে বেশির ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকতাম খবর শোনার আশায় রেডিওর বিভিন্ন চ্যানেল টিউন করে। বিকেল সাড়ে চারটার অল ইন্ডিয়া রেডিওর হিন্দি সংবাদে শুনলাম ঢাকায় ক্র্যাক ডাউনের কথা। শহর সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, গোলাগুলিতে বহু লোক হতাহত হয়েছে। তবে বিস্তারিত কিছু জানা গেল না।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেদিনই সন্ধ্যা সাতটায় হঠাৎ করেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণ শুনে তো রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বাসঘাতক বলে তিনি অভিহিত করেছেন। শুধু তা-ই নয়, সরকারের ক্ষমতা খর্ব করে দেশকে বিভক্তির চেষ্টা করার অভিযোগেও তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন

তিনি। তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার অঙ্গীকার করে আরও বলেন, মার্শাল ল কর্তৃপক্ষকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ইয়াহিয়া সেদিন বিকেলেই ঢাকা ত্যাগ করে করাচিতে চলে আসেন। সেখান থেকেই তাঁর ভাষণ প্রচার করা হয়েছিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে আরও ভয়ংকর নৃশংস রূপ নিয়ে বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমনটা আশঙ্কা করছিলাম। এরপর বিদেশি রেডিওই হয়ে উঠল সঠিক সংবাদ পাওয়ার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। ২৭ তারিখ বিকেলে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কোনো একটি চ্যানেল থেকে শুনলাম মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা। মনটা আশায় ভরে উঠল। তাহলে বাঙালি রুখে দাঁড়াচ্ছে!

সেদিনই রাতে বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠান মারফত দেশের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা গেল। লন্ডনের এক পত্রিকার (নাম মনে নেই) সংবাদদাতা, যাঁকে ঢাকা ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল, তাঁর ভাষ্যও শুনলাম। অনেক কথার মধ্যে তাঁর একটি কথা সেদিন থেকে মনে গেঁথে গেল। তিনি বললেন, 'পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়া আর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।' শোনা যাচ্ছিল, বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হয়েছেন। কথাটা বিশ্বাস করছিলাম না। এর দিন কয়েক পরের কথা। কী একটা কাজে খারিয়াঁ রেলস্টেশনে গিয়েছিলাম। এক পাঞ্জাবি অফিসার তাঁর হাতের *পাকিস্তান টাইমস* পত্রিকাটি খুলে আরেকজন অফিসারকে দেখাচ্ছিলেন। উৎসুক হয়ে আমিও দেখতে গেলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছাপা বঙ্গবন্ধুর ছবি। মলিন চেহারায় বসে আছেন সোফায়। দুই পাশে দুজন লোক দাঁড়িয়ে, সম্ভবত সিকিউরিটির। নিচে ক্যাপশন, 'শেখ মুজিব আন্ডার অ্যারেস্ট'। নিজেকে সামলে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম। এই ছবি ও খবরটি সে সময় বাঙালিদের মনে যে কী দারুণ আঘাত দিয়েছিল, তার একটিমাত্র উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি।

সেদিন বিকেলে গিয়েছিলাম ডাক্তার লে. কর্নেল মতিনের বাসায়। তিনিও তখন দেশের পরিস্থিতি জানার জন্য খুবই ব্যাকুল। বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং কাগজে তাঁর গ্রেপ্তার অবস্থার ছবি আমি দেখে এসেছি—এ কথা শোনামাত্র তাঁর স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এই কান্নায় যে কত আবেগ-অনুভূতি জড়ানো ছিল, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সে সময় এমন কোনো বাঙালি দেখিনি, যিনি বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তারের খবরে মুষড়ে পড়েননি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৫ মার্চের নির্মম হত্যাযজ্ঞের খবরে এমনিতেই আমরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম, তার ওপরে

বঙ্গবন্ধুর আটকের খবরে যেন কাটা ঘায়ে লবণের ছিটে দেওয়া হলো। দেশ (আমরা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানকেই দেশ মনে করতাম) এখন বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ও সক্রিয় নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত। তাহলে কী হবে সেই সাড়ে সাত কোটি মানুষের, যারা ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর এক নতুন আশায় জেগে উঠেছিল। অন্য নেতাদের অবস্থা কী, তাঁদের কতজন বেঁচে আছেন, আর কতজন পাকিস্তানিদের হাতে আটক হয়েছেন—এ সম্পর্কে কিছুই জানি না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে কঠোর ও নির্মমভাবে বাঙালিদের দমন করতে অভিযানে নামবে, তার কিছুটা আঁচ পেয়েছিলাম মার্চের প্রথম থেকেই। এখন তারা তা-ই করছে। ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারস্যাপার এই ইঙ্গিতই দিচ্ছিল যে তাঁরা শিগগিরই বাঙালিদের শক্ত হাতে দমন করার পাঁয়তারা কষছেন। পরে শুনেছি, ভুট্টোই নাকি বলেছিলেন, হাজার বিশেক বাঙালি খতম করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সে জন্যই ঢাকায় ক্র্যাক ডাউনের পর ভুট্টোর মন্তব্য ছিল, 'আল্লাহ পাকিস্তানকে বাঁচিয়েছে।' তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে? এ রকমের দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা আমাদের গ্রাস করেছিল।

স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু

আস্তে আস্তে ২৫ মার্চ ও তার পরে সংঘটিত অনেক ঘটনার বিবরণ কানে আসতে লাগল। আমাদের চিঠিগুলো যে সেন্সর করা হচ্ছে এবং ক্যান্টনমেন্টে বাঙালিদের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে, সেটা অচিরেই টের পেলাম। বিশেষ করে, নজর রাখা হচ্ছে ব্যাচেলর ও সেই সব অফিসারের ওপর, যাঁরা পরিবার নিয়ে এখানে থাকেন না। ব্যাচেলরদের বেশির ভাগই আমার বাসায় আসতেন। আর্টিলারি ব্রিগেডের বিএম (ব্রিগেড মেজর) একদিন তাঁর অফিসে ডেকে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'তোমার বাসায় অফিসারদের যাতায়াত বেড়ে গেছে বলে রিপোর্ট আসছে। এটা কমাতে হবে।' তবে তিনি যে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আড়ালে-আবডালে সে কথাও তিনি জানালেন।

এর কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন অফিসার পূর্ব পাকিস্তান থেকে পোস্টিংয়ে খারিয়াঁয় এলেন। তাঁদের কয়েকজন তো এতই ভীত-সন্ত্রস্ত যে, প্রথম প্রথম মুখই খুলছিলেন না। আস্তে আস্তে বহু নির্মম ঘটনার কথা শুনলাম তাঁদের কাছ থেকে। এঁদেরই একজন খেদের সঙ্গে বললেন, এবার মার খেয়ে খেয়ে

বাঙালির মেরুদণ্ড শক্ত হবে। তখন আর কেউ তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দেশ স্বাধীন হবেই।

এখান থেকে এক ক্যাপ্টেন ছুটিতে গিয়েছিলেন। তাঁকে বেশ কিছুদিন আটক রাখা হয়েছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। তিনি যে নির্যাতন সহ্য করেছেন, সে বিবরণ শুনেছি। তাঁর মুখেই শুনলাম, আমারই কোর্সমেট ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্যাপ্টেন বাশার কীভাবে মারা যান। তাঁরা পাশাপাশি সেলে ছিলেন। অমানুষিক অত্যাচার চলে তাঁর ওপর। অবশেষে একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। এভাবেই দিন দিন পরিষ্কার হতে লাগল দেশে কী তাণ্ডব না চালাচ্ছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী! দেশ থেকে মাঝেমধ্যে আমার মা-বাবা ও শ্বশুরের চিঠি আসে। তাঁরাও বুঝতে পেরেছেন যে চিঠি সেন্সর হয়, তাই পারিবারিক খবর ছাড়া কিছু লেখেন না। এদিকে আমার নয় মাস বয়সী শিশুপুত্রের অসুস্থতা দিন দিনই বাড়ছে। খারিয়াঁর প্রচণ্ড গরমে তার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। মাঝেমধ্যে কনভালশন হতে লাগল। কয়েকবার হাসপাতালে থাকতে হলো। আমার স্ত্রীর পক্ষে সবকিছু সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ভাগ্যিস, দেশ থেকে আসার সময় আমাদের গ্রামেরই ১৫-১৬ বছরের ছেলে রায়হানকে নিয়ে এসেছিলাম।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। একদিকে দেশের চিন্তা, অন্যদিকে সন্তানের অসুস্থতা—সব মিলিয়ে যখন ভীষণ রকমের মানসিক যাতনার মধ্যে, তখনই এল পোস্টিংয়ের দুঃসংবাদ। খারিয়াঁ ছেড়ে জমরুদ ফোর্টে অবস্থিত মূল ইউনিট ৬৭ লাইট অ্যান্টি এয়ারক্রাফট (বিমানবিধ্বংসী) আর্টিলারি রেজিমেন্টে যাওয়ার নির্দেশ এল। মনে পড়ল আমার বাসায় বাঙালি অফিসারদের যাতায়াত বেড়ে যাওয়া-সংক্রান্ত গোয়েন্দা রিপোর্টের কথা। আর্টিলারি ব্রিগেডের বিএম বিষয়টি জানিয়ে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পোস্টিংয়ের খবরে মাথায় যেন বাজ পড়ল। স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে ওখানে কীভাবে থাকব! পাহাড়ের মাথায় ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে তৈরি সেই ফোর্ট। তাতে শুধু ব্যাচেলর অফিসারদের থাকার জন্য মেস। নিরুপায় হয়ে মেসেই উঠতে হলো। মেসের অবস্থান ছিল ফোর্টের চূড়ায়। দুটি ছোট ছোট কামরা, যা অনেকটা গুহার মতো। মাটির প্রলেপ দেওয়া তার দেয়াল ও ছাদ। তাতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। খাবার আসত অফিসার্স মেস থেকে। ছোট একটি বাথরুম। সব মিলিয়ে যেন বন্দিখানা। এরই মধ্যে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। সপ্তাহ দুই না যেতেই আবারও পোস্টিংয়ের আদেশ। এবার পোস্টিং কোহাটে আন্তবাহিনী সিলেকশন বোর্ড

(সংক্ষেপে যাকে আইএসএসবি বলা হয়) নামের যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে। এটি পশ্চিম পাকিস্তানের আরও ভেতরে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় কোহাটে অবস্থিত। বুঝলাম, পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত এলাকা থেকে আমাকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে, যাতে কোনোভাবেই আমি পালাতে না পারি। এবার আর মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। কোথায় রাখব স্ত্রী-পুত্রকে, কী হবে তাদের দশা—এসব ভেবে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে তখন করাচির ড্রিগ রোডের আমার সেই আত্মীয় উইং কমান্ডার ওয়াহিদুল্লারও পোস্টিং হয়েছে রিসালপুরে বিমানবাহিনীর বেসে। পেশোয়ার থেকে রিসালপুর প্রায় ৩০ মাইল; আর জমরুদ থেকে পেশোয়ার ১০ থেকে ১২ মাইল। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তিনি তাঁদের বাসায় আমার স্ত্রী-পুত্রকে রেখে যেতে বললেন। কাজের ছেলে রায়হানকে অল্প কিছু মালপত্র দিয়ে বাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করে সকালে রওনা হয়ে গেলাম। ভেসপা মোটরসাইকেলের পেছনের সিটে স্ত্রী ও তাঁর কোলে রুগ্‌ণ শিশুপুত্রকে নিয়ে কোনোভাবে পেশোয়ারে পৌঁছালাম। খারিয়াঁয় থাকার সময়ই ভেসপাটি কিনেছিলাম। ভেসপা বাসস্ট্যান্ডের লাগোয়া এক রেস্টুরেন্ট-মালিকের জিম্মায় রেখে রিসালপুরের বাসে চড়লাম। সেদিনই জমরুদ ফোর্টে ফিরে পরের দিন কোহাটের উদ্দেশে রওনা হলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, আরও কয়েকজন বাঙালি অফিসারকে সেখানে পোস্টিং করে জড়ো করা হয়েছে। তাঁদেরও আমার মতোই অবস্থা—স্ত্রী-সন্তানদের ফেলে আসতে হয়েছে। আসল কথা, পাকিস্তানিরা আমাদের বিশ্বাস করছে না। যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ইউনিট থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। মনটা ক্রমেই বিষিয়ে উঠছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। আফসোস ও মনঃপীড়া আরও বেড়ে গেল এই ভেবে, কেন সময় থাকতে পালিয়ে গেলাম না। পরে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি এই বলে, ইচ্ছেটা প্রবল হলে উপায় একটা হয়ে যেতই। তবে বড় সান্ত্বনা—দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে যুদ্ধ চলছে। দেশ স্বাধীন হবেই। এই জল্লাদ হানাদারদের খপ্পর থেকে দেশ মুক্ত হবেই। আরও সান্ত্বনা এ কথা ভেবে যে, এখানে আমরা যে অবস্থায় আছি, দেশে কোটি কোটি মানুষ তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

এরই মধ্যে জানতে পারলাম, আমাদের ব্যাচমেটসহ বেশির ভাগ জুনিয়র অফিসার, যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের নানা অংশে কর্তব্যরত ছিলেন, তাঁরা স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। শুনলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মেজর খালেদ

মোশাররফের নেতৃত্বে শাফায়াত জামিলসহ সব বাঙালি অফিসার পুরো ৪ ই-বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন নিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন। তেমনি জয়দেবপুর, যশোর ও সীমান্তবর্তী এলাকার ইপিআর বাহিনীর সব বাঙালি অফিসার ও সেনাসদস্যও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। আরও খবর পেলাম, কুষ্টিয়ার মেহেরপুর সীমান্তের বৈদ্যনাথতলায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়েছে। সেই সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করা হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামকে। তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে একটি মন্ত্রিসভা। আর এভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ সুগম করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে কয়েকজন বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশের নবগঠিত সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তানি দূতাবাস ছেড়ে চলে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন নয়াদিল্লিতে একজন জুনিয়র কূটনীতিক (পরে জানতে পারি, তিনি কুদরতুল্লাহ সাহাব) এবং কলকাতার পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী। তাঁর নেতৃত্বে সেখানে কর্তব্যরত সব বাঙালি পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ শুরু করে দেন। একদিকে রণাঙ্গনে যেমন যুদ্ধ চলছিল, অন্যদিকে তেমনি চলছিল রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা। এসব খবর আমাদের ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

কোনো কাজে মনোযোগ দেওয়া বলতে গেলে ছেড়েই দিলাম। অফিসে গিয়ে বসে থাকতাম, সুযোগ পেলে বাঙালি অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে দেশের খবর বিনিময় করতাম। ঘৃণা, অনীহা আর অনাগ্রহ বেড়ে গেল, যা অনেক সময়ই গোপন থাকেনি। ঊর্ধ্বতন দু-একজন ব্যাপারটা যে লক্ষ করেনি, তা নয়। কিন্তু কিছু বলছে না। এরই মধ্যে একদিন রিসালপুর থেকে ওয়াহিদুল্লা সাহেব টেলিফোন করে জানালেন, আমার ছেলের অবস্থা খারাপ। রাতে তাকে নওশেরা সিএমএইচে ভর্তি করা হয়েছে। ছুটি নিয়ে ওই দিনই ছুটলাম। রিসালপুর থেকে নওশেরা ১৪-১৫ মাইল দূরে—পেশোয়ার-রাওয়ালপিন্ডি সড়কে। সেখানে পৌঁছেই সরাসরি সিএমএইচে গেলাম। ছেলের গায়ের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কয়েকবার কনভালশন হয়েছে। ডাক্তার রাওয়ালপিন্ডি সিএমএইচে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। পরের দিনই একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে ছেলেকে রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে গেলাম। রাওয়ালপিন্ডি সিএমএইচ খুব বড় হলেও রোগীর ভিড় প্রচুর। তখন আমি জুনিয়র অফিসার। কেউ পাত্তাই দেয় না। মেডিকেল স্পেশালিস্ট বাঙালি ডাক্তার লে. কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) এ আর খানের সঙ্গে দেখা

করলাম। তিনি খুবই যত্নের সঙ্গে ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। একদিন তিনি একান্তে ডেকে যা বললেন, শুনে প্রায় ভেঙে পড়লাম। স্ত্রীকে জানাতে নিষেধ করলেন। সেলিব্রাল প্যালসি, প্রসবকালে মাথায় চোট ও অক্সিজেনের অভাবে তার মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেছে, যা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বুঝলাম, খুলনার এক ক্লিনিকে অদক্ষ মহিলা ডাক্তারের অব্যবস্থাপনাই আমাদের জন্য এই দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। সাত-আট দিন পর রাওয়ালপিন্ডি সিএমএইচ থেকে ছাড়া পেয়ে তাদের রিসালপুরে রেখে আবার কোহাটে পৌঁছলাম। এখানে পৌঁছার পর থেকে দেশের অবস্থা জানার সুযোগ কমে গিয়েছিল। পাকিস্তানি অফিসারদের আলাপচারিতা ও রেডিওর খবর থেকে বুঝতে পারছিলাম যে মুক্তিবাহিনীর শক্তি ও তাদের অভিযান ক্রমেই বাড়ছে।

তখন সেপ্টেম্বর মাস চলছে। এ সময় আরেকবার অবাক হওয়ার মতো ঘটনা ঘটল। খারিয়াঁয় আগের ব্যাটারিতে আবার পোস্টিংয়ের হুকুম এল। খারিয়াঁ ছাড়ার পর প্রায় দুই-তিন মাস যে ঝক্কিঝামেলা ও মানসিক চাপের মধ্যে ছিলাম, তার অবসান হলো। সবই আল্লাহর মেহেরবানি। তাঁকে হাজারো শুকরিয়া জানাই। সৌভাগ্যক্রমে যে বাসা ছেড়ে এসেছিলাম, সে বাসাই আবার বরাদ্দ করা হলো। আমার মালপত্র তখনো ব্যাটারির গুদামঘরেই ছিল। তখন ব্যাটারিতে আমি ছাড়া আরও দুজন অফিসার ছিলেন—একজন পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন ও অন্যজন বাঙালি ক্যাপ্টেন আনিসুর রহমান। তাঁদের চেষ্টায়ই আমি বাসাটা ফেরত পেলাম। আমার পোস্টিংয়ের পরও তাঁরা বাসাটি হাতছাড়া করেননি। ব্যাটারির সবাই আমার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি দেখিনি। কয়েক দিনের মধ্যেই বাসা গোছগাছ করে নিলাম।

এদিকে প্রতিদিনই কানে আসতে লাগল মুক্তিযুদ্ধের নানা খবর। স্থানীয় অফিসারদের মধ্যে এখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মুক্তিবাহিনী। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রায়ই আসছে নিহত সেনাসদস্যদের মৃতদেহ। খারিয়াঁ ও তার পাশেই পাঞ্জাবের জেলাম জেলা। এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি পরিবারের অন্তত দু-চারজন লোক সেনাবাহিনীর সদস্য। যুদ্ধে নিহত বা আহতদের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কও বাড়ছে। হতাহতদের মধ্যে অফিসারও রয়েছেন। কিছুদিন পর পর খারিয়াঁ ক্যান্টনমেন্ট থেকে দু-একজনকে পোস্টিং করা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে। সেখানে পোস্টিং এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে এক মহা আতঙ্কের বিষয়। অফিসার মহলেই বেশি আতঙ্ক। তদবির করতে ছোটাছুটি করছেন তাঁদের

অনেকেই। যাঁরা আন্দাজ করছেন পোস্টিংয়ের সম্ভাবনা আছে, তাঁরা আগাম খবর নিয়ে তদবিরে নেমে পড়ছেন, যাতে তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানে যেতে না হয়। আমার ব্যাটারির সিনিয়র সুবেদার একদিন জিজ্ঞাসা করেই বসলেন, মুক্তি (তারা মুক্তিবাহিনীকে 'মুক্তি' বলতেন) কী, তারা নাকি পাঞ্জাবিদের জীবন্ত ধরে খায়! মনে মনে না হেসে পারলাম না। তাঁদের গ্রামে নাকি ঢাকা থেকে কয়েকটি মৃতদেহ এসেছে। বুঝলাম, তাঁদের মধ্যে কেমন আতঙ্ক ছড়িয়েছে! পূর্ব পাকিস্তানে আসলে তখন কী ঘটছে, অনেকেরই সেটা জানা নেই। সেখানে সেনাবাহিনী যে কী মাত্রায় হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, সাধারণ সেনারা সে খবর রাখে না। তারা উর্দু পত্রিকায় যা ওঠে, তা-ই বিশ্বাস করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিতাড়িত করে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে, এখানকার কম লোকই সেটা বিশ্বাস করছে বলে মনে হয়। তাদের ধারণা দেওয়া হয়েছে, কিছু হিন্দু ও দুষ্কৃতকারী গাদ্দার ইন্ডিয়ার প্ররোচনা ও সহায়তায় পাকিস্তানকে ভাঙতে চাচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছিল, তা ব্রিটিশ-মার্কিনসহ নানা দেশের সংবাদ মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও পাকিস্তানিরা তা যেন বিশ্বাসই করছিল না। সরকারি ভাষ্য ছাড়া পত্রপত্রিকাগুলো পূর্ব পাকিস্তানের কোনো ঘটনার সংবাদ ছাপত না। ক্র্যাক ডাউনের রাতেই সেনাবাহিনী সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বিদেশি সাংবাদিকদের এক জায়গায় জমায়েত করে বিমানে তুলে দিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে তেমন একটা লাভ হয়নি। বিদেশি সংবাদপত্র, রেডিও-টিভিতে পাকিস্তানি বাহিনীর নানা অপকর্ম ও নৃশংসতার নানা খবর ও ছবি প্রতিদিনই প্রকাশ পেতে থাকে। কয়েকজন সাংবাদিক পাকিস্তানি বাহিনীর আওতা থেকে সটকে পড়েন ও গোপনে নৃশংসতার ছবি ও তথ্য পাঠাতে থাকেন। বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও অল ইন্ডিয়া রেডিও শুনে তখন অনেক তথ্যই আমাদের জানা হয়ে যেত। পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা বলতেন, এসব ইন্ডিয়ার পক্ষে প্রপাগান্ডা। আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ বাঙালিদের মধ্যে এমন কাউকে দেখিনি, যার মনে কোনো সন্দেহ ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার দিন বেশি দূরে নয়। পাকিস্তান যে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, ক্রমেই সেটা টের পেতে লাগলাম। ঊর্ধ্বতন হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের ব্যাটারিসহ ইউনিট সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য-উপাত্ত জানতে চাওয়া, সাজ-সরঞ্জামের ঘাটতি পূরণ করা, অফিসার-জওয়ানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, অবসরপ্রাপ্তদের রিকল করে নানা ইউনিটে যোগদান করানোর ঘটনা ইত্যাদি

থেকে বুঝতে বাকি থাকল না যে পাকিস্তান তার পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে একদিন নির্দেশ এল যে আমার ব্যাটারির একটি ট্রুপকে (ছয়টি গান) মিয়ানওয়ালির কাছে খারিয়াঁ থেকে প্রায় ১২০ মাইল দূরের একটি পরিত্যক্ত রানওয়েকে ভারতীয় বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কাজে মোতায়েন করতে হবে। ওই দিন রাতেই চলে গেলাম। যথারীতি গান ডিপ্লয় করে একজন অফিসারকে দায়িত্ব দিয়ে পরের দিনই চলে এলাম। রানওয়েটি পরিত্যক্ত হলেও পাকিস্তান বিমানবাহিনী সেটাকে যুদ্ধের উপযোগী করে সক্রিয় করে তুলল। দেখলাম, সেখানে কয়েকটি ফাইটার বিমান অবস্থান নিয়েছে। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই সেখানে অন্য একটি ব্যাটারি মোতায়েন করা হলে আমার অধীন ট্রুপটিকে এখানে নিয়ে আসতে হলো।

এরই মধ্যে ঢাকাসহ দেশের অভ্যন্তর ভাগের নানা স্থানে মুক্তিবাহিনীর চোরাগুপ্তা হামলা যেমন বেড়ে চলল, তেমনি সীমান্তের সংঘর্ষ বেড়ে যাওয়ার খবরও নিয়মিত পেতে লাগলাম। অক্টোবরের শেষ দিকে ৬ আরমার্ড ডিভিশনের ওপর সীমান্তের অতি কাছাকাছি অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ এলে আমার অধীন ব্যাটারিকে ৮ আরমার্ড ব্রিগেডের সঙ্গে বের হতে হলো। এই ব্রিগেডকে গুজরানওয়ালা শহরের দক্ষিণে সমবেত (কনসেন্ট্রেশন এরিয়ায়) করা হয়। নিকটতম সীমান্ত হলো পাসরুর সেক্টর, যা ওখান থেকে সড়কপথে ৮০ মাইলের ওপরে। আমার ব্যাটারির জন্য যে এলাকাটি বরাদ্দ করা হয়, তার সমস্তটাজুড়ে ছিল ইটের ভাটা। একদম খোলা আকাশের নিচে আমাদের থাকতে হবে। কাভার বলতে কিছু নেই। সেখানে রাতে পৌঁছেই অবস্থান নিয়ে নিলাম। কনসেন্ট্রেশন এরিয়ায় আমাদের রাখার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো সীমান্তের কাছাকাছি প্রস্তুত থাকা। রাতের মধ্যেই ট্যাংকের ওপর স্থাপিত দুই ও চার ব্যারেলের গানগুলো এবং বাকি লটবহর সঠিকভাবে ক্যামুফ্ল্যাজ নেট দিয়ে লুকানোর ব্যবস্থা করে নিলাম। ইটের ভাটায় কিছু ঘরদুয়ার থাকায় সুবিধা হলো। তাঁবুর বদলে ঘরে থাকার সুবিধা পাওয়া গেল। ব্যাটারির লোকেরা কীভাবে, কেমন করে যেন বিদ্যুৎ-সংযোগের ব্যবস্থাও করে ফেলল। আরমার্ড (সাঁজোয়া) বাহিনী যেহেতু আক্রমণের ভূমিকায় থাকে, তাই তারা পদাতিক ডিভিশনের মতো সীমান্তে সরাসরি অবস্থান গ্রহণ করে না। ব্যাপারটা আমাদের জন্য ভালোই হলো। এখানে সীমান্তের অবস্থানের মতো অত সতর্কতা ও কড়াকড়ি থাকে না, ফলে সময় কাটানো সহজ হয়ে গেল। আবার প্রধান সড়কের কাছে থাকায় খারিয়াঁ যাতায়াতে সময়ও কম লাগে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায়। সব মিলিয়ে ভালোই

হলো। খারিয়াঁর বাসায় রেখে আসা স্ত্রী ও ছেলেকে মাঝেমধ্যেই দেখতে যাওয়ার সুযোগ হলো। যুদ্ধ লাগলে অফিসার ও সেনাদের পরিবারকে যে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় ভালো করেই টের পেয়েছিলাম। তখন ব্যাচেলর ছিলাম বলে বাঙালি পরিবারগুলোর দুর্দশার সামান্যই দেখেছি। পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদের বউ-ছেলেমেয়েদের তাদের আত্মীয়স্বজন এসে বাড়িতে নিয়ে যায় বা কেউ এসে বাসায় থাকে। কিন্তু বাঙালিদের কোনো উপায় থাকে না। নিজের দেশে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চলছে। প্রকাশ্যে না হলেও পশ্চিমা সহযোগী ও সহকর্মীদের সঙ্গে আমাদের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। সামনে এই দূরত্ব আরও বাড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। রোগাক্রান্ত ছেলের পাশাপাশি সবকিছু আমার স্ত্রীকে একাই সামলাতে হবে। তাঁকে প্রায়ই হাসপাতালে নিতে হয়। আমার সামনে আসছে কঠিন থেকে কঠিনতর দিন।

পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ

গুজরানওয়ালায় বেশির ভাগ সময়ই কাটত রেডিওতে দেশের মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর শুনে। আমার ব্যাটারি আলাদা অবস্থান থাকায় বেশ সুবিধাই হলো। আমি ব্যাটারি কমান্ডার এবং বাঙালি হলেও আমার কর্তৃত্ব এখনো অক্ষুণ্ন। পাঞ্জাবি অফিসার ক্যাপ্টেন মনজুর আলী আহমেদের সঙ্গে বাঙালি ক্যাপ্টেন আনিসুর রহমানও আছে। একদিক দিয়ে আমরা মেজরিটি। আনিসের ছিল বড় একটা রেডিও। সে সারা দুনিয়ার রেডিও স্টেশন মনিটর করে করে চলমান মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তান-ভারতসম্পর্কিত খবরাখবর শুনে আমাকে শোনাত সেসবের সারসংক্ষেপ। বিবিসির বাংলা বিভাগ শোনা কোনো বেলা বাদ পড়ত না। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম নিয়ে সম্প্রচারিত নানা ঘটনার খবর আমাদের খুবই উদ্দীপ্ত করত। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে পাকিস্তানিদের ওপর মুক্তিবাহিনীর হামলা যে আরও বেড়ে গেছে, সে খবর বিদেশি রেডিও মারফত নিয়মিত শুনছি। এর মধ্যে একদিন মুক্তিবাহিনীর বয়রার কাছে কয়েকটি পাকিস্তানি সেফি (Chaffee) ট্যাংক ধ্বংস করার সংবাদ শুনে আনন্দ আর চেপে রাখতে পারছিলাম না। পাকিস্তানি সেনাদের হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে। এরই মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় সীমান্তের কয়েকটি এলাকায় মুক্তিবাহিনী ঢুকে পড়ার খবরে বুঝতে পারছিলাম, চূড়ান্ত যুদ্ধ বাধার সময় এসে গেছে। এ-ও প্রায় ধরেই নিয়েছি, আমরা যেখানে আছি, সেই সীমান্তেও যুদ্ধ বাধবে। মনটা খুবই উৎফুল্ল হয়ে

উঠল এই ভেবে যে দেশ স্বাধীন হতে আর দেরি নেই। তবে এই উৎফুল্ল ভাবটা মনেই চেপে রাখতে হতো।

২ ডিসেম্বর বিকেলে দুই দিনের ছুটি নিয়ে খারিয়াঁয় এলাম। বাসায় আসতে পারায় মনটা অসম্ভব ভালো লাগছিল। স্ত্রী-পুত্রকে ফেলে গিয়েছিলাম। তাদের সঙ্গে প্রায় মাস খানেক পর মিলিত হলাম। ৪ তারিখ বিকেলে চলে যাব।

৩ তারিখ সন্ধ্যায় বাসায় বসে আছি। এমন সময় এখানে অবস্থিত ব্যাটারির রিয়ার অফিস থেকে খবর এল অতিসত্বর আমাকে ব্যাটারি পজিশনে ফেরত যেতে হবে। রেডিওতে শুনলাম, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এ খবরের জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম। খুশি ও উত্তেজনায় কতক্ষণের জন্য সবকিছু ভুলে গেলাম। দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। এ দেশে আর পড়ে থাকতে হবে না। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হব। তবে পরমুহূর্তেই মনে একটা ভয় ও আতঙ্কের ছায়া ঘিরে ধরল। এখানকার যুদ্ধে তো আমাদের আপাতত থাকতে হচ্ছে। আমাদের নিজেদের দেশে এরা আমাদের শত্রু, কিন্তু এখানে তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। ফলে আমাদের সম্পর্কে তারা কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেটা বোঝা বেশ কঠিন। একসময় আমাদের মধ্যে এমন ধারণাও জন্মেছিল যে আসল যুদ্ধের আগে হয়তো বাঙালিদের সরিয়ে রাখা হবে। এখন যখন যুদ্ধ একেবারে দোরগোড়ায়, তখন তো আর উপায় নেই। ফলে এখন আমার নিজের দেশের শত্রুর পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। এ এক ভীষণ উভয়সংকটজনিত অবস্থা। এখন জীবন গেলে তা একেবারেই বৃথা যাবে।

তৈরি হতে বেশি সময় লাগেনি। সকালে এসেই ইউনিফর্ম ধুতে দিয়েছিলাম। তার মধ্যে গরম জার্সিটা (স্যুয়েটার) শুকায়নি। শীতে এটি মহামূল্যবান বস্তু। স্ত্রী লেগে গেলেন হিটার জ্বালিয়ে শুকাতে। তিনি দেখি আরও উৎফুল্ল, মুখে ভয়ভীতি বা আতঙ্কের চিহ্নমাত্র নেই। যুদ্ধ শুরু হয়েছে, দেশ স্বাধীন হবে, সেই আনন্দ সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে। যে গাড়ি আমাকে নিতে যাবে, সেটা দেরি করছিল। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর নাম নিয়ে স্ত্রী ও পুত্রকে ফেলে রাত সাড়ে ১০টায় রওনা হলাম। জানি না, ভাগ্যে কী রয়েছে! আল্লাহই সবকিছুর মালিক, তিনিই একমাত্র ভরসা। স্ত্রীর সঙ্গে আছে শুধু দেশ থেকে আনা কাজের ছেলে রায়হান। কাছাকাছি কোনো বাঙালি পরিবার নেই। তবে পাশের দুই বাসার পাঞ্জাবি পরিবারের সঙ্গে আমার স্ত্রীর বন্ধুত্ব বা সখ্যের সম্পর্ক ভালোই ছিল। অনেকেই যার যার দেশের বাড়িতে চলে গেছে। শুধু এই দুটি পরিবার থেকে গেছে। তারা নাকি প্রায়ই আমার স্ত্রী ও সন্তানের

খোঁজখবর নিয়ে থাকে। খারিয়াঁ ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পিন্ডি-লাহোর ট্র্যাংক রোডে উঠতেই দেখি পথটি একেবারেই জনমানব ও যানবাহনশূন্য। হেডলাইট নিভিয়ে কেবল সাইড লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালানো হচ্ছে। স্পিডে চালানো যাচ্ছিল না। রাস্তাতেই জঙ্গি বিমানের দুটি সর্টির (Sortie)—খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়ার—শব্দ পেলাম। জানি না, বিমান দুটি শত্রু, না মিত্র পক্ষের। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ব্যাটারিতে পৌঁছে গেলাম। নামতেই ক্যাপ্টেন আনিস জানালেন, পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ভারতীয় বিমানঘাঁটিতে পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান সন্ধ্যা থেকেই আঘাত হানছে। আরও বললেন, আমাকে এক্ষুনি ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে।

একটু দূরেই ৬ আরমার্ড ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের অবস্থান। গিয়ে দেখি, বাংকারের ভেতরে আরও অনেক অফিসার জড়ো হয়েছেন। বাইরে অন্ধকার, তবে ভেতরে আলো জ্বালিয়ে কাজ চলছে। জিটু (স্টাফ অফিসার) মেজর মান্নাফের (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পরে মেজর জেনারেল হন, প্রয়াত) কাছ থেকে ব্রিফিং নিলাম। আপাতত কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা নেই। প্রস্তুত থাকতে হবে, এই যা। জিটু অল্প কথা বলে বিদায় দিলেন। জিওসি (ডিভিশনাল কমান্ডার) মেজর জেনারেল এম আই করিম ছাড়া মেজর মান্নাফ সেখানে দ্বিতীয় বাঙালি অফিসার। সে রাত থেকেই বিভিন্ন সেক্টরে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তবে এই ডিভিশন গুজরানওয়ালার পাশেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা বসে বসে রেডিওতে দুই পক্ষের খবর শুনতে লাগলাম। ৬ তারিখ রাতে আমাকে ৮ আরমার্ড ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে ডাকা হলো। বাংকারে ঢুকতেই রেডিওতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে পেলাম। তিনি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে পার্লামেন্টে ভাষণ দিচ্ছিলেন। পাকিস্তানি কোনো হেডকোয়ার্টারে বসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনা একটা অকল্পনীয় ব্যাপারই ছিল। ব্রিগেড কমান্ডারও শুনছিলেন। তাঁর মুখে বিরক্তি ও ক্ষোভের সুস্পষ্ট চিহ্ন। অল্পক্ষণ পরই রেডিও বন্ধ করে দিলেন তিনি। তাঁর অধীন অন্য কমান্ডাররাও জড়ো হয়েছেন। তাঁর ব্রিগেডের পাসরুর সেক্টরে যাত্রার নির্দেশ এসেছে। শিগগির রওনা হতে হবে। আমার ব্যাটারিকে ট্যাংকগুলো চলার সময় বিমান আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। এই ব্যাটারির বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো যে ধরনের ট্যাংক চেসির ওপর বসানো, তা আমেরিকান হলেও বহু পুরোনো। আর যে ট্যাংক রেজিমেন্টের সঙ্গে এই ব্যাটারির গানগুলো থাকবে, তাদের টি-৫৬ ট্যাংকগুলো চীনের তৈরি। খুবই আধুনিক। ব্যাটারির এসপি গানগুলো এই ট্যাংকের সঙ্গে চলতে

পারবে না। বিষয়টা তুলে ধরলাম এই ভেবে, যখন এগুলো বিকল হয়ে পড়ে থাকবে, তখন যেন আমাকে দোষারোপ করা না হয়। এগুলোর যান্ত্রিক অবস্থা আমার জানা আছে। যুদ্ধাবস্থায় ২০-৩০ মাইল চলার পর এগুলোর বেশির ভাগই বিকল হয়ে পেছনে পড়ে থাকবে।

আমরা দুই ঘণ্টার নোটিশে প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছি। কয়েক দিন পার হয়ে গেল। আর কোনো নির্দেশ নেই। অবশ্য ৮ আরমার্ড ব্রিগেডের একটি ট্যাংক রেজিমেন্ট ইতিমধ্যে যুদ্ধে নেমে গেছে। ওদিকে সব ফ্রন্টেই চলছে তুমুল যুদ্ধ। রেডিও ছাড়া আর কোনো সূত্র থেকে খবর পাওয়া সত্যিই কঠিন। আমাদের ব্যাটারির নিজস্ব গণ্ডির বাইরে অন্য কোনো ফ্রন্টের খবর পাওয়াটাও কঠিন ছিল। কিছুই জানার উপায় ছিল না। কাজেই রেডিওই আমাদের খবর পাওয়ার একমাত্র ভরসাস্থল। অল ইন্ডিয়া রেডিওর খবর সর্বক্ষণই শুনছি। তা ছাড়া বিবিসি তো আছেই, যা সবচেয়ে তথ্যনির্ভর। মাঝেমধ্যে ভয়েস অব আমেরিকাও শুনছি। ৭ তারিখ রাতে শুনলাম ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর সীমান্ত পার হয়ে যশোর মুক্ত করে ফেলার খবর। ওদিকে যৌথ বাহিনী সিলেট-আখাউড়া সীমান্ত পার হয়ে আশুগঞ্জে পৌঁছে গেছে। এসব খবর রেডিওতে শুনছি। এখানকার এই সীমান্তের অবস্থাও ভালো নয় বলেই মনে হচ্ছে। পাকিস্তান প্রথম দিনই ভারতীয় কাশ্মীরের বিপরীতে ছাম্ব-জোড়িয়া সেক্টরে আক্রমণ চালিয়েছিল। অন্যান্য সেক্টরেও একইভাবে হামলা চালিয়েছে। কিন্তু তাতে তারা তেমন সুবিধা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। পাকিস্তানি অফিসারদের কথাবার্তা থেকে মনে হলো, ৬ আরমার্ড ডিভিশন ও ১৭ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন পাসরুর সেক্টর দিয়ে আরেকটি আক্রমণ চালাবে। তাদের ধারণা, এদিক দিয়ে ভারতের ভেতরে ঢুকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে দখল করে নেবে। ভাবটা এমন যে, পূর্ব পাকিস্তান চলে গেলেও জম্মু, কাশ্মীর তাদের দখলে এসে যাবে। তাদের কল্পনার বহর দেখে মনে মনে আমি হাসতাম। কামনা করি, এমন অবস্থা যেন না হয়, যখন তারা বলবে 'ভিক্ষা চাই না, কুত্তা সামলান'।

শেষমেশ ১২ ডিসেম্বর রাতে ব্যাটারি নিয়ে ৮ আরমার্ড ব্রিগেডের একটি অংশের সঙ্গে বের হওয়ার নির্দেশ এল। গুজরানওয়ালা শহর পার হতেই সকাল হয়ে গেল। দিনের বেলায় চলাচল করা যায় না ভারতীয় জঙ্গি বিমানের টার্গেট হওয়ার ভয়ে। ব্যাটারিকে একটি গ্রামের পাশে কবরস্থানের আশপাশে সাময়িকভাবে মোতায়েন করলাম। গাছপালার নিচে গান ও গাড়িগুলো লুকানোর ভালো ব্যবস্থাই করা গেল। সকালে জঙ্গি বিমানের প্রচণ্ড আওয়াজ

শুনে চায়ের মগ হাতে খোলা জায়গায় বের হয়ে এলাম। একটি ভারতীয় জঙ্গি বিমানকে খুব নিচু দিয়ে উড়ে যেতে দেখলাম। একটু পর সামান্য দূর থেকে রকেট ছোড়া ও তার বিস্ফোরণের শব্দ পেলাম। বুঝলাম, আরমার্ড ব্রিগেডের কোনো ট্যাংক বা গাড়ির ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে ভারতীয় পক্ষ। এর পরক্ষণেই পাকিস্তানি জঙ্গি বিমান এসে গেল। ভারতীয় একটি বিমানকে সেটি পেছন থেকে ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই পাকিস্তানি বিমান থেকে রকেট ছুড়তে দেখলাম। ভারতীয় বিমানটি ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করতেই দেখলাম তার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে, অর্থাৎ ঠিকমতো আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তাতে আগুন লেগেছে। ভারতীয় বিমানটি ওই অবস্থায় নিচে নামতে নামতে একসময় দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। এর একটু পরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম। গ্রামের শত শত লোক দাঁড়িয়ে এই ডগ ফাইট মজা করেই দেখছিল। বাকি দিনটা এখানেই চুপচাপ কাটালাম।

১৩ ডিসেম্বর রাতে সন্ধ্যার খানিকটা পরপরই আবার যাত্রা শুরু করতে হলো। শুনলাম, আগামীকাল রাতে অর্থাৎ ১৪ বা ১৫ ডিসেম্বর রাতে ৬ আরমার্ড ডিভিশন ও ১৭ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন পাসরুর সীমান্ত দিয়ে চূড়ান্ত যৌথ আক্রমণ চালাবে। এই সীমান্তে ৪ তারিখ থেকেই প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। দুই পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে এবং দুই পক্ষই বড় বড় সাফল্যের দাবি করছে, যা রেডিওতে শুনছি। আমাদের অবস্থান ছেড়ে রাস্তায় নামতেই যুদ্ধের পরিণতির কিছু আলামত নজরে আসতে লাগল। গভীর রাত। ধুলোর রাস্তা ধরে আমরা ছুটে চলেছি। ওই গভীর রাতেই রাস্তার দুই পাশ দিয়ে মানুষ যুদ্ধবিধ্বস্ত সীমান্ত অঞ্চল ছেড়ে এদিকে আসছে, আর আমরা সেদিকে যাচ্ছি। তাদের কেউ আসছে হেঁটে, কেউ মোষের গাড়িতে, কেউ বা ট্রাক্টরের পেছনে বাঁধা ট্রেইলারে চেপে। এদের মধ্যে আছে সব বয়সের পুরুষ, মহিলা আর শিশু। আর মালপত্র ও লটবহর। মনে হচ্ছিল, হলিউডের কোনো যুদ্ধের ছবি দেখছি। না, এটাই এখনকার বাস্তবতা। কেউ কেউ রাস্তার অদূরে ঠান্ডায় জমে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা গরম করে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, একটুখানি ঘুমিয়ে নিচ্ছে। ডিসেম্বরের এই প্রচণ্ড শীতে এদের যে কী করুণ অবস্থা, তা আমরা হয়তো সামান্যই বুঝতে পারছি। এরা যুদ্ধাক্রান্ত এলাকার লোক; নিজেদের বাড়িঘর, আসবাব, জিনিসপত্র সব ছেড়ে সামান্য সহায়-সম্বল নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে চলছে। দেখলাম, অনেকে তাদের গৃহপালিত পশুগুলোও সঙ্গে নিয়ে চলেছে। জানি না, সরকার নিজের দেশে স্থানচ্যুত এই হাজার হাজার লোকের আশ্রয়, খাদ্য বা চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করছে কি

না (পরে শুনেছি, প্রায় ১০ লাখ লোক বাস্তুহারা হয়েছিল)। আমার দেশ বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারে এর চেয়েও করুণ অবস্থায় লাখ লাখ নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুর তাদের বাড়িঘর ছেড়ে সর্বস্ব হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার কথা মনে পড়ল। কত লোক নিগৃহীত হয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে, তার হিসাব নেই। তাদের নিয়ে হৃদয়বিদারক নানা কাহিনি বিবিসিতে শুনে আসছিলাম। এখানে পাকিস্তানিদের জীবনেও যুদ্ধের কিছু ছোঁয়া লাগছে। তবে এরা তো নিরপরাধ সাধারণ মানুষ; যুদ্ধ বাধানোর চক্রান্তের সঙ্গে এসব নিরীহ মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের পিছু হটার নানা সংবাদ শুনছি। ভোর হওয়ার আগেই যুদ্ধাবস্থানে পৌঁছে গেলাম। আনিস শোনাল, বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান আর্মিকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিচ্ছে। অল ইন্ডিয়া রেডিওর সব কেন্দ্র থেকে প্রচার হচ্ছে খবরটা। এই ফ্রন্টেও সেই আবেদন শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চল মুক্ত হয়ে গেছে। তিন দিক থেকে মিত্রবাহিনী ঢাকার খুবই কাছে পৌঁছে গেছে। এসবই আমাদের জন্য দারুণ উত্তেজনাকর খবর; কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, সামনের রাতেই তো এদিক থেকে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আর সেই আক্রমণের আমরাও অংশীদার। আমার বদ্ধমূল ধারণা হলো, এই হামলার মাধ্যমে পাকিস্তান শেষ হয়ে যাবে এবং ভারত পাকিস্তানের অনেক অংশ দখল করে ফেলবে। শুনেছি, এরই মধ্যে দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ সিন্ধু-রাজস্থান সেক্টরের বিরাট এলাকা ভারতীয় বাহিনীর দখলে চলে গেছে। সকালে আখখেতের আড়ালে বসে আমরা তিনজন নাশতা খাচ্ছি। আনিস এ সময় কথা ওঠাল, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান আর্মিকে আত্মসমর্পণের জন্য বলা হচ্ছে। ক্যাপ্টেন মনজুর এ কথা শুনে রেগে গিয়ে বললেন, এসবই মিথ্যা কথা। ইন্ডিয়ার প্রপাগান্ডা। আরও বললেন, 'আপনারা যা বিশ্বাস করছেন, তা ঠিক নয়।' এই বলে তিনি চলে গেলেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লজ্জাকর পরাজয়

সারা দিন ধরে গভীর আগ্রহ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছি—কী হয়, না হয়! আজ রাতেই, অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর দিবাগত রাতের শেষ দিকে এই ফ্রন্ট থেকে আক্রমণ চালানো হবে। তাতে আমরাও থাকব। নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ আমার আর আনিসের মধ্যে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা। বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ক্যাপ্টেন মনজুর তো আর দেখাই করেন না। সাধারণ সেনাদের তো এ নিয়ে আলাপ করার কোনো সুযোগই নেই। তাদের মধ্যে

নিশ্চয়ই আতঙ্ক রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনী যে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে, সে খবর কি তারা পাচ্ছে না! এই ফ্রন্টে প্রথম দিকে তারা ভালোই করেছিল; কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারেনি। সবকিছুই বিভিন্ন রেডিওর খবর থেকে আন্দাজ করছি। আমরা নিজেরাই তো যুদ্ধের অবস্থানে বসে আছি। অন্যখানে কী হচ্ছে, সেটা জানার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের স্তর হচ্ছে সর্বনিম্ন মাঠপর্যায়ের। এই গণ্ডির বাইরের খবরাখবর জানতে চাওয়াটা এখন আমাদের জন্য দস্তুরমতো বিপজ্জনক।

এদিকে রাত পার হয়ে গেল। ১৫ তারিখ সারা দিন চুপচাপেই কাটল। কোনো রকম যুদ্ধ-তৎপরতা নেই। আজ আমাদের সেক্টরে কোনো পক্ষের জঙ্গি বিমানও দেখছি না। একটা থমথমে ভাব। দিন পেরিয়ে রাত এসে গেল। রাতেও কোনো কিছু ঘটল না। আমি আর আনিস সারাক্ষণ রেডিওর নানা চ্যানেল মারফত খবর নিচ্ছি। মিত্রবাহিনী অর্থাৎ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী ঢাকার খুব কাছে চলে এসেছে। অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে বারবার আত্মসমর্পণের আবেদন জানানো হচ্ছে। ১৫ তারিখের দিন পেরিয়ে রাত এসে গেল। এরই মধ্যে রেডিওতে শুনলাম, ভারতের প্রধানমন্ত্রী একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মনে আশা জাগল। পাকিস্তানের পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই, যদিও সেটা হবে চরম লজ্জাকর পরাজয়ের প্রকাশ্য স্বীকৃতি। রাতে বিবিসির বাংলা বিভাগের একটি খবর শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। জানাল, ঢাকায় তাদের সংবাদদাতা নিজামুদ্দিনের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাঁর পাঠানো সংবাদ আমরা পাচ্ছিলাম কয়েক মাস ধরে। বিবিসি সন্দেহ করছে, তাঁর কোনো বিপদ হয়েছে।

ওদিকে সকাল নাগাদ আরও উত্তেজনাকর খবর পেলাম—মিত্রবাহিনী ঢাকা দখল করে নিয়েছে। আগামীকাল পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। তাহলে যুদ্ধ থামছে। আর কোনো চিন্তা নেই। মন খুশিতে ভরে গেল। আমাদের দেশ আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু এ নিয়ে বিন্দুমাত্র আনন্দ-উল্লাস করতে পারছি না। আনিস বারবার আমার তাঁবুতে আসছে আর নানা খবর দিয়ে যাচ্ছে। বলল, ক্যাপ্টেন মনজুর ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছেন। সারাক্ষণ গালাগালি দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান আর সেনাপ্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খানকে। এখন তিনি আনিসের সামনেও মুখ খুলছেন। সাধারণ সেনাদের মধ্যে এখনো এ বিশ্বাস জন্মায়নি যে, পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং তারা আত্মসমর্পণ করতে

যাচ্ছে। আনিসকে উপদেশ দিলাম, বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়েছে—এ নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনায় যেন সে জড়িয়ে না পড়ে। এখানে সবারই মনের অবস্থা যে খারাপ, তাতে সন্দেহ নেই। কখন কোন দিক দিয়ে কার কী প্রকাশ ঘটে, তা বলা যায় না। মহান আল্লাহর দরবারে হাজারো শুকরিয়া জানাই। অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। শেষ মুহূর্তে এখানে যে আমাদের কোনো ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়নি, তার জন্যও কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে। কোনো ধরনের অঘটনের মোকাবিলা করতে হয়নি। যুদ্ধের ছোঁয়াও লাগেনি গায়ে। মজার কথা হলো, সারাটা সময় আমরা কনসেনট্রেশন এরিয়াতেই কাটিয়ে দিলাম। মোটকথা, আমার অধিনায়কত্বাধীন ব্যাটারি অক্ষত রয়েছে।

পাকিস্তান যদি ভারতের একতরফা যুদ্ধবিরতি না মেনে এই ফ্রন্টে ও অন্য কোথাও আরও আক্রমণ চালিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখত, তাহলে তাদের পরিণতি হতো আরও মারাত্মক। তাদের সব শক্তি যে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের মতো জুনিয়র স্তরের অফিসাররাও বুঝতে পারছিলাম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব ভুলের পর ভুল করে চলেছিল। পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা তো দূরের কথা, এখন তাদের নিজেদের ভূখণ্ড রক্ষাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

এক কালে প্রায়ই এদেশীয় অফিসারদের মুখে শুনতাম, ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করলে পাকিস্তানি বাহিনী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দিল্লি পৌঁছে যাবে। সেসব বাগাড়ম্বর এখন কোথায় গেল! ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় আমার মাঠপর্যায়ের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় সেই হম্বিতম্বির কিছু দেখিনি। সে সময়ও শিয়ালকোট শহর প্রায় পতনের মুখে ছিল। ভারতীয় বাহিনী ১৫ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনকে পাসরুরের কাছে প্রায় ঘিরে ফেলেছিল। তারা দখল করে নিয়েছিল সীমান্তের সাত-আট মাইল এলাকা। সেখানে আমি ফিল্ড ব্যাটারির জিপিও হিসেবে প্রথম দিন থেকেই যুদ্ধে জড়িত ছিলাম। (আমার তখনকার যুদ্ধজনিত বিবরণ এই লেখার প্রথম অংশে রয়েছে)। সেবার লাহোর শহরও পতনের মুখে ছিল। অবশ্য কোনো কোনো সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীও ভারতীয় অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে বেশি দূর এগোতে পারেনি। যত দূর জানা যায়, এবারের যুদ্ধে পাকিস্তান প্রথম দিকে কিছু সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের অবস্থান থেকেই বুঝতে পারছিলাম, মাঠপর্যায়ে পাকিস্তানি সেনারা যথেষ্ট সাফল্য দেখাতে পারলেও উচ্চপর্যায়ে তাদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা ছিল বড়

ধরনের। তখন আমার মনে হয়েছিল, ৩ ডিসেম্বর বিকেলে পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় বিমানঘাঁটিগুলোর ওপর অতর্কিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইয়াহিয়া খান ভারতের ফাঁদেই পা দিয়েছেন। অবশ্য এ ছাড়া তাঁর জন্য অন্য আর কোনো পথ খোলা ছিল না। জাতিসংঘে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সহায়তা কোনো কাজে আসছিল না। রণাঙ্গনেও তাদের প্রতিশ্রুতি কাজে লাগেনি। যে মানসিকতা নিয়ে ইয়াহিয়া খান, হামিদ খান ও তাঁদের দোসর জুলফিকার আলী ভুট্টো সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ওপর বর্বরতা চালানোর নির্দেশ দিয়ে নাৎসিদের সমপর্যায়ে চলে গিয়েছিল, তার পরিণাম এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। মার্কিন সপ্তম নৌবহর আসছে বলে পাকিস্তান খুব আশা করেছিল। কিন্তু সেই নৌবহর ভারত-বাংলাদেশ জলসীমার ধারেকাছে পৌঁছার আগেই পাকিস্তানি বাহিনী লজ্জাকর আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

হতাশাগ্রস্ত জেনারেলদের নাটকীয়তা

মাত্র ১২ দিনের মাথায় যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় দিনে বর্তমান অবস্থান থেকে পেছনে পাসরুরের দক্ষিণে একটি বন এলাকায় আমাদের অবস্থান নিতে হলো। তবে অনেকটা শান্তির সময়ের মতো। একই এলাকায় ৬ আরমার্ড ডিভিশনের আর্টিলারি ব্রিগেডের আরও দুটি এসপি ফিল্ড রেজিমেন্টও এতে ঠাঁই গেড়েছে। এখানে আসার পর অন্য অফিসারদের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ হলো। পাকিস্তানি (তখনকার পশ্চিম পাকিস্তান) সবারই মন বিষণ্ন, কেউ কেউ উত্তেজিত। তবে আমাদের সামনে তারা কিছুটা সংযতই থাকত। এরই মধ্যে একদিন আর্টিলারি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে সমস্ত অফিসারের জমায়েত হওয়ার নির্দেশ এল। সম্ভবত ১৯ বা ২০ ডিসেম্বর। সকাল ১০টায় আমাদের অবস্থান থেকে কয়েক মাইল দূরে এক বাংকারে জমায়েত হলাম। বাইরে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। ঠাসাঠাসি করে তার ভেতরেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। আর্টিলারি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এফ বি আলী একটু পরই এসে যোগ দিলেন। তিনি খুবই চৌকস ও দক্ষ অফিসার হিসেবে পরিচিত। ছয় ফুটের ওপরে লম্বা পাতলা গড়নের, দেখতে অনেকটা হলিউডের নায়ক পিটার ও টুলের মতো। ঢুকলেন অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে। কোমরে তাঁর ঝুলন্ত পিস্তল। গায়ে একটি বিশেষ ধরনের জ্যাকেট। এসেই কোনো ভূমিকা বা ভণিতা না করে দাঁড়ানো অবস্থায় ইংরেজিতে কথা বলতে

লাগলেন। শুরুতেই বললেন, 'তোমরা জানো, পাকিস্তান সেনাবাহিনী হিন্দুদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর আগে মুসলমানরা কখনোই হিন্দুদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। এবার সেটাই ঘটেছে। এর জন্য তোমরা দায়ী নও। দায়ী আমার র‍্যাংক থেকে ওপরের সব জেনারেল। তারা দেশ চালাতে জানে না, যুদ্ধ চালাতে জানে না। এই দুটি কাজ ছাড়া সব অপকাজ তারা করতে জানে ও করেছে। তারা দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশের একটি অংশকে হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়েছে।'

প্রায় ১৫ মিনিট অনর্গল ইংরেজিতে ক্ষোভমেশানো স্বরে বক্তৃতা দিয়ে তিনি চলে গেলেন। নিঃশব্দে সবাই শুনল। মনে হলো তাঁর কথাবার্তা উপস্থিত সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বের হয়ে জিপে বসে সোজা নিজের তাঁবুতে চলে এলাম। এবারই প্রথম পূর্ব পাকিস্তান, এখন স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর লজ্জাকর আত্মসমর্পণ ও ভারতীয়দের কথামতো যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার পর অফিসারদের প্রতিক্রিয়া দেখার সুযোগ হলো। মনে মনে খুশি হলাম এই মনে করে যে এমনটাই তাদের প্রাপ্য ছিল।

পরের কয়েক দিনের মধ্যে পাকিস্তানের ইতিহাসের আরও কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। সবকিছুর উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল ৬ আরমার্ড ডিভিশনের ট্যাকটিক্যাল হেডকোয়ার্টারে, যা পাসরুরে আমাদের অবস্থানের দক্ষিণে অবস্থিত। আরও মাইল কয়েক দক্ষিণে ১৭ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের অবস্থান। ১৮ ডিসেম্বর রাতে আমার অধিনায়কত্বের চারটি এসপি গান (প্রতিটিতে বিমানবিধ্বংসী চারটি হেভি মেশিনগান সংযুক্ত) আর্টিলারি ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এফ বি আলী নিজে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারের চারদিকে ট্রুপ কমান্ডারকে দিয়ে মোতায়েন করিয়ে নেন। তাদের ওপর নির্দেশ থাকে, রাতে বা দিনে আকাশপথে ওই এলাকার ওপর কোনো কিছুর আবির্ভাব ঘটলেই তাকে বা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাবে। এ ব্যবস্থা আমার অগোচরেই নেওয়া হয়। প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। কিছুদিন পর পাকিস্তানি অফিসারদের মুখে নেপথ্যের অনেক কাহিনি শোনা গেল। ব্রিগেডিয়ার এফ বি আলীর নেতৃত্বে সেখানে অবস্থিত দুই ডিভিশনের পক্ষ থেকে জি এইচ কিউকে (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর) চরমপত্র দেওয়া হয়। শোনা যায়, ৬ আরমার্ড ডিভিশনের জিওসি ব্রিগেডিয়ার এফ বি আলীর চাপের মুখে নাকি আল্টিমেটাম পত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। ১৭ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জিওসিও স্বাক্ষর করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ খান, জেনারেল মিঠ্‌ঠা খান প্রমুখ সেনা নেতৃত্বের সবাইকে পদত্যাগের

আলটিমেটাম দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে কর্নেল স্টাফ ডিভিশনের অধীন একটি বিমানে করে রাওয়ালপিন্ডি যান ও জিএইচকিউতে পৌঁছে দেন। পরে শুনেছি, আত্মসমর্পণের ঘটনায় জিএইচকিউয়ের সর্বস্তরের অফিসাররা খুবই বিক্ষুব্ধ ছিলেন। যুদ্ধে কেন হেরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হলো, তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য জেনারেলদের কাছে দাবি তোলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে জিএইচকিউয়ের অফিসারদের ব্রিফিং করতে এলে জেনারেল হামিদ ও অন্য কয়েকজন জেনারেল তাদের হাতে নাজেহাল হন। তাঁদের পদত্যাগ দাবি করা হয়। এমনও শোনা যায়, কোনো কোনো অফিসার চিৎকার করে জেনারেল হামিদকে বলতে থাকেন তিনি যেন এক্ষুনি নিজের র‍্যাংক ব্যাজ খুলে ফেলেন। হামিদ নাকি রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যান। ইয়াহিয়া খান ও হামিদ প্রমুখের পদত্যাগ করা, জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়া এবং জেনারেল গুল হাসানের সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্তি—সবকিছুই পরবর্তী ঘটনা।

যুদ্ধবিরতির পর মনে স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশের কোনো সুযোগ পাচ্ছিলাম না। সেখানকার অফিসারদের মনের অবস্থা তো খুবই খারাপ। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের কোনো ধরনের আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করা ঠিক হবে না বলে মনে করি। ফলে আমরা সর্বতোভাবে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে চলেছি। যুদ্ধাঞ্চলের বাইরে, অর্থাৎ রাস্তায় চলাচলের সময় বা শহরে কিছু কিছু ঘটনার কথা শুনলাম পাঞ্জাবি অফিসারদের মুখ থেকে। গুজরানওয়ালায় একজন লে. কর্নেলের গলায় নাকি জুতার মালা পরানো হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পর্যন্ত হয়েছে। ইয়াহিয়া ও হামিদ সম্পর্কে মুখরোচক নানা ধরনের কাহিনি প্রচারিত হতে থাকে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের সেনাবাহিনীর পোশাক পরে বেসামরিক এলাকায় যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ছুটিছাটা তো এমনিতেই বন্ধ। কিছুদিন পর অবশ্য অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এদিকে খারিয়াঁয় স্ত্রী-পুত্রকে দেখার জন্য মনটা খুব ছটফট করছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেই যে চলে এসেছিলাম, তাদের সঙ্গে দেখা করা আর সম্ভব হয়নি। মাঝেমধ্যে চিঠি মারফত খবরাখবর পেয়েছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার খবর তো তারা জানেই; আর এ খবর আমাদের সবারই ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট আর বেদনা সবই দূর করে দিয়েছে।

অবশেষে দুই দিনের ছুটি পেলাম। যারা পরিবার নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে আছে, কেবল তাদেরই ছুটি দেওয়া হলো। ডাক্তার বন্ধু ক্যাপ্টেন মোফাজ্জল

হায়দারের ফক্সওয়াগন গাড়িতে চেপে পাসরুর থেকে রওনা হলাম। দিনটি ছিল ১০ জানুয়ারি। ঘটনাচক্রে সেদিনই বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার স্থপতি, যাঁর নামে বেশুমার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তিনি আর কেউ নন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন। দুই দিন আগে ভুট্টো তাঁকে মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা দেন। তিনি পাকিস্তান থেকে লন্ডনে যান, সেখান থেকে নয়াদিল্লি হয়ে ঢাকায় ফিরছেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওর সহায়তায় বাংলাদেশ বেতারযোগে তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ধারাবিবরণী শোনানো হচ্ছে। গাড়িতে বসে সারা রাস্তায় সেই ধারাভাষ্যই শুনছিলাম। আবেগ আর আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মন ভরে গেল। পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আনন্দে নতুন মাত্রা যোগ করল বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনার বেতারভাষ্য। মনের সমস্ত দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তির সাময়িক অবসান ঘটল। দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং এখনো বেঁচে আছি—এটাই এখন সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। বাসায় এসে দেখি, আরও দুটি পরিবারের সদস্যরা আমাদের বাসায় উপস্থিত। একটি মেজর আনোয়ারুল হকের ও অন্যটি ক্যাপ্টেন আশরাফুল হুদার (প্রথমজন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী, অন্যজন সাবেক আইজিপি)। যুদ্ধ শুরু হলে বহু বাঙালি অফিসারের পরিবার-পরিজনকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সবকিছু আপাতত তুচ্ছ হয়ে গেছে।

দুই দিন এখানে কাটিয়ে আবার কর্মস্থলে ফিরে গেলাম।

অন্তরীণে থাকা পৌনে দুই বছর

আমরা আর পাকিস্তানি নই, এখন বাংলাদেশি। পাকিস্তানি অফিসার হিসেবে তাদের সঙ্গে থাকার আর কোনো মানে হয় না। বর্তমান দায়িত্বে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাচ্ছিলাম না। কবে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার হুকুম আসবে, আমরা অপেক্ষায় ছিলাম সেই নির্দেশের। অবশ্য এরই মধ্যে আমি আর ক্যাপ্টেন আনিস রুটিন কাজকর্ম করা ছেড়ে দিয়েছি। ক্যাপ্টেন মনজুর আলী আহমেদ একাই সবকিছু সামলাচ্ছেন। তাঁদের সবার সঙ্গেই আমার স্বাভাবিক সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন আছে। তাঁরাও জানেন, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। গোপনে কেউ কেউ আমাদের কাছে মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁদের গোপনে কথা বলার পেছনে একটা মনস্তাত্ত্বিক ভীতি ছিল। আমাদের সঙ্গে বেশি মিশলে বা কথাবার্তা বললে গোয়েন্দা রিপোর্ট হয়ে যেতে পারে। তাতে তাঁদের চাকরির ক্ষতি হতে পারে!

যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত সে আদেশ এসেই গেল। ১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পাসরুরের সেই বনাঞ্চলে অবস্থিত ৪৮ (এসপি) লাইট এএ ব্যাটারি থেকে বিদায় নিলাম। ক্যাপ্টেন আনিসও আছে আমার সঙ্গে। ব্যাটারির সবাই উপস্থিত হয়ে হ্যান্ডশেক করে আমাদের বিদায় জানালেন। আমাদের পাকিস্তানি সামরিক জীবনের এখানেই ইতি হলো। মন থেকে নেমে গেল একটা বড় বোঝা। ওই দিনই বাসায় ফিরলাম। ভাবতে ভালো লাগছে যে আমাকে আর পাকিস্তান আর্মির ইউনিফরম পরতে হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় একটা চিন্তা আমাদের পেয়ে বসল। চিন্তাটা হলো, এরা আমাদের নিয়ে কী করবে! কবে দেশে যেতে দেবে! দেশের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় আমার মা-বাবা খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন। এবার তো এখানে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আছি। আমরা বেঁচে আছি কি না, তা-ও তাঁরা জানেন না। স্ত্রীর মা-বাবাও নিশ্চয়ই চিন্তাগ্রস্ত। আমাদের এখন প্রধান কাজই হলো, কীভাবে দেশে খবর পাঠাব। স্ত্রীর দুই ভাই এখানে আছেন, একজন করাচিতে পিআইএতে চাকরি করেন ও অন্যজন লাহোরে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। তাঁরা যুক্তরাজ্যের লিস্টারে বসবাসরত আমার স্ত্রীর দিকের আত্মীয় ডা. এ এফ এম আকরম সাঈদের মাধ্যমে দেশে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

ইতিমধ্যে খারিয়াঁয় যেসব অফিসার ছিলেন, তাঁদের সবাই এখানে এসে গেছেন। এদিকে আমার ছেলের অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। এখনো সিএমএইচের সব ধরনের সামরিক সুবিধাই পাচ্ছি। তবে কত দিন পাব, সেটাই দেখার বিষয়। আমরা স্বচ্ছন্দেই ঘোরাফেরা করছি। কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রীর দুই ভাই-ই এক এক করে এসে আমাদের দেখে গেছেন। প্রায় সব অফিসারের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবও পরস্পরের খোঁজখবর নিতে আসা-যাওয়া করছেন। এরই মধ্যে আমাদের অপশন দেওয়ার চিঠি এসে গেল, অর্থাৎ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকব কি না, সেটা জানাতে হবে। খারিয়াঁয় আমাদের কেউ পাকিস্তানে থাকবেন—এমন অপশন দিয়েছেন বলে শুনিনি।

কয়েক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই যাঁরা ব্যাচেলর ও পরিবার ছাড়া, তাঁদের অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার হুকুম এল। একদিন স্পেশাল ট্রেনে করে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলো। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খাইবার পাস হয়ে লান্ডিকোটাল যাওয়ার পথে ব্রিটিশ আমলে তৈরি সাঘাই ফোর্টে তাঁদের রাখা হবে। বিষাদ ভারাক্রান্ত মনে তাঁদের বিদায় দিলাম। সবার মনেই

ভয় ভর করেছে—সামনের দিনগুলোয় আমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে সেই কথা ভেবে। তাঁদের অনেকেই খোলাখুলি বললেন, 'আমরা পরিবার নিয়ে আছি, আমাদেরই হয়তো দুর্ভোগ বেশি হবে।' অন্য সেনাসদস্যদেরও এরই মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কেবল সপরিবারে যাঁরা আছেন, তাঁরা এখন পর্যন্ত এখানেই থাকার সুযোগ পাচ্ছেন।

ওদিকে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের ভারতে সরিয়ে নেওয়ার খবর আসছে। বাংলাদেশে তাঁদের বিচারের জন্য দাবি উঠছে। এখানে তাঁদের জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে। প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি আমাদের বিষয়ে শক্ত অবস্থানই নেবেন। তিনি এ নিয়ে যে রাজনীতির খেলা খেলবেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এভাবে আরও কয়েক মাস পার হলো। এবার এল বর্তমান অবস্থান থেকে আমাদের সরিয়ে নেওয়ার পালা। এরই মধ্যে অবশ্য আমরা আমাদের কম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাদসাদ দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে ফেললাম। অবশেষে খারিয়াঁ থেকে আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রিসালপুর ক্যান্টনমেন্টে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। একটা স্পেশাল ট্রেনে ওঠানো হলো। এখন থেকে বুঝতে শুরু করলাম, আমরা বন্দী। যুদ্ধবন্দী না হলেও তার কাছাকাছি কিছু। আমাদের সব বাক্সপেটরা খুলে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালানো হলো। বহু কিছু রেখে দেওয়া হলো। তবে আমার ভেসপা স্কুটারটি ট্রেনে ওঠানো গেল। প্রায় ২০টি পরিবারের সদস্যদের ট্রেনের কামরায় রেখে বাইরে থেকে তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এক রাত ও আধা দিনের ট্রেন যাত্রা শেষে আমরা রিসালপুর পৌঁছলাম। আগে থেকেই আমাদের জন্য এখানে বাড়ি বরাদ্দ করা ছিল। ব্রিটিশ আমলের খুবই পুরোনো বাড়িতে দুই বা তিনটি করে পরিবারের থাকার ব্যবস্থা। আমি ও মেজর আনসার আলী যে বাসা পেলাম, সেটা এতই জীর্ণশীর্ণ আর ভুতুড়ে যে আমার স্ত্রী তো কেঁদেই ফেললেন। বাড়িটি বহু বছর আগেই নাকি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। একটু পরিষ্কার ও চুনকাম করে দেওয়া হয়েছে, এই যা। ভেতর অনেকখানি দুর্গের মতো। আমরা বাড়ির এক অংশ নিলাম। রুমগুলোর কিছু অংশের আস্তর নেই। দিনের বেলায়ও বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। কী আর করা, এখানেই শুরু হলো আমাদের আরেক জীবন। কদিনের মধ্যেই টের পেলাম, এখানে সাপের বড় উপদ্রব। সাপ হলো এমন এক প্রাণী, যার নাম শুনলেই আমার স্ত্রীর অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম হয় (একবার তো ছাদ

থেকে একটা সাপ সোজা বিছানাতেই এসে পড়ে)। গেটে পাহারাদার মোতায়েন থাকছে ২৪ ঘণ্টা।

কিছুদিনের মধ্যেই শীত এসে পড়ল। পুরো শীতকালটাই ওখানে কাটাতে হলো। তবে সময় ভালোই কাটল বলতে হবে। এ সময় আমার ভেসপা স্কুটারটা খুবই কাজ লেগেছে। দিনের বেলায় ঘুরতে-ফিরতে পারতাম। রাতে কোথাও বের হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। বাজার করার জন্য কাবুল নদীর পাড়ে মাছের বাজারে যাওয়া যেত। তবে এ রকম অবস্থা আর বেশি দিন থাকল না। ভুট্টো আমাদের ব্যাপারে আরও কঠোর হতে লাগলেন। তাঁদের যুদ্ধবন্দীদের বিচার হলে আমাদেরও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে বলে প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিয়ে বসলেন। তত দিন আমাদের স্বদেশে যেতে দেওয়া হবে না, যত দিন পর্যন্ত একজন পাকিস্তানি সেনাসদস্য ভারতের মাটিতে আটক থাকবে। তাদের সঙ্গে আমাদের বন্দিবিনিময় হবে। কী ভয়ানক অন্যায়, অযৌক্তিক ও অমানবিক কথা! বাস্তবে আমরা যুদ্ধ করেছি পাকিস্তান আর্মির পক্ষে, মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর বিপক্ষে। এখন আমাদের বিচার হবে। বুঝতে বাকি থাকল না যে সামনে আমাদের আরও কঠিন দিন আসছে। আমাদের অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে।

১৯৭৩ সালের শুরুতে (সম্ভবত ফেব্রুয়ারি) টের পেলাম, আবার আমাদের সরানো হবে। এবার আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে পাঞ্জাবের মান্ডি বাহাউদ্দিনে। আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। আবার ট্রেনযাত্রা। এবার আরও কড়াকড়ি। আমার শখের স্কুটারটা রেখে আসতে হলো। আসলে এবার পাক্কা বন্দী। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের। ট্রেনের কামরার দরজা-জানালাগুলো বাইরে থেকে এমনভাবে পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দেওয়া হলো, যাতে কেউ পালাতে না পারে। আমাদের তোলা হলো মান্ডি বাহাউদ্দিন শহরের অদূরে একটি সেচ প্রকল্পের অস্থায়ী খালি কলোনিতে। অন্যান্য জায়গা থেকেও পরিবারসহ বাঙালি অফিসার ও অন্য শ্রেণীর সদস্যদের এখানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এ রকমেরই আরেকটি ক্যাম্প করা হয় কোয়েটায়।

এবার তিন রুমের এক বাড়িতে আরেকটি পরিবারের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে নিলাম। আনুমানিক নয় ফুট লম্বা ও নয় ফুট চওড়া নিচু ছাদের রুমটিতে ছোট একটিমাত্র জানালা। চৌকি বা চারপাই নেই। মেঝের ওপর শোয়ার ব্যবস্থা করতে হলো। ফলে আমার অসুস্থ ছেলে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। এবার তার নিউমোনিয়াই হয়ে গেল। একদিন অবস্থার এতই অবনতি হলো যে তার জীবনের আশা একেবারে ছেড়েই দিলাম। আমাদের এই একই

ক্যাম্পে প্রায় ১০০টি পরিবারের বসবাস। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ডাক্তার ছিলেন। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ছেলেটা আমার কিছুদিন ভালো থাকলেও আবারও তার অবনতি ঘটতে থাকে। এখানে, এই ক্যাম্পে অনেকের মধ্যে থাকায় মানসিক দিক দিয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলেও দুশ্চিন্তা কমছিল না। অল্প দিনের মধ্যেই শুরু হলো আর্থিক দুরবস্থা। বেতন দেওয়া বন্ধ হয়েছিল অনেক আগেই। পরিবর্তে ভাতা বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৫০ টাকা। এ দিয়েই কোনো রকমে চলতে হয়। যাঁরা অত সিনিয়র নন, অর্থাৎ ক্যাপ্টেন-মেজর র‍্যাংকের, তাঁদের সবচেয়ে বেশি আর্থিক চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। অনেকেই স্বর্ণের অলংকার বিক্রি করতে লাগলেন। আমি কোনো রকমে ম্যানেজ করে চলতে লাগলাম। এখানে আসার পর রেডক্রসের মাধ্যমে চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যবস্থা হওয়ায় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ করার সুযোগ হলো। সবচেয়ে ভালো লাগত, বিবিসির বাংলা বিভাগের মাধ্যমে দেশের আত্মীয়স্বজনের বার্তা শোনার ব্যবস্থাটি। এটাই আমাদের মনকে দারুণ চাঙা করে রেখেছে। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখ পর্যন্ত এখানেই ছিলাম। অবশেষে ভুট্টো ভারতে আটক যুদ্ধাপরাধী শয়তানগুলোর বিনিময়ে আমাদের ছেড়ে দিতে সম্মত হলেন। রেডক্রস ও অন্য কিছু দেশের মধ্যস্থতায় আমাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হলো। মান্ডি বাহাউদ্দিন থেকে ট্রেনে প্রথমে লাহোর, সেখানে এক রাত থাকার পর ৩০ সেপ্টেম্বর লাহোর বিমানবন্দর থেকে মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি

রাশিয়ার তৈরি তিন ইঞ্জিনবিশিষ্ট বিমানটি যখন স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবতরণ করল, তখন বেলা একটা। দেশে ফেরার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। বিমানটি থামতেই কয়েকজন আর্মি অফিসার ভেতরে ঢুকলেন। একজনকে চিনতে পারলাম, মেজর মেহদি আলী ইমাম (বছর কয়েক আগে মারা গেছেন)। করাচির উপকণ্ঠে মালির ক্যান্টনমেন্টে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। আমি যখন ক্যাপ্টেন, মেহদি তখন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। ১৯৬৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে যে সামান্য কজন অফিসার যোগ দিয়েছিলেন, মেহদি ছিলেন তাঁদের একজন। আমাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। বাংলাদেশের গর্বিত অফিসার। নামতেই দেখলাম, একটি সুসজ্জিত সেনাদল এক জায়গায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরই কয়েকজন সিনিয়র অফিসার এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। দেখেই চিনতে পারলাম। কপালে মুক্তিযুদ্ধে আহত হওয়ার চিহ্ন। তিনি তখন চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস)। শুনলাম, পাকিস্তান থেকে লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন আসছেন জেনে তাঁকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানাতেই ব্রিগেডিয়ার মোশাররফের এখানে আসা। তাঁকে নেওয়ার জন্য একটি কালো সেভ্রোলেট কারও দেখলাম। আমাদের এই প্লেনেই তাঁর ঢাকা পৌঁছার কথা

ছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। আমরাও প্লেনে তাঁকে দেখিনি। মেহদি আমাদের নিয়ে বিমানবন্দরের একটি হ্যাঙ্গারে স্থাপিত অফিসে নিয়ে বসালেন। নিজের থেকেই বললেন, ডকুমেন্টেশনে অনেক সময় লাগবে। তাই আমার স্ত্রীর পক্ষে অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে ওখানে বসে থাকা ঠিক হবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার স্ত্রী ও ছেলেকে একটি জিপ জোগাড় করে তাঁর বেলায়েত রোডের বাসায় নিয়ে ওঠালেন। মেহদির চেষ্টায় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ডকুমেন্টেশনের কাজ শেষ হয়ে গেল। দুপুরে তাঁর বাসাতেই খেলাম। মেহদির জিপ পরে নারিন্দার মুনির হোসেন লেনের আমাদের নিজেদের বাসায় পৌঁছে দিল। সৌভাগ্যক্রমে মা ও বাবা দুজনই তখন সে বাসাতেই ছিলেন। আমাদের দেখে তাঁরা তো অবাক! আনন্দে সবার চোখেই পানি। শুনছিলেন বন্দিবিনিময় কার্যক্রম শুরু হয়েছে, কিন্তু প্রথম ট্রিপেই যে আমরা এসে যাব, তা কেউই ভাবতে পারেননি। আমার মা-বাবা দুজনই খুব ধর্মপরায়ণ। আল্লাহর মেহেরবানি ও তাঁদের দোয়াতেই দেশে ফিরতে পেরেছি। বাবা অসুস্থ, শয্যাশায়ী। শুনে আত্মীয়স্বজনও ছুটে এলেন। আমার স্ত্রীর দুই ভাই ও এক বোন ঢাকায়। দেখতে দেখতে তাঁরাও এলেন। প্রায় তিন বছর পর স্বাধীন দেশের বুকে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ফিরে আসা কী অপার আনন্দের; তা আমার মতো অবস্থায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও কেবল বুঝতে পারবে।

পরের দিন আবার ক্যান্টনমেন্টে ছুটলাম। ডকুমেন্টেশনের আরও কাজ বাকি। দিন কয়েক এ জন্য ক্যান্টনমেন্টে আসা-যাওয়া করতে হলো। এর মধ্যে ঢাকায় এ রকমের একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিনকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় যাঁর সঙ্গেই দেখা হয়, প্রশ্ন করেন, ওয়াসিউদ্দিন আসছেন কি না, কবে তিনি সেনাপ্রধান হবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে হলো, অতি সিনিয়র এই বাঙালি জেনারেলকে নিয়ে জনসাধারণের মনে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। এরই মধ্যে ক্যান্টনমেন্টে ডকুমেন্টেশনের কাজে এসে এক অফিসারের কামরায় বসতে হলো। যাঁর অফিসে বসা, তিনি মেজর পদমর্যাদার লোক। টেলিফোনে কোনো সিনিয়রের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। বুঝতে পারলাম, জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে নিয়ে কথা হচ্ছে। অপর প্রান্তের কথা শুনছিলাম না, কিন্তু কথোপকথনের এই প্রান্তে মেজর সাহেব যা বললেন, তাতে মনে হলো, খাজা ওয়াসিউদ্দিনের সেনাপ্রধান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি স্পষ্ট করেই বললেন, 'স্যার, দেশ স্বাধীন করেছি আমরা, নয় মাস যুদ্ধ করেছি আমরা,

আর ওনারা এসে এখন চিফ অব স্টাফ হবেন, আরও কত কিছু হবেন! এসব মানা যায় না।'

কথাটা শোনার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা এ রকম কোনো কিছু কখনোই মেনে নেবেন না। পরে একজন ঊর্ধ্বতন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের মুখেই শুনেছি, বঙ্গবন্ধু লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিনকে সেনাপ্রধান নিয়োগে সম্মতি দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সব ধরনের প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন, তাঁরা বিষয়টি ঢাকার কূটনৈতিক মহলকেও জানিয়েছিলেন। পরে তখনকার একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা আমাকে বললেন, তাঁদেরই প্রবল আপত্তির মুখে বঙ্গবন্ধু ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই জানলাম, আমাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এক মাসের ছুটির পর কাজে যোগ দিতে হবে। মনে স্বস্তি ফিরে পেলাম। পাকিস্তানে বসে নানা গুজব শুনে আসছিলাম। পাকিস্তানে আটকে পড়াদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হবে না—এ রকমের কত কথা! এমন গুজবের পেছনে যে সত্যতা ছিল, পরে তা জেনেছি। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বড় একটা অংশই চাননি যে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সামরিক কর্মকর্তা ও সদস্যদের বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে গ্রহণ করা হোক। তাঁদের যুক্তি ছিল, দেশ স্বাধীন করেছেন তাঁরা, এই সেনাবাহিনী (অন্য বাহিনীসহ) গঠিত হবে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। যাঁরা পাকিস্তানিদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, স্বাধীন দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁদের নেওয়া যেতে পারে না। এই যুক্তি যে নিতান্তই ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ-তাড়িত, তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। পাকিস্তানে আটকে পড়া প্রায় ২০ হাজার অফিসার ও অন্যান্য স্তরের সদস্যরা নিতান্তই অবস্থানগত কারণে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। তাঁদের সবাই বাংলাদেশের সন্তান, তাঁরা মনেপ্রাণে ও রক্তমাংসে গড়া বাংলাদেশি। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে না পারলেও তাঁদের কারও মনে দেশের স্বাধীনতার প্রতি আন্তরিক সমর্থনের ঘাটতি ছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য পাকিস্তানের বিভিন্ন বাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওই সব সদস্যের সশস্ত্র বাহিনীতে আত্তীকরণ না করার দাবি অন্যায় আবদার ছিল। দেশের জন্য বা সেনাসহ সব বাহিনীর জন্য তাঁরা সহায়ক শক্তি হওয়ার কথা, বোঝা নয়। স্বস্তির বিষয়, বঙ্গবন্ধুর সরকার ওই উদ্যোগ সমর্থন করেনি। পাকিস্তান-ফেরত অধিকাংশ সদস্যকেই বিভিন্ন

বাহিনীতে আত্তীকরণ করা হয়। তেমনি বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদে গ্রহণ করা হয়। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের টানাপোড়েনে সশস্ত্র বাহিনীগুলোয়, বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে নানা বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিভাজনের সৃষ্টি হয়। অনভিজ্ঞ সরকারের পক্ষপাতমূলক কিছু অপরিণামদর্শী নীতি গ্রহণের পরিণামও দুঃখজনক পর্যায়ে যেতে থাকে।

ছুটি পেলেও ঢাকার বাইরে কোথাও যেতে পারলাম না। বাবা ও ছেলে অসুস্থ। বেশির ভাগ সময় তাঁদের নিয়েই দৌড়াদৌড়ি করতে হলো। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব আসছে তাদের দেখতে। প্রতিদিনই শুনছি, পঁচিশে মার্চের রাত ও তার পরের নানা ঘটনা এবং মুক্তিযুদ্ধকালের নানা কাহিনি। এসব করুণ সব কাহিনি শুনে ধারণা আরও পোক্ত হলো যে, আমাদের দেশকে পাকিস্তানি বাহিনী দখল করা শত্রুদেশ ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি। ভাবছি, এত বছর পর দুনিয়ার কত পরিবর্তন হয়েছে! এখন হলে কি এমন বর্বরতা ও হিংস্রতা দেখিয়ে ইয়াহিয়া-ভুট্টোচক্র, তাঁদের দোসর জেনারেল ও পাকিস্তানি বাহিনীর ৯৩ হাজার যুদ্ধাপরাধী মানবতার বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধ করেও বিনা বিচারে পার পেতে পারত? অবশ্যই না।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। এরই মধ্যে একদিন সেনা সদর দপ্তর থেকে মেহদি টেলিফোনে জানালেন, আমাকে বাংলাদেশ রাইফেলসে (বিডিআর) পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানি আমলের ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এখন এই নামে সুপরিচিত। পাকিস্তানে বসেই শুনেছি ইপিআরের সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদানের কথা। ঢাকায় ২৫ মার্চের ক্র্যাক ডাউনের খবর ওয়্যারলেসে তাঁরাই অতি দ্রুত সীমান্ত এলাকার ঘাঁটিগুলোয় ছড়িয়ে দেন। এ খবরের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি সেনাসদস্যরা বিদ্রোহ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাও ইপিআরের সদস্যরা চারদিকে জানিয়ে দেন। তবে বিডিআরে পোস্টিংয়ের ব্যাপারটা আমার কাছে পছন্দসই লাগছিল না। তখনই শুনছিলাম, সীমান্ত অঞ্চলে চোরাচালানি খুব বেড়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রগুলোয় চোরাচালানি নিয়ে বড় বড় হেডিংয়ে খবর ছাপাতে হতো। পাকিস্তানি আর্মি অফিসারদের মধ্যে ইপিআরে পোস্টিং খুব লোভনীয় ছিল। এর কারণ, কিছু বাড়তি ভাতা পাওয়া ছাড়াও ছিল অবৈধ উপায়ে আয়ের সুযোগ। ব্যাপারটা কারোরই অজানা ছিল না। যেখানে অবৈধ বা অসৎ পথে পা বাড়ানোর আশঙ্কাই বেশি, তেমন কর্মস্থল থেকে দূরে থাকাটাই শ্রেয় মনে করে থাকি

আমি। আমার এক প্রবীণ আত্মীয় এ কথা শুনে বললেন, 'এমন কর্মস্থলই তো তোমার জন্য একটা পরীক্ষাক্ষেত্র হয়ে উঠবে।'

তাঁর কথায় মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেল। ১৯৭৩ সালের ১ নভেম্বর সকালে পিলখানায় অবস্থিত বিডিআর হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করলাম। পরের দিনই বিডিআরের প্রধান (তখন ডিরেক্টর) মেজর জেনারেল সি আর দত্ত বীর বিক্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে তিনি আমাকে নানা বিষয়ে উপদেশ-নির্দেশ দিলেন এবং জানালেন, আমাকে যশোরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বভার নিতে হবে (পরে এর সদর দপ্তর খুলনায় সরিয়ে নেওয়া হয় এবং খুলনা সেক্টর নামে পরিচিত হয়)। আরও বললেন, কালই যেন আমি যশোরে পৌঁছে যাই।

তাঁর ব্রিফিংয়ে অনেক উৎসাহ পেলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ রাইফেলসে সাড়ে তিন বছর

যশোর সেক্টরে

৩ নভেম্বর বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে সকাল ১০টায় যশোর বিমানবন্দরে পৌঁছালে বিডিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টারের কোয়ার্টার মাস্টার নায়েব সুবেদার মোকলেস আমাকে অভ্যর্থনা জানান। বিমান থেকেই দেখলাম, বিডিআরের ইউনিফরম পরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে; অদূরে একটি পুরোনো জিপ, উইন্ডশিল্ডের নিচে বড় বড় হরফে লেখা 'বাংলাদেশ রাইফেলস'। তখন যিনি সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি আমার অনেক জুনিয়র হলেও কোনো অজ্ঞাত কারণে বিমানবন্দরে আসেননি। যশোর বিমানবন্দরে এবার নিয়ে আমার তৃতীয়বার আসা। আমার শ্বশুরবাড়ি খুলনায় হওয়াতে আগে দুবার এখানে অর্থাৎ যশোরে নেমেই শহরের ভেতর দিয়ে সোজা খুলনায় চলে গেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় যশোর অঞ্চলে সংঘটিত যুদ্ধের অনেক ঘটনাই সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। বেনাপোল, বয়রা ও চৌগাছার যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির কথা এবং ঢাকা পতনের আগেই যশোর মুক্ত হওয়ার খবর শুনেছি। এবার সেখানেই এসে পৌঁছালাম। আর যে বাহিনী এসব যুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে, তারই একটি অংশের অধিনায়কত্ব করতে এসেছি আমি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারিনি বলে মনে যে আফসোস ছিল, তার কিছুটা হলেও লাঘব করার সুযোগ যেন পেয়েছি। মন উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরে উঠল।

নায়েব সুবেদার মোকলেস আমাকে একটি দোতলা বাড়িতে নিয়ে ওঠালেন। তিনি নিজের উদ্যোগে আমার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন

এবং বারবার আমাকে বলতে লাগলেন, খুবই সীমিত সময় ও সাধ্যের কারণে আমার জন্য ভালো ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে তিনি খুবই লজ্জিত। ঢাকা থেকেই বিডিআরের ইউনিফরম ও তাদের সাজসজ্জা-সহায়ক অন্যান্য উপকরণ নিয়ে এসেছিলাম।

পরের দিন সকালে সেক্টর হেডকোয়ার্টার অফিসে গেলাম। এই অফিসও একটা পুরোনো তিনতলা বাড়িতে। শুনলাম, পাকিস্তান আমল থেকে এখানেই অবস্থিত সেক্টর হেডকোয়ার্টার। আশপাশের আরও কিছু বাড়ি ও জায়গা নিয়ে সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অফিস ও সদস্যদের আবাসস্থল। এক কালের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। মোকলেস জানালেন, এখানে নাকি ৩৭৫টি নারকেলগাছও আছে।

কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত হলাম। সেক্টর কমান্ডার ছাড়া আর কোনো অফিসার নেই। নিচের র‍্যাংকের কেউ কেউ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অফিসের খুবই দৈন্যদশা। আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের স্বল্পতাও চোখে পড়ার মতো। গাড়ি আছে তিনটি। একটি টয়োটা জিপ, একটি সিজে ৫ জিপ ও একটি পিকআপ ভ্যান। টয়োটা জিপটি নাকি স্থানীয় কোনো নেতা নিয়ে যান। বিডিআরের লোকেরাই খোঁজখবর নিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পাকিস্তানিরা চলে যাওয়ার সময় অনেক কিছুই লুটপাট হয়ে গেছে। অস্ত্রাগারসহ কোয়ার্টার গার্ড একটু দূরে। অস্ত্রাগারে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা আছে। আছে কিছু মর্টারের শেল ও রকেট লাঞ্চারের গোলাও। স্বাধীনতার পর নানা জায়গা থেকে এগুলো এনে জমা করা হয়েছে। বাইরে পুকুরের পাড়ে অবিস্ফোরিত অবস্থায় পড়ে আছে কয়েকটি মর্টারের শেল।

কয়েক দিনের মধ্যে দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিলাম। আমার পূর্বসূরি মেজর সাহেব প্রায় দুই দিন পর আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বুঝলাম, তিনি ছেড়ে যেতে চান না। পরে শুনেছি, তিনি রাজনৈতিক তদবির করে ব্যর্থ হয়েছেন। বিডিআরের প্রধান আমাকে ব্রিফিংয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁর কার্যকলাপে তিনি সন্তুষ্ট নন। প্রসঙ্গত, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর কিছু সেনা অফিসার পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। ইনি তাঁদেরই একজন। সে সময় রাজনৈতিক তদবির খুব চলত। তাঁর কাছ থেকে ব্রিফিংয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে আমি সোজাসুজি কাজে নেমে গেলাম। যদিও বিডিআরের মূল দায়িত্ব বাইরের শত্রুর হাত থেকে সীমান্ত রক্ষা করা; কিন্তু এখনকার প্রধান কাজ হলো চোরাচালান রোধ ও অবৈধ যাতায়াত বন্ধ করা। এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই তিন উইং (বর্তমানে ব্যাটালিয়ন)। যেমন—খুলনায় ৫ উইং, যশোরে ৬

উইং এবং চুয়াডাঙ্গায় ১০ উইং। কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীর দক্ষিণ পারের চিলমারী বিওপি (বর্ডার আউট পোস্ট বা সীমান্ত চৌকি) থেকে বর্তমান বৃহত্তর কুষ্টিয়া, বৃহত্তর যশোর হয়ে বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবনের রায়মঙ্গল বিওপি পর্যন্ত বিস্তৃত সীমান্ত ছিল যশোর সেক্টরের অধীন। এর অন্তর্ভুক্ত তিনটি উইংয়ের কোনো উইং কমান্ডার ছিলেন না। বিডিআরের পদোন্নতিপ্রাপ্ত অফিসার (যাঁরা ডিএডি, অর্থাৎ ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নামে পরিচিত) ও সুবেদার মেজররা এসবের দায়িত্ব পালন করছিলেন। অফিসার-স্বল্পতার কারণে তখন সেনাবাহিনী থেকে ডেপুটেশনেও কাউকে পাঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। কয়েক দিনের মধ্যেই উইং হেডকোয়ার্টারগুলো পরিদর্শন শেষ করে সীমান্ত এলাকার বিওপিতে যেতে শুরু করলাম। উদ্দেশ্য, যত দ্রুত সম্ভব নিজ দায়িত্বভুক্ত নানা বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া।

প্রথমেই গেলাম সাতক্ষীরা এলাকায়। যেখানেই যাই, সেখানেই একদিকে যেমন মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হচ্ছি, অন্যদিকে বিডিআর সদস্যদের আন্তরিকতা ও আনুগত্যের অভিব্যক্তি দেখেও মুগ্ধ হচ্ছি। পাঁচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের নানা দিক সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেল। এরই মধ্যে সেনাবাহিনী থেকে মেজর র‍্যাংকের তিনজনের উইং কমান্ডার হিসেবে পোস্টিং হলো। তাঁরা মাত্রই পাকিস্তান থেকে ফেরত এসেছেন। খুলনার ৫ উইংয়ে মেজর শাহাদত হোসেন (পরে চাকরিচ্যুত), যশোরের ৬ উইংয়ে মেজর ফখরুদ্দিন (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত) এবং মেজর ফরিদ উদ্দিন (লে. কর্নেল হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত) চুয়াডাঙ্গা উইংয়ের উইং কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁরা যোগ দেওয়ায় আমার দায়িত্ব পালনের শক্তি বেশ বেড়ে গেল। তাঁদের নিয়ে চোরাচালানবিরোধী সর্বাত্মক তৎপরতা শুরু করে দিলাম। নির্দেশ দিলাম, বেশির ভাগ সময় তাঁরা যেন সীমান্ত এলাকায় থাকেন। আমি নিজেও যখন যেদিকে পারি, ছুটছি। এই ছোটাছুটির ব্যাপারটা আমাকে দারুণভাবে পেয়ে বসল। বাসায় চুপচাপ বসে থাকার ব্যাপারটা আমার কাছে অসহ্য লাগত।

ওদিকে পত্রপত্রিকায় চোরাচালানের খবর প্রতিদিনই ফলাও করে ছাপা হচ্ছে। যশোরের বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করে কিছু না কিছু সংবাদ দিতে লাগলেন। এর মধ্যে বেনাপোল ও সাতক্ষীরা এলাকায় বেশি চোরাচালান হচ্ছিল বলে খবর আসত। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম, চোরাচালান আমাকে বন্ধ করতেই হবে।

বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি—একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা

ডিসেম্বর মাসের সম্ভবত ২০ বা ২১ তারিখ (১৯৭৩) রাতে ওয়্যারলেসে জরুরি ম্যাসেজ এল, ২১ তারিখ সকালে উত্তরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও চোরাচালান রোধ করা বিষয়ে সভা হবে। তাতে উপস্থিত থাকতে হবে আমাকে। খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন। সংবাদটা পাওয়ায় আমাকে একধরনের আবেগমিশ্রিত চাঞ্চল্য পেয়ে বসল। অন্যদিকে আবার নার্ভাসও বোধ করতে লাগলাম। এই প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখব, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ও তাঁর কথা শুনতে পারব। এসব ভাবনা আমাকে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত ও আন্দোলিত করে তোলে।

যশোর থেকে নাটোর বহুদূরের রাস্তা, যার অনেক অংশই নাকি খারাপ। অথচ সকাল নয়টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছাতে হবে। সব দিক বিচার-বিবেচনা করে ভোর চারটায় রওনা হলাম। সঙ্গে ড্রাইভার ছাড়া বিডিআরের আরও দুজন সদস্য। কুষ্টিয়া পার হতেই সকাল হয়ে গেল। রেলের হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পাশে পাকশী ফেরি পার হয়ে নাটোরের কাছাকাছি এগোতেই দেখলাম, বহু বাস ও ট্রাকে করে লোকজন সেদিকেই যাচ্ছে। নাটোর শহরের ভেতর দিয়ে যেতে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর (জেআরবি) অফিস চোখে পড়ল। অনেকটা আগেই এসে গেছি। ঢুকতেই জেআরবির তরুণ ডেপুটি লিডার তাঁর অফিসে নিয়ে বসালেন। চা-নাশতা না খাইয়ে ছাড়লেন না। নাটোরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ব্রিটিশ শাসনামলের দিঘাপতিয়ার জমিদারের রাজবাড়ি। স্বাধীনতার পর এর নামকরণ করা হয় উত্তরা গণভবন। এখানে মাঝেমধ্যেই মন্ত্রিপরিষদের সভাসহ এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধু এসে থাকেন। রাস্তায় দেখলাম, শত শত লোক সেদিকেই যাচ্ছে। দূর থেকেই চোখে পড়ে বড় বড় পামগাছ। সামনের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই একটি পুল। পুল পার হয়ে বাঁ দিকের দালান, তার পরই আসল রাজপ্রাসাদ। এরই মধ্যে সভায় অংশগ্রহণকারী অনেকেই এসে গেছেন। কেউ এদিক-সেদিকে দাঁড়িয়ে আর কেউ কেউ মাঠে বসে। প্রধান হলঘরেও বহু লোক। কাউকে চিনি না। এমন পরিবেশে এই প্রথম। একজন খবর দিলেন, পাশের একটি রুমে আর্মির অফিসাররা আছেন। সেখানে ঢুকতেই কর্নেল শাফায়াত জামিল বীর বিক্রমের সঙ্গে দেখা। উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে সে হাত মেলাল। আমারই কোর্সমেট। দেশে ফিরে এই প্রথম তার সঙ্গে দেখা। এখন সে রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার। তার সঙ্গে রয়েছেন লে. কর্নেল মতিউর রহমান (পরে মেজর

জেনারেল। বর্তমানে প্রয়াত) ও আরেকজন (নাম মনে নেই)। দুজনই দুটি ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার। আরও কয়েকজন মেজর ও ক্যাপ্টেন। হেলিকপ্টারের শব্দে বাইরে চলে এলাম। বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা জানাতে হেলিকপ্টারের কাছে গেলেন স্থানীয় নেতারা, বিভাগ ও জেলার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। পুলিশের একটি দল গার্ড অব অনার দিল তাঁকে। তাঁর সঙ্গে এসেছেন কয়েকজন মন্ত্রী, বিডিআরের প্রধান মেজর জেনারেল সি আর দত্তসহ আরও কয়েকজন। আরও ভেতরে প্রধান হলঘর পেরিয়ে ডাইনিং হলে গিয়ে বসলাম। বিডিআরের আরও দুজন সেক্টর কমান্ডার এসেছেন। আরও বিডিআরের প্রধানের সঙ্গে সভাপতির চেয়ার থেকে বেশ দূরের কোনায় রাখা চেয়ার দখল করে বসলাম।

অল্পক্ষণ পরই বঙ্গবন্ধু ঢুকলেন এবং তাঁর নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন। সভার কাজ শুরু হলো। প্রথমেই সার্বিক আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে বলতে গিয়ে পুলিশের কর্মকর্তারা ব্রিফিং দিলেন। এলাকার কয়েকজন সাংসদও উপস্থিত ছিলেন। সবার শেষে চোরাচালান নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। সেক্টর কমান্ডাররা যাঁর যাঁর এলাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরলেন। আমি আমার এলাকা খুলনা-যশোর ও কুষ্টিয়ার অবস্থা তুলে ধরলাম। আমি মূলত চোরাচালান দমনের অসুবিধা, বাধাবিপত্তি এবং সদস্যসংখ্যা ও সরঞ্জাম-স্বল্পতার দিকটি তুলে ধরলাম। বিশেষ করে, তুলে ধরলাম সাতক্ষীরার সুন্দরবন অঞ্চলে জলযানের অভাবে অভিযান পরিচালনার অসুবিধাগুলো। দেখলাম, বঙ্গবন্ধু আমার কথাগুলো যেন বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনলেন। বললেন, ওই অঞ্চল নিয়েই তিনি বেশি চিন্তিত। তিনি বিডিআরের প্রধানকে কতগুলো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিলেন। আর অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থাকে অবিলম্বে কয়েকটি জলযান খুলনা বিডিআরের অধীনে ন্যস্ত করার নির্দেশ দিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে বললেন। প্রায় দুই ঘণ্টা সভা চলার পর বিরতি হলো। বিরতির পর বঙ্গবন্ধু আর্মি ও বিডিআরের অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হবেন বলে জানানো হলো। আমরা কয়েকজন একটি ছোট হলরুমে একত্র হলাম। আমরা ছাড়া আমাদের সঙ্গে আরও বসলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল ও রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ। বঙ্গবন্ধু ঢুকেই সবার সঙ্গে করমর্দন করলেন। আমি ও বিডিআরের আরেকজন ছাড়া সবাই তাঁর পরিচিত মনে হলো। কর্নেল শাফায়াত জামিলের সঙ্গে একটু বেশিক্ষণ কথা বললেন। প্রধান আসনে বসেই একজন একজন করে সবার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি একটু দূরে। খুবই নার্ভাস লাগছিল। কী বলব, ভেবে পাচ্ছিলাম

না। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও সাড়ে সাত কোটি লোকের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে আমার পরিচয় দিতে হচ্ছে। আমার পালা আসতেই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। খুব আবেগতাড়িত হয়েই কথা বলতে শুরু করলাম। বললাম, আমি একজন অপরিচিত অতি সাধারণ পর্যায়ের অফিসার, যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। বরং যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের পক্ষেই ছিলাম। এত দিন পাকিস্তানে আটক ছিলাম। এখানে বসে আছেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার, তাঁদের যে অবদান, তার তুলনায় আমি তো কিছুই করিনি। নিজের নামধাম পরিচয় দিতেই বলে উঠলেন, 'তোমার কথা আমি শুনেছি।' অল্প কিছু কথাই বলতে পারলাম। যে কথাগুলো বিশেষ করে বলেছি, তা হলো, 'স্বাধীনতাযুদ্ধে আমার কোনো অবদান নেই। পালিয়ে আসার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। প্রায় দুই বছর পাকিস্তান আর্মির হাতে সপরিবারে বন্দী ছিলাম। এখন দেশে এসেছি, সেই সেনাবাহিনীতে স্থান পেয়েছি, যে সেনাবাহিনী স্বাধীনতাযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে। এখন আমি দেশ ও সেনাবাহিনী গড়ার কাজে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করতে চাই।' আরও বললাম, 'দেশ স্বাধীন করার যুদ্ধে অসমর্থ হয়ে নিজেকে খুবই ছোট মনে করছি। এখন সামনের দিনগুলোতে সেই ঘাটতি পূরণ করতে চাই আন্তরিকতা, সততা ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে।' আরও কী বলেছিলাম মনে নেই। দেখি, বঙ্গবন্ধু চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'তোমার মতো অফিসারদেরই দেশের প্রয়োজন। তোমরাই দেশটাকে গড়তে পারবে।'

আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। সেদিনকার ঘটনা আমি কখনো ভুলিনি। আমার পরবর্তী কর্মময় জীবনে এ ঘটনা আমাকে বিশেষ প্রেরণা জোগাতে সাহায্য করেছে।

চোরাচালান দমনের কিছু ঘটনা

এবার দ্বিগুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে চোরাচালান দমনের কাজে নিজেকে ও আমার অধীনদের নিয়োজিত করলাম। সীমান্ত এলাকায় যতই ঘুরে বেড়াচ্ছি, ততই যেমন উৎসাহ বাড়ছে, তেমনি জানতে ও বুঝতে পারছি চোরাচালানিদের তৎপরতা কতটা গভীর ও বিস্তৃত। অল্প দিনের মধ্যেই আরও বুঝতে পারলাম, এদের প্রধান সহায়কই হচ্ছে বিডিআর, পুলিশ ও কাস্টমসের একশ্রেণীর অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী। নিকটস্থ কোনো বিওপি, থানা বা ফাঁড়ির কারও যোগসাজশ ছাড়া বড় ধরনের চোরাচালান সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আমি নিজেই মাঝেমধ্যে

গোপনে চোরাচালানি ধরতে বর্ডার পেট্রোলিং শুরু করলাম। অপূর্ব অভিজ্ঞতা হতে লাগল। কয়েকজন ভালো ও সৎ-প্রকৃতির সহকর্মীকে খুঁজে বের করলাম। এর মধ্যে ল্যান্স নায়েক মুজাফফর নামের একজনের কথা আমার এখনো মনে আছে। এইচএসসি পাস মুজাফফর একদিকে যেমন ধর্মপরায়ণ, অন্যদিকে তেমনি গোয়েন্দাবৃত্তির কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। চোরাচালানি ও বিডিআর সদস্যদের মধ্যে কোথায় কখন কীভাবে আঁতাত হয় এবং কোন পথে চোরাচালান সংঘটিত হয়—সবকিছুই তার নখদর্পণে। ছোট্ট একটি দল নিয়ে আমি বের হয়ে পড়তাম। সেই দলে মুজাফফরও থাকত। প্রথম পেট্রোলে বের হলাম নাভারন থেকে সাতক্ষীরা যাওয়ার পথে বাঘ আঁচড়ার দিকে। বাজার ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে কাঁচা রাস্তা ধরে কিছুটা যেতেই জিপ লুকিয়ে রেখে হেঁটে যেতে লাগলাম। যেতে যেতে সাইকেল চালিয়ে দলে দলে লোকজনকে আসতে দেখলাম। মুজাফফর বলল, এরা সবাই চোরাচালানের জিনিস নিয়ে আসছে। আমরা কিছু না বলায় দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। আরেকটু এগোতেই দেখি, আরও সাইকেল আরোহী আসছে। আমি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের ধরতে বললাম। কয়েকজনকে থামাতেই বাকিরা পালিয়ে গেল। এরা সাইকেলে ছোট ছোট ব্যাগ ঝুলিয়ে নানা কিসিমের জিনিসপত্র নিয়ে আসে ওপারের একটি বাজার থেকে। সেদিন ওই বাজারের হাটের দিন ছিল। তাদের তল্লাশি করে যা পাওয়া গেল তা হলো : দু-তিন কেজি কালিজিরা, কয়েকটি শাড়ি-লুঙ্গি-গামছা, কারও কাছে কয়েক গজ কাপড়, সাবান ইত্যাদি। তবে এরা আসল চোরাচালানি নয়। তখনকার দিনে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ পাট ও সার ওপারে এভাবে চলে যেত। একদিন গোপন সূত্রে সে এলাকাতেই পাট পাচারের খবর পেয়ে ঠিক করলাম, নিজেই যাব। সঙ্গে বড় একটা দল নিয়ে বের হলাম। গ্রামের একজনের বাড়িতে ওপারের হাটের দিন সকাল থেকেই গরুর গাড়ি বা মাথায় করে পাট এনে পাচারের জন্য জমা করে রাখা হয়। সন্ধ্যার পর ওই গ্রামের কাছে পৌঁছাতেই হঠাৎ কানে এল অনেক হুইসেলের শব্দ। প্রথমটায় মনে হয়েছিল, গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা বুঝি খেলনার বাঁশি বাজাচ্ছে। মুজাফফর বলল, 'স্যার, এ হলো অ্যালার্ট সিগন্যাল। আমরা যে এসেছি, সেটা ওরা টের পেয়ে গেছে।'

অন্যদিক দিয়ে এক নায়েব সুবেদারের নেতৃত্বে যে দলটি পাঠিয়েছি, তারা টার্গেট করা জায়গায় পৌঁছাতে সক্ষম হলেও সবাই পালিয়ে গেছে। প্রায় ১০০ মণ পাট পাওয়া গেল। ওই বাড়িতে স্থানীয় চাষিরা পাট রেখে যান। কয়েক শ মণ একত্র হলে এলাকারই কিছু দিনমজুর মাথায় করে ওপারের নির্দিষ্ট কোনো

জায়গায় গিয়ে দিয়ে আসেন। সব ব্যবস্থাই করে এখানকার একজন চোরাচালানি। যে বাড়িতে পাট জমা করা হয়, ওজন করা হয় ও টাকা পরিশোধ করা হয়, সেটা চোরাচালানির নিজের বাড়ি নয়। কয়েক দিনের জন্য অন্যের বাড়ি ভাড়া করে এ কাজ করে থাকে।

বিওপিগুলো পরিদর্শন করতে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতা হতে লাগল। সাধারণভাবে বিওপিতে গেলে কিছুই বোঝার উপায় নেই। মনে হবে সবই ঠিকঠাক, চমৎকার চলছে সবকিছু। বিওপির সদস্যরা দূর থেকে জিপ দেখেই বুঝতে পারে, হয় সেক্টর কমান্ডার, নয়তো উইং কমান্ডার আসছেন। ওই অবস্থায় তড়িঘড়ি করে তারা বিওপি স্ট্যান্ড টু (যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি) করবে। তারপর সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে একটি স্মার্ট স্যালুট ঠুকবে। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কোনো চোরাচালানি তৎপরতা আছে কি না বা এর মধ্যে কোনো কেস তারা ধরতে পেরেছে কি না, উত্তরে বিওপি কমান্ডার সগর্বে বলবে, এ এলাকায় কোনো স্মাগলিং হয় না বা সে আসার পর থেকে সব বন্ধ হয়ে গেছে।

একবার দর্শনার কাছে এক বিওপিতে গিয়ে সদস্যদের উপস্থিতির হিসাব নিলাম। বেশ কয়েকজন অনুপস্থিত। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, তারা ডিউটিতে গেছে।

কোথায় গেছে?

জানানো হলো, একটু দূরে একটা জায়গায় স্ট্যান্ডিং ডিউটিতে আছে তারা।

আমার সন্দেহ হলো। বললাম, চলো, আমি যাব।

হাবিলদার একটু ঘাবড়ে গেল। আধা মাইল দূরে ঝোপঝাড় পেরিয়ে সামনে এগোতেই দেখি, কাঁঠালগাছের নিচে ছড়ি হাতে বিডিআরের একজন সদস্য দাঁড়িয়ে। সে-ও আমাকে দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ডিউটি!

ঝটপট উত্তর, 'স্ট্যান্ডিং ডিউটি করছি।'

'স্ট্যান্ডিং ডিউটিতে কী করো?'

'লোকজনের আসা-যাওয়া চেক করি।'

'তাদের কী চেক করো? পাসপোর্ট, যাতায়াত পারমিট-জাতীয় কোনো কিছু?'

উত্তর নেই। বিওপি কমান্ডারকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে-ও চুপ। যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে স্ট্যান্ডিং ডিউটি করে, তার আশপাশে সব ঘাস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যেমনটা হয়ে থাকে গ্রামের হাটবাজারের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রতিদিনই

লোকজনের জমায়েত একটা নিত্যকার ঘটনা। লোকসমাগমের বহু চিহ্নও পাওয়া গেল। বিড়ির প্যাকেটের লেবেল, তার পোড়া অংশ, ম্যাচের কাঠি ও তার বাক্স ইত্যাদি বলে দেয়, এখানে দিন কি রাতের বেলা প্রতিদিনই লোকজনের সমাবেশ ঘটে থাকে। সবচেয়ে বড় আলামত, যে রাস্তা দিয়ে আমরা এখানে এসেছি, সেটা সোজাসুজি ভারতের অভ্যন্তরভাগে ঢুকে গেছে। পায়ে চলার রাস্তা হলেও সেটা বেশ চওড়া ও পরিষ্কার। ডান পাশে নিচু জমি একই রকম। এটা যে দুই দেশের আলাদা আলাদা অংশ, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। দুই পাশের, অর্থাৎ দুই দেশের লোকজন যে নিয়মিত এ পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করে, রাস্তার এ অবস্থাই সেটা বলে দেয়। এদের অনেকে একে অন্যের আত্মীয়ও বটে। বিডিআরের লোকজন তাদের এই আসা-যাওয়ার একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ আদায় করে নেয়। শুনেছি, ওপারেও এমনি একই ধরনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বিএসএফের (ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) লোকেরাও একইভাবে অর্থ আদায় করে থাকে। পরে তা বিওপির লোকজনের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে থাকে।

এর কিছুদিন পরই গেলাম বেনাপোলে। সঙ্গে উইং কমান্ডার মেজর ফখরুদ্দিনকে নিলাম। বললাম, তোমাকে নতুন কিছু দেখাব। আমি বেশির ভাগ সময়ই না জানিয়ে বিওপিতে যেতাম। যশোর থেকে রওনা হলে কোথায় যাব, বলে আসতাম না। জানলেই সেই এলাকা অ্যালার্ট হয়ে যেত। শুনেছি, (পরে বিশ্বাসও হলো) সেক্টর হেডকোয়ার্টারের কেউ না কেউ টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে দিত। যারা খবর দিত, তারা নাকি মাসিক হারে টাকা পেত।

সেদিন বেনাপোলের বিওপির একটু আগেই গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ডান দিকে সাদিপুর গ্রামের রাস্তা ধরে চললাম। তখন দুপুর বারোটার মতো। চায়ের দোকানের পাশে একজন সাধারণ (সিভিল) পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকা লোক আমাদের দেখামাত্রই লুকিয়ে পড়ল। কৌতূহলবশত কিছু লোক আমাদের ঘিরে ধরল। জিজ্ঞেস করলাম, এখান থেকে বর্ডারে যাওয়ার পথ কোন দিকে? কেউ কিছু বলতে চাইল না। অনেক আশ্বাসের পর একজন মুখ খুলল। বলল, 'আসেন দেখাই, যেখান দিয়ে বিনা পাসপোর্টে লোকজন হেঁটে ইন্ডিয়া যায় ও আসে।' প্রশ্ন করলাম, বিডিআরের কেউ থাকে?

বলল, 'হ্যাঁ, থাকে। চায়ের দোকানের পাশে একজন ছিল, দেখেন নাই! তিনিই তো ১০ টাকা করে মাথাপিছু নেন।' আরও বলল, 'এ জায়গাটা বিডিআরের, এর আরেকটু পশ্চিমে পুলিশের এবং এর পরেরটা কাস্টমসের।' লোকটা কথা বলতে বলতে আমাদের এবার ঠিক ক্রসিং পয়েন্টে নিয়ে থামাল।

এখানেও হাঁটার সুন্দর রাস্তা এপার থেকে ওপারে চলে গেছে। আছে গাছের ছায়া, একটু-আধটু ঝোপঝাড়। আমাদের দেখে ততক্ষণে দুদিকেরই চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সামনে গিয়ে এ রকমের আরও ক্রসিং নজরে পড়ল। ক্রসিংয়ের এমন ব্যবস্থা সারা বর্ডারেই রয়েছে। কড়াকড়ি করলে কিছুদিন বন্ধ থাকে, পরে আবার শুরু হয়ে যায়। জানি না, এত বছর পর কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না।

এ তো গেল বর্ডার ক্রসিংয়ের কথা। এই এলাকা স্মাগলিংয়ের (চোরাচালানের বদলে 'স্মাগলিং' শব্দটাই বেশি চলে) বড় একটা করিডর। আরও বহু চেষ্টা করে সামান্যই কমাতে পেরেছি। স্মাগলিংয়ে বহু লোক জড়িত থাকে। এদের অনেকেই রুই-কাতলা গোছের। এ ধরনেরই একটি স্মাগলিং কেস মেজর ফখরুদ্দিনের উইংয়ের পেট্রোল পার্টির হাতে ধরা পড়লে বেশ ঝক্কিঝামেলা পোহাতে হয়েছিল। অনেক রাতে বেনাপোল-নাভারন রাস্তায় একটি প্রাইভেট কার চেক করা হলে তার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয় গাড়ির পার্টস। সে সময় ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে গাড়ির পার্টস আসত। সঙ্গের তিনজনকে নিয়ে সেই গাড়িটি বেনাপোল কোম্পানি হেডকোয়ার্টারে নেওয়ার পথে শার্শা থানার ওসি পুলিশের সাহায্যে বিডিআরের লোকদের কাছ থেকে গাড়িটি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যান। মেজর ফখরুদ্দিন খবর পেয়ে যশোর থেকে বিডিআর সদস্যদের নিয়ে তা আবার ছিনিয়ে নিয়ে আসেন। খুলনার এক রাজনৈতিক নেতার দক্ষিণহস্ত ছিলেন ওসি নাসের। জানা গেল, এই ওসির সহায়তায় সারা বছরই স্মাগলিং করে আসছে একটি দল। আমাদের চাপাচাপিতে এ ঘটনা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হয়। ওসিকে বদলি করা হয়। পাশাপাশি স্মাগলিং কেস চলতে থাকে। পরে ওই ওসি চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন।

জানুয়ারির (১৯৭৪) প্রথম সপ্তাহ, শনিবার বিকেলে বাসায় বসে আছি, মনটা ছটফট করছে। কোথাও বের হওয়ার কথা ভাবছি। ঠিক করতে পারছিলাম না কোন দিকে যাব—ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা নাকি বেনাপোল এলাকায় যাব। সচরাচর কোনো গোপন সংবাদ বা অভিযোগের ভিত্তিতে বের হতাম। আপাতত তেমন কোনো খবরও নেই। তবু বের হওয়ার প্রবল ইচ্ছা হলো। সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আমার সঙ্গে যারা বের হয়, তাদের খবর দিয়ে বললাম, পুরোনো জিপটা নিয়ে আসো আর ড্রাইভার যেন সিভিল ড্রেসে থাকে। সন্ধ্যার সময় বের হয়ে পড়লাম। যাত্রা শুরু করার আগে জিপের সামনের অংশে, যেখানে বিডিআর লেখা থাকে, সেটা গোলানো মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিতে বললাম, নিচে ইউনিফরম পরা থাকলেও চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে নিলাম, যাতে

সহজেই কেউ চিনতে না পারে। বের হয়ে প্রথমে চুয়াডাঙ্গার দিকে কিছুদূর যাওয়ার পর ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার পথে বাঁ দিকে ঘুরে বেনাপোলের দিকে রওনা হলাম। তখনো ঠিক করিনি কোথায় যাব। ধোঁকা দেওয়ায় কাজ হলো। আমার ওপর যে নজরদারি হয়, প্রথমে সেটা বিশ্বাস করতাম না। পরে টের পেতে লাগলাম, স্মাগলাররা যথেষ্ট সংঘবদ্ধ এবং বিডিআর হেডকোয়ার্টারে তাদের সাহায্যকারী রয়েছে। আমার স্ত্রী বলতেন, যখনই আমি বের হই, তখনই টেলিফোন আসে, আমার খোঁজ নেওয়া হয়, জানতে চাওয়া হয়, আমি কোথায় গেছি, কখন ফিরব ইত্যাদি। নাভারন পৌঁছে সোজা বেনাপোলে না গিয়ে ড্রাইভারকে বাঁ দিকে সাতক্ষীরা অভিমুখে যেতে বললাম। রাস্তা ফাঁকা। কোনো যানবাহন নেই। সাতক্ষীরা যখন পার হলাম, তখন রাত ১১টা। আরেকটু চলার পর ডান দিকে রাস্তা চলে গেছে সীমান্তের দিকে কালিন্দী নদীর পাড় পর্যন্ত। এখানেই মোড় নিলাম। সর্বক্ষণই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে চলছি। কয়েক মাইল পরই থানা শহর দেবহাটা। সেখানে আছে বিডিআরের বিওপি। মাইল খানেক আগেই জিপ ছেড়ে হেঁটে চললাম। নদীর পাড়ে পৌঁছাতেই নজরে পড়ল ওপার থেকে এপারের দিকে টর্চ থেকে বারবার আলো ছোড়া হচ্ছে। মনে হলো, এপার থেকেও কেউ একইভাবে আলো জ্বালিয়ে পাল্টা উত্তর দিচ্ছে। নদীর পাড়েই বিওপি। তার সামনে দিয়ে কাঁচা রাস্তা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। কিছুদূর এগোতেই টর্চ হাতে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। বুঝলাম, সে-ই টর্চ জ্বালিয়ে প্রতি-উত্তর দিচ্ছিল। মুজাফফর ওকে থামিয়ে আমার কাছে নিয়ে এল। আমার পরিচয় জানতে পেরে ঘাবড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, এত রাতে একা বিওপির বাইরে কেন এবং কী করছিল সে। কোনো গ্রহণযোগ্য উত্তর নেই। টর্চ দিয়ে সিগন্যাল দেওয়ার কথা অস্বীকার করল।

এবার বিওপির ভেতরে ঢুকলাম। কয়েকজন অনুপস্থিত। হঠাৎ কেন জানি ইচ্ছা জাগল নদীপথে পেট্রোলিংয়ে যাওয়ার। বিওপিতে সাধারণত নৌকা ও স্পিডবোট থাকে। নৌকাই নামাতে বললাম। বিওপি কমান্ডারসহ আরও সাতজনকে সঙ্গে নিলাম। সব মিলিয়ে আরও ১০ জন। কালিন্দী নদীর পশ্চিম পাড় ঘেঁষে ভারতীয়রা নৌকা ও মোটর লঞ্চে চলাচল করতে পারে। এ পাড় দিয়ে সাধারণের চলাচলের অনুমতি নেই। আরও পূর্ব পাড় ঘেঁষে চলছি। নৌকা চলতে শুরু করলেই টের পেলাম শীত কাকে বলে! এই নদীর দুই পাড় দিয়ে যে প্রচুর স্মাগলিং হয়, এ কথা প্রায়ই শুনে আসছিলাম। এবার সেটা নিজের চোখে দেখার সুযোগ নিতে যাচ্ছি পুরোপুরি একটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে। নৌকা চলছে। এই নদীর পাড়ে অনেক বিওপি, দু-চার মাইল

পরপরই। প্রতি বিওপিতে ওঠা-নামার জন্য কাঠের তৈরি জেটি রয়েছে। কোনো জেটির সামনে এলেই মাঝি জানতে চায়, সে থামবে কি না! কিন্তু আমরা না থেমে আরও এগিয়ে যাচ্ছি। এর মধ্যে বোধ হয় চার-পাঁচটা বিওপি পার হয়ে এসেছি। এ সময় দূর থেকে আজানের ধ্বনি কানে ভেসে এল। ভোরের আজানের ধ্বনি।

চলতে চলতে সামনে একটা জেটি নজরে পড়লে মাঝিকে সেখানেই থামতে বললাম। জেটি বেয়ে উঠলাম নদীর পাড়ে। প্রাকৃতিক ডাকের চাপ কমাতে একটু দূরে ঝোপের পাশে গেলাম। দেখলাম, নদীর পাড়ে উঁচু বাঁধ। তার ওপর দিয়েই চলেছি। হঠাৎ একটা চাদর জড়ানো লোক পাশ দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হতেই মুজাফফর তাকে ধরে ফেলল। জিজ্ঞেস করলে বলে ফেলল, সে বিওপির লোক।

কেন সে শীতের এত সকালে নদীর পাড়ে—এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সে ইতস্তত করতে লাগল। মনে সন্দেহ পাকা হয়ে গেল, কিছু একটা ঘটছে। ওকে সঙ্গে নিয়েই চললাম। একটু এগোতেই মুজাফফর বলে উঠল, 'স্যার, স্মাগলারের দল আসছে।'

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ১০-১২ জনের একটা দল একেবারে আমাদের সামনেই পড়ে গেল। ওরাও কিছু বোঝার আগেই আমার পক্ষের লোকজন ওদের কয়েকজনকে ধরে ফেলল। শীতের দিনেও খালি গায়ে ওদের শরীর ঘামে ভিজে জবজবে। প্রত্যেকের কাঁধে বাঁশের ভার। সামনে চেয়ে দেখি আরেকটি দল আসছে। এই দলে লোকজনের সংখ্যা আরেকটু বেশি। আমার হতবাক হওয়ার পালা। আমার সঙ্গে থাকা পেট্রোলের লোকদের ওদের ঘিরে ফেলতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালিয়ে গেল। কয়েকজনকে ধরা গেল। এদের নেতাগোছের একজনকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলে ফেলল, সামনে আরও অনেক লোক আছে এবং নৌকায় মাল বোঝাই করা হচ্ছে। যারা ধরা পড়ল, তাদের পাহারা দিতে দুজনকে রেখে পেট্রোলের বাকিদের নিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখি সে এক এলাহি কাণ্ড! ৫০-৬০ জন লোকের একটা দল। মাথায় করে তারা মালপত্র নিয়ে আসছে। আমাদের দেখামাত্রই সবকিছু ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালাল। জায়গাটা ছোট-বড় গাছে ঘেরা। কিছু লোক এদিক-ওদিকে লুকিয়ে থাকল আর কেউ কেউ নদীর দিকে যেতে লাগল। নদীতে তখন ভাটা চলছে। পাড় থেকে পানি প্রায় ২০ ফুট নিচে। তাকিয়ে দেখি চার-পাঁচটা নৌকায় ১০-১২ জন লোক মাল বোঝাই করছে। কিন্তু সংখ্যায় আরও ওদের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। কোন দিক

সামলাব! ভয় দেখানোর জন্য তাই পিস্তল বের করে কয়েকটা গুলি করলাম ওদের। গুলির শব্দ পেয়ে নৌকাগুলো তক্ষুনি ওপারে চলে গেল। কয়েকজন নদীতে ঝাঁপ দিল। গাছগাছড়ার আড়ালে স্তূপ করা ছিল নানা ধরনের জিনিসপত্র। স্মাগলারদের বেশির ভাগই তখন পালিয়ে গেছে। কয়েকজনকে ঝোপঝাড় থেকে বের করে আনা হলো। সর্বমোট ৩১ জনকে সম্ভব হলো পাকড়াও করা। এদের মধ্যে ১০-১২ বছরের একটি ছেলেও ছিল। তাকে ছেড়ে দিলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা গেল, এদের বেশির ভাগই মজুরশ্রেণীর। বেশি মজুরি দিয়ে তাদের চোরাচালানের কাজে আনা হয়। দুজন আসল স্মাগলারও ধরা হলো। আটক করা জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল মুরগি, ডিম, মাছ, পাট, দুধ ইত্যাদি। আমাদের বিওপির দূরত্ব ছিল এখান থেকে মাত্র পাঁচ-ছয় শ গজ। বিওপির লোকজনের যোগসাজশ ছাড়া কিংবা তাদের অজ্ঞাতসারে প্রায় শতাধিক লোকের পক্ষে কি মালপত্র নৌকায় উঠিয়ে এপার থেকে ওপারে পাচার করা সম্ভব? বিওপির কমান্ডারের উত্তর, সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। আমাদের সামনে দিয়েই নদীর পশ্চিম পাড় ঘেঁষে কয়েকটি লঞ্চ গেল। সেগুলো মালপত্র ও লোকজনে ঠাসা। সকালবেলার দিকেই এসব লঞ্চে বাংলাদেশি মালপত্র ওঠে। এপারে লঞ্চ না থামলেও স্মাগলারদের নৌকা এপার থেকে জিনিসপত্র নিয়ে ওপারের লঞ্চে উঠিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজন জানাল, এমনটা বছর ধরেই চলে। বিডিআর ও বিএসএফের সদস্যরা এসব কিছু না দেখার ভান করে থাকে। অবশ্য এর বিনিময়ে তারা পেয়ে থাকে ভালো পরিমাণের অবৈধ দক্ষিণা। নদীর পাড়ে উঠেই বিডিআরের যে লোকটি পেয়েছিলাম, সে ওই দিনের টাকাটা সংগ্রহ করে বিওপিতে দিতে যাচ্ছিল।

যতই সীমান্ত এলাকায় যাচ্ছি আর চোরাচালানের বিষয়ে নানা ঘটনা জানতে পারছি, ততই উৎসাহ বাড়ছে। বুঝতে পারছি, বিডিআরের কারও যোগসাজশ ও সহযোগিতা ছাড়া স্মাগলারদের পক্ষে স্মাগলিং করা কঠিন। এ-ও বুঝতে পারলাম, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কোনো না কোনোভাবে চোরাচালানিদের সঙ্গে যুক্ত। এর থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে হলে দরকার অফিসারদের কঠোর ও সুকৌশল তদারকি এবং অভিযুক্তদের ত্বরিত কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা। সবাইকে জানিয়ে দিলাম, আমি ও উইং কমান্ডাররা অভ্যন্তরভাগে অর্থাৎ বর্ডার এলাকার ভেতরের দিকে পেট্রোলিং করব। আমাদের হাতে যদি চোরাচালানি বা মাল ধরা পড়ে, তাহলে নিকটস্থ বিওপি কমান্ডারদের বিরুদ্ধে চোরাচালান দমনে ব্যর্থতা ও চোরাচালানিদের সঙ্গে তাদের যোগসাজশের অভিযোগ আনা হবে। কোন বিওপি এলাকা দিয়ে

স্মাগলিং চলছে এবং কোন বিওপি কমান্ডার বা কোম্পানি কমান্ডার স্মাগলারদের সহযোগিতা করছে, এসব তথ্য গোপনে সংগ্রহ করা এবং সে অনুযায়ী ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর নির্ভর করে একজন সেক্টর বা উইং কমান্ডারের স্মাগলিং দমনের সার্বিক সফলতা। বুঝতে পারলাম, খবর সংগ্রহ করা কঠিন নয়। স্মাগলিংয়ের তৎপরতা বিওপির আশপাশের গ্রামবাসীর অজানা থাকে না। তারা ভয়ে কিছু বলতে চায় না। কালবিলম্ব না করে সীমান্ত এলাকায় গণসংযোগ শুরু করলাম। কোনো বিওপিতে ঢোকার আগে কাছের স্কুল বা বাজারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে স্মাগলিং সম্বন্ধে জানতে চাইলে সবাই বলে থাকে, এদিকে কোনো স্মাগলিং হয় না। বিওপির লোকেরা খুব ভালো এবং এসব ব্যাপারে তারা খুবই তৎপর ইত্যাদি। ফলে সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন। অথচ দেশের প্রতি সবার দায়িত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার কথা বললে স্মাগলিংয়ের কুফল ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের বুঝিয়ে এসবের প্রতিরোধে অনুপ্রেরণা ও সাহস দিলে সঠিক তথ্য দিতে কেউ না কেউ এগিয়ে আসে। স্মাগলিং সম্পর্কে আমাকে চিঠি লিখে, টেলিফোন করে বা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলে আমার বাসায় গিয়ে জানাতে তাদের উৎসাহ দিতে লাগলাম। টেলিফোন বা যাতায়াতের খরচ দেওয়ারও আশ্বাস দিলাম তাদের। অচিরেই আমার এই প্রয়াসের দারুণ ফল পেতে লাগলাম। অপকর্মগত নানা ঘটনার কথা আমার কাছে আসতে শুরু করল। এলাকাবাসীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বড় ধরনের কয়েকটি অপকর্মের ঘটনা ধরা পড়ল আমার হাতে। এসব অপকর্মের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে বিডিআরের কয়েকজন সদস্য ছাড়াও সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে আসা একজন উইং কমান্ডারও ছিলেন, পরে যিনি চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন।

এর মধ্যে একদিন এক যুবকের টেলিফোনে দেওয়া খবর পেয়ে এক রাতে বের হয়ে পড়লাম। সে জানিয়েছিল, বিওপির সামনে নৌকায় চোরাচালানের মাল নামানো হয় এবং সেখান থেকে সেই মাল খুলনায় যায়। এবারকার ঘটনাস্থলও সাতক্ষীরার কালিন্দী নদীর তীরের আরেকটি এলাকা। প্রসঙ্গত, এ এলাকাই তখন চোরাচালানির জন্য কুখ্যাত হয়ে পড়েছিল। গাড়ি রেখে হেঁটে সকাল হওয়ার আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছালাম। গ্রাম ছাড়িয়ে নদীর পাড় পর্যন্ত অনেক দূর খোলা এলাকা। প্রথমে কৃষিজমি, তারপর নদী পর্যন্ত অনাবাদি জমি—কোথাও পানি, কোথাও শুকনো। কিন্তু দূর থেকেই নদীর পাড় পর্যন্ত হাঁটা রাস্তা নজরে পড়ে। এ রকম একটা রাস্তা ধরে পাড়ে পৌঁছে যা দেখলাম, তাতে চক্ষু স্থির হওয়ার উপক্রম হলো। গত রাতেও যে এখানে নৌকা ভিড়েছে, বহু লোক ওঠা-নামা করেছে, মিলল তার সুস্পষ্ট আলামতের

পর আলামত। সে সময় সমস্ত সীমান্ত পথ দিয়েই ভারত থেকে বিড়িপাতা আসত (সরকার পরে বিড়ি তৈরি করা নিষিদ্ধ করে দেয়)। দেখলাম, নৌকা থেকে নামানোর সময় উড়ে পড়া বিড়িপাতার অংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেকটা জায়গাজুড়ে। কাদামাটির ওপর পায়ের ছাপ। এ নদীপথে আমাদের দেশি কোনো নৌকা চলাচল করে না। এখান থেকে বিওপি দেখা যায়। বিওপি কমান্ডারকে আনতে লোক পাঠালাম। কিন্তু তিনি নেই। শুনলাম, আজ সকালেই তিনি ছুটিতে গেছেন। তবে বেশি দূর যাননি। দেবহাটা থেকে তিনি রিকশায় যাবেন সাতক্ষীরায়। দেবহাটা বিওপিতে ওয়্যারলেসে খবর পাঠানো হলো বিওপি কমান্ডার যেন বিওপিতে দ্রুত ফিরে আসেন। যশোর থেকে রওনা হওয়ার সময় উইং কমান্ডারকে বলে এসেছিলাম, তিনি যেন সকালবেলায়ই দেবহাটায় পৌঁছে যান। ঘটনাস্থল থেকে বিওপিতে গেলাম এবং বিওপির সব সদস্যকে প্রত্যাহার করার এবং তাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলাম। বিওপির বাইরে তাদের জড়ো করা হলো। আমার সঙ্গের লোকজন বিওপির দায়িত্ব বুঝে নিল। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই প্রথমে দুজন স্বীকার করল, দু-তিন দিন ধরেই ওপার থেকে মালামাল আসছে। বিওপি কমান্ডার আরেকজনকে নিয়ে মাল খালাস করার কাজের তদারক করেছে। তবে তাদের কেউই কোনো টাকা পায়নি ইত্যাদি।

দুজন স্বীকার করার পর অন্যরাও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে উইং কমান্ডারও এসে গেলেন। তিনিই বিওপি কমান্ডারকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হলো। কিন্তু তিনি সবকিছু অস্বীকার করলেন, এমনকি একপর্যায়ে তিনি পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে কথা বলতে রাজি আছেন বলে বললেন, এসব ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু যখন তাঁর সহকর্মী কয়েকজনকে সামনাসামনি করা হলো, আর যায় কোথায়! আমার পা জড়িয়ে ধরে শুরু করে দিলেন কান্নাকাটি। শেষ পর্যন্ত উইং কমান্ডারকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে আমি গ্রামের দিকে চলে গেলাম। ততক্ষণে বিওপির ঘটনা পুরো এলাকায় জানাজানি হয়ে গেছে। অবস্থাশালী এক পরিবারের প্রবীণ ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে আমাদের বসার অনুরোধ জানিয়ে বললেন, লোকজন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। দেখলাম, তাঁর বাড়ির সামনে বহু লোক জমায়েত হয়েছে। প্রবীণ সেই ভদ্রলোক আমাকে জানালেন, তিনি তাঁর জীবনে কখনো এই এলাকায় কোনো অফিসারকে আসতে দেখেননি। পাকিস্তানি আমল থেকেই তাঁরা দেখে আসছেন চোরাচালানিদের দৌরাত্ম্য। চোরাচালানি ও বিওপির লোকদের সঙ্গে সব সময়ই সখ্য থাকে।

তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার সুযোগ নেই। এসব বলার পর তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করলেন যে, দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। আমাদের দেশি অফিসাররা এখন যদি ভালো নেতৃত্ব দেন, তাহলে চোরাচালান বন্ধ হবে। সমবেত লোকজন অনেক অভিযোগ শোনালেন। তাঁদের বেশির ভাগ অভিযোগই বিওপির লোকদের বিরুদ্ধে। একটি বিষয় বোঝা গেল, স্থানীয় লোকজন স্মাগলিংয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে না। তাদের বেশির ভাগই এসে থাকে বাইরে থেকে। অবশ্য এলাকার দু-একজনের সঙ্গে তাদের গোপন সম্পর্ক থাকে। নদীপাড় থেকে সাতক্ষীরা-কালীগঞ্জ সড়ক পর্যন্ত মাথায় করে ২০-৩০ জনের দল বিড়িপাতা গাড়িতে বা নৌকায় তুলে দেয়। যারা কুলির কাজ করে, তারাও দূরের লোক।

যা-ই হোক, গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে ও তাদের চোরাচালানবিরোধী মনোভাব দেখে খুবই উৎসাহ বোধ করলাম। ওই দিন খুব আগ্রহভরে খুঁজছিলাম সেই যুবককে, যে টেলিফোনে আমাকে এখানকার খবরটা জানিয়েছিল। পাইনি, সম্ভবত সে সামনে আসতে বা গোপনেও দেখা করতে সাহস করেনি বোধগম্য কারণেই।

ওপরের ঘটনার আগে অর্থাৎ আমার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিকের অন্য ধরনের আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সম্ভবত সাতক্ষীরা অঞ্চলে সেটা ছিল আমার প্রথম দিককার সফরগুলোর একটি। রাস্তার পাশেই কলারোয়া বিওপি। এখানে বিওপি ছাড়াও ওই এলাকার কয়েকটি বিওপি নিয়ে গঠিত কোম্পানিরও অবস্থান, যার কমান্ডার ছিলেন সুবেদার মতিউর রহমান। পরিদর্শনের পর মুজাফফর (আমার নিত্য সফরসঙ্গী) বলল, 'স্যার, ফেরার পথে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা এখানে করলে ভালো হয়। অন্য কোথাও ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না।' আমি রাজি হয়ে সুবেদার সাহেবকে সুস্পষ্ট করেই বললাম, আমার জন্য কোনো বিশেষ ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করবেন না, যা সবার জন্য রান্না হয়, তা-ই খাব। কয়েকটি বিওপি পরিদর্শন শেষে বিকেল প্রায় চারটায় কলারোয়ায় পৌঁছলাম। সেদিন আমার সফরসঙ্গী হয়েছিলেন ঢাকার এক দৈনিকের যশোরের সংবাদদাতা (নাম মনে নেই)। হাত-মুখ ধুয়ে একটি রুমে ঢুকলাম। কিন্তু খাবারের বহর দেখে রাগ সামলাতে পারলাম না। বড় টেবিলভর্তি নানা ধরনের সব খাবার। আমি বলার পরও কেন এত খাবারের আয়োজন করা হলো, খাবারে কত খরচ হয়েছে এবং তা কে দেবে—এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর সুবেদারের কাছে নেই। খাব না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম। সুবেদার ছুটে এলেন গাড়ির সামনে। বললেন, 'স্যার,

আমাকে মেরে ফেলেন, যত খুশি শাস্তি দেন, তবে খাবারের সঙ্গে রাগ করবেন না। না খেয়ে যাবেন না।' তাঁর কাকুতি-মিনতি ভরা শেষ কথাটা ফেলতে পারলাম না। খেতে বসলাম। পোলাও, কোরমা থেকে শুরু করে কয়েক ধরনের মাছ, মুরগি, গরু ও খাসির মাংস—কোনো কিছুই বাদ যায়নি। পাকিস্তানিদের প্রসঙ্গ টেনে এবার চতুর সুবেদার তোষামোদ মেশানো স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, 'স্যার, আপনারা তো আমাদের আপন লোক। আপনাদের একটু খেদমত করতে দেবেন না! আপনি আমাদের সেক্টর কমান্ডার। পাকিস্তানি আমলে পশ্চিমা সেক্টর কমান্ডার বছরে একবার এখানে আসত। আসার অনেক আগেই পেতাম তিনি কী কী খাবেন, তার তালিকা। সঙ্গে আসত বেগম সাহেবা ও আরও অনেকে। এখানে শামিয়ানা টানিয়ে তাঁদের বসার ব্যবস্থা করা হতো। এসেই প্রথমে চলে যেত শিকার করতে।'

প্রশ্ন করলাম, খরচ দিত কে? জানালেন, তাঁরা নাকি চাঁদা তুলেই এই খরচ মেটাতেন। আসলে তা নয়। বিওপির কেউ চাঁদা দেয় না; চাঁদা দেওয়ার অনেক লোক আছে, কেউ স্বেচ্ছায় বা অতি উৎসাহে আর কেউ বা বাধ্য হয়ে। প্রধানত এলাকার যারা চোরাচালানি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, তাদের একদল স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে। কাছের হাটবাজারের দোকানদার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বর এবং আশপাশের অবস্থাশালীরা হয় নগদ টাকা, না হয় মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদির জোগান দিয়ে সাহায্য করতেন। এসবই জেনেছি অবশ্য পরে।

বিওপিতে খাওয়া ও থাকা নিয়ে অনেকবার অনেক ধরনের সমস্যায় পড়েছি। বর্ডার পরিদর্শনে গেলে কোথাও না কোথাও খেতে হবে। থাকতে হবে। সেখানে তো আর রেস্ট হাউস বা গেস্ট হাউস থাকে না। অজপাড়াগাঁয়ে অবস্থিত বিওপিতে রাত যাপনের অভিজ্ঞতা অপূর্ব। ভোলার মতো নয়। তেমনি খাবারও। তবে কখনো কখনো এসব কিছু বিরক্তি বা ক্রোধেরও উদ্রেক করেছে। ওপরে এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করেছি।

প্রথম দিকের কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে ঠিক করলাম, বিওপিতে খেলে একটা নির্দিষ্ট হারে টাকা পরিশোধ করব। চিঠি লিখে সব হেডকোয়ার্টার ও বিওপিতে নির্দেশ পাঠালাম যে কোনো অফিসার খেলে বা থাকলে খাবারের টাকা দিতে তিনি বাধ্য থাকবেন এবং একটি রেজিস্টারে তা লিখে রাখতে হবে। বিশেষ মানের খাবার পাকানো যাবে না। সাধারণ খাবারের ব্যবস্থ,া অর্থাৎ যা বিওপিতে রান্না হবে, তা-ই তাকে খেতে হবে। কিছুদিন তা-ই চলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই নির্দেশ মানানো কঠিন হয়ে পড়ল। টের পেলাম, কোনো কোনো

বিওপিতে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা বেশ সংবেদনশীল হয়ে পড়ছে। বিওপিতে যাওয়া, খাওয়া ও থাকার ব্যাপার অনেকটা গ্রামের কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়ানোর মতো। আত্মীয়টি যত গরিবই হন না কেন, প্রাণ ঢেলে আপনার আতিথেয়তা করবেন। বিডিআরে কিছু লোক আছে, তারা অসৎ পথে চললেও তাদের মধ্যে ভালো লোকও আছে। সে প্রমাণও আমি পেয়েছি। পরিদর্শনের পর হয়তো দুপুরে খাবার খেতে হবে বা রাত হলে আমাকে থাকতে হবে—এমন কথা শোনানোর পর সারা বিওপিতে শুরু হয়ে যায় রীতিমতো ছুটোছুটি। কেউ ছুটে যায় বাজারে মুরগি, গোশত বা মাছ আনতে, কেউ যায় আশপাশের কোনো অবস্থাশালীর বাড়ি থেকে গ্লাস-প্লেট-চামচ ইত্যাদি আনার জন্য। মানা করলেও শুনবে না। আর এ রকম পরিস্থিতিতে ধমকাধমকি করাও বেমানান। যতই বলা হোক, অত কিছু করতে যেয়ো না, কে শোনে কার কথা! এমন পরিবেশে শক্ত কথা শোনানো সত্যিই কঠিন। মুজাফফর অনেক সময় বেশ কাজে এসেছে। খাব শুনলেই সে ভেতরে গিয়ে সাবধান করে দিত, আমি রাগ করব। আড়ালে এমনও দেখেছি, মুরগি জবাই করতে যাচ্ছে, সে তখন দৌড়ে গিয়ে হাত থেকে মুরগি ছিনিয়ে নিয়েছে। পরে বিরক্ত হয়ে বিওপি পরিদর্শনে বের হলে টিফিন ক্যারিয়ারে বাসা থেকে খাবার সঙ্গে নিতাম। গ্রামবাংলার আতিথেয়তার পুরো নিদর্শন পাওয়া যেত একটি বিওপিতে। এতে কখনো আন্তরিকতার অভাব দেখিনি। এরা বছরের পর বছর থাকে পাড়াগাঁয়ের লোকদের মধ্যে। আসলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা ঘটনাচক্রে এত বড় বাহিনীর কেউ কেউ বিপথগামী হয়, যা অস্বাভাবিক নয়। তবে এ জন্য পুরো বাহিনীকে দোষারোপ করি না।

বিওপিতে বিডিআরের লোকদের সঙ্গে রাত কাটানো ছিল আরেক মধুর অভিজ্ঞতা। ব্যারাকের পাশের একটি রুমে থাকার ব্যবস্থা করা হতো। কখনো আমার নিজস্ব বিছানা না নিয়ে গেলে তারও সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে যেত। পাতা হতো সদ্য ধোয়া বিছানার চাদর ও বালিশ, যার কভারের ওপর থাকত হাতের অনুপম সুচিকর্ম, টানানো হতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মশারি, দেওয়া হতো তালপাতার পাখা, যাতে রঙের ছোঁয়া বা কিছু হাতের কাজ থাকত। যত দূর সম্ভব আরামদায়ক ব্যবস্থা করা হতো। বোঝা যেত, এসব কিছু আশপাশের কারও বাড়ি থেকে আনা হয়েছে। সন্ধ্যার পর গ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ কী চমৎকার না লাগত! কোনো কোনো দিন মুক্তিযুদ্ধে কে কোথায় যুদ্ধ করেছে, সেসব ঘটনা শুনতে বসে যেতাম। চলত অনেক রাত পর্যন্ত। কেউ কেউ তাদের কোনো সহকর্মীর শহীদ হওয়ার ঘটনা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ত।

জানতে চেয়েছি, স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস লেখার উপাদান জোগাড় করতে কেউ কি কখনো এদের কারও কাছে এসেছেন! কেউ 'হ্যাঁ' বলেনি। নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল দেখার যে অপূর্ব সুযোগ হয়েছে, তা ছিল আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় একটা ব্যাপার।

দেশের বিখ্যাত বনভূমি সুন্দরবন দেখার ও সেখানে অবস্থান করাও ছিল আমার জন্য খুবই মধুর একটা অভিজ্ঞতা। সাতক্ষীরার শেষ স্থল বিওপি ছিল কৈখালী। তারপর শুরু হয় বিস্তীর্ণ জলভূমি বেষ্টিত সুন্দরবন। ওই এলাকা পরিদর্শন বা পেট্রোলে বের হলে দু-এক দিনের মধ্যে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। বিডিআরের ছোট লঞ্চগুলোয় ওই সব জায়গায় যেতে হতো অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই। শীতকালে যাওয়া সম্ভব হলেও বর্ষাকালে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ত। বনের ভেতরে ঢোকা গেলেও বেশি দূর যাওয়া যেত না। সে সময় নৌপথে স্মাগলিংয়ের খবর আসত, কিন্তু তেমন কিছু করার ছিল না। তখন রায়মঙ্গলে (নদীর মোহনায় অবস্থিত) ছিল সর্ব দক্ষিণের শেষ বিওপি। সে সময় ভারত থেকে মালবাহী জাহাজ এখানে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে মংলা হয়ে যমুনা নদীপথে কুড়িগ্রামের চিলমারী ও রৌমারী হয়ে আবার ভারতে ঢুকে আসামে যেত। এই পথ বহু পুরোনো—ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকেই ছিল। রায়মঙ্গলে ভাসমান একটি বড় লোহার তৈরি বোটে বিডিআর, পুলিশ ও কাস্টমসের লোকজন থাকত। চরম বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে এদের দায়িত্ব পালন করতে হতো। বিশেষ করে, গ্রীষ্মকালে সেখানে থাকাটা যে কী রকম কষ্টকর, ব্যাপারটা আমি দেখেছি। খাবার ও গোসলের পানিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু সেখানে পাঠাতে হতো। পেট্রোলিং তো দূরের কথা, ওখানে সুস্থ থাকাই ছিল একটা কঠিন ব্যাপার। যতবার সেই বিওপিতে গিয়েছি, দেখেছি, ১৪-১৫ জন সদস্যের মধ্যে দুই থেকে চারজনই অসুস্থ। মনে যন্ত্রণা নিয়ে ফিরেছি তাদের থাকা-খাওয়ার অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হতো না বলে (পরে অবশ্য ওই বিওপি উঠিয়ে দেওয়া হয়)।

সারা দিন বনাঞ্চলে লঞ্চে করে ঘুরে রাতের বেলা কোনো একটা এলাকায় নোঙর করে থাকতে হতো। বনের নীরব-নিস্তব্ধ পরিবেশে নদীর বুকে আমাদের জলযানটি ভেসে থাকত। ছোট ছোট ঢেউ লঞ্চের গায়ে লেগে মধুর আওয়াজ ছড়াত। এ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিল না। মাঝেমধ্যে কান পেতে অপেক্ষা করতাম বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ডাক শোনার জন্য। ডেকের ওপর চাঁদনি রাতে একা বসে কাটিয়েছি ঘুম না আসা পর্যন্ত। এত বছর পরও অনেক ঘটনা ও অনেক জায়গার নানা স্মৃতির মধ্যে সুন্দরবনে কাটানো এই মধুর

সময়গুলোর স্মৃতি আমাকে এখনো বিশেষভাবে অভিভূত করে থাকে। প্রায় একই রকম পরিবেশ আর এমনই উত্তেজনাপূর্ণ রোমাঞ্চকর কর্মজীবন আবার ফিরে পেয়েছিলাম, যখন রাঙামাটি পার্বত্য অঞ্চলের ব্রিগেড কমান্ডারের দায়িত্ব পেয়েছিলাম আমি। যথাস্থানে সেই সব দিনের কথা থাকবে।

একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বদলির নেপথ্য-কথা

সীমান্তে চোরাচালান বন্ধে যখন কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ বদলির হুকুম পেলাম। এবার যেতে হবে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর সেক্টরে।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস সেটা। হিসাব করে দেখলাম, যশোরে দায়িত্ব নিয়ে দেড়-দেড়টা বছর পার করে দিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে আমি এলাকায় চোরাচালানসহ সীমান্তসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হলাম। একজন সামরিক অফিসারের জন্য এ বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে না বললেই চলে। সে সময় অন্যান্য বাহিনীর মতো বিডিআরেও নানা সমস্যার অন্যতম ছিল নেতৃ-পর্যায়ে অফিসারদের সংখ্যা-স্বল্পতা, যার সঙ্গে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই যুক্ত থাকে সাংগঠনিক বিধিবিধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজটি। যশোর সেক্টরে এ কাজেও আমি যথেষ্ট পারদর্শিতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সীমান্তে চোরাচালান বন্ধের কাজ করতে গিয়ে যে কোনো কোনো প্রভাবশালী মহলের বিরাগভাজন হয়েছিলাম, সেটা অজানা ছিল না। কিছু কিছু বিষয়ে চাপ ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু এসব প্রতিবন্ধকতা আমার দায়িত্ব পালনে কিছুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। বিডিআরের তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান (প্রয়াত) আমাকে বরাবরই সমর্থন জুগিয়ে গেছেন এবং যত রকমের চাপ এসেছে, তা প্রতিহত করেছেন। স্বীকার করতে দোষ নেই যে নাটোরে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমার মনোবল ও উদ্দীপনা অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। এর বেশ কয়েক মাস পর আমার বন্ধু কর্নেল শাফায়াত জামিল টেলিফোনে আমাকে জানালেন, বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেছেন, তিনি আমার চোরাচালানবিরোধী তৎপরতায় সন্তুষ্ট এবং আমি যেন দৃঢ়তার সঙ্গে আমার কাজ চালিয়ে যাই। তিনি শাফায়াতকে এ-ও বলেছেন, তাঁর মনোভাবের কথা তিনি যেন আমাকে জানিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর এই বার্তা আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করে তোলে। সে সময় আমি কয়েকটি বড় চোরাচালানি গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড নিয়ে গোপন তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং সহসাই অভিযান চালানোর

পরিকল্পনা করছিলাম। এদের মূল ঘাঁটি ছিল খুলনা। তাদের রুট ছিল সুন্দরবন-মংলা-খুলনা এবং বেনাপোল-যশোর-নোয়াপাড়া-খুলনা। তবে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বদলির হুকুম আমাকে যেমন মর্মাহত করে, তেমনি নিরুৎসাহীও করে তোলে। এই পোস্টিংয়ের কয়েক মাস আগে খুলনার উইং কমান্ডারের এক ঘৃণ্য অপতৎপরতার ঘটনা উদ্‌ঘাটন করে তাঁকে সেখান থেকে তাৎক্ষণিক প্রত্যাহারের সুপারিশ করি। আমার খুবই শক্ত অবস্থানের কারণে ডিজি তাঁকে সরিয়ে নেন এবং সেনাবাহিনীতে ফেরত পাঠান। আমার পোস্টিংয়ের সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্র ছিল কি না, সেটা বোঝার জন্য নিচের ঘটনাটি তুলে ধরছি।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে এক রোববার বিকেলে বাসায় এসে ঝিকরগাছার এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান; এবং যে বিষয়ে তিনি কথা বলতে চান, সেটা খুবই জরুরি বলে তিনি দাবি করেন। আমি নিচে আসতেই তিনি বলেন, খুলনার উইং কমান্ডার কোথায় আছেন, আমি জানি কি না। এমন প্রশ্নে আমি বিরক্ত বোধ করলেও পাল্টা জানতে চাইলাম, কেন তিনি এটা জানতে চাচ্ছেন? তিনি যা বললেন, তা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। তিনি বলে গেলেন, খুলনার উইং কমান্ডার মেজর শাহাদত হোসেন সকাল থেকে বেনাপোলে আছেন, নয়টি লবণবাহী ট্রাক আটক করেছেন এবং অনেক দোকানে তল্লাশি চালাচ্ছেন। সকালে অফিসে এসে আমাকে বিস্তারিত জানানোর কথা বলে তাঁকে বিদায় দিয়েই খুলনায় টেলিফোন করলাম। তাঁর বাসা থেকে বলা হলো, তিনি বাইরে আছেন। তবে কোথায় আছেন, তাঁরা সেটা জানেন না। আমার মনে সন্দেহ জাগতে লাগল। যশোরের উইং কমান্ডার মেজর ফখরুদ্দিনকে রিং করলাম। জানতে চাইলাম, খুলনার উইং কমান্ডার এদিকে আসছেন কি না। তিনিও জানেন না। বেনাপোল খুলনার উইং কমান্ডারের অধীন নয়। সেখানে গিয়ে খুলনার উইং কমান্ডারের অপারেশন চালানোর বিষয়টা সন্দেহজনক। তা-ও আবার আমার ও যশোরের উইং কমান্ডারের অজান্তে। ঝিকরগাছার সেই ভদ্রলোকের কথায় যে সত্যতা আছে, সেটা টের পেতে লাগলাম। যা-ই হোক, সকালের অপেক্ষায় যথাসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত দেড়টার সময় ডিউটিরত সেন্ট্রি আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। খবর দিল, খুলনার উইং কমান্ডার এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আরও লোকজন আছে। খুবই নাকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নিচে ড্রয়িংরুমে আসতেই উইং কমান্ডারকে পেলাম। তিনি জানালেন, একটা বড় কেস ধরেছেন। লবণভর্তি নয়টি ট্রাক বেনাপোল হয়ে খুলনায়

যাচ্ছিল। সে খবর পেয়ে বেনাপোল থেকেই সেগুলোকে আটক করেছেন। মালিককে ধরতে পারেননি। পালিয়ে গেছে। তবে একটা ব্যাগ ফেলে গেছে সে। তার একজন সঙ্গীকে ধরে নিয়ে এসেছেন। ট্রাকগুলো বিডিআরের পাহারায় আনা হচ্ছে। চামড়ার ব্যাগটা আমার সামনে তুলে ধরে বললেন, 'স্যার, এতে নয় হাজার টাকা আছে। আপনার কাছে রেখে দিন।'

আমি চুপ করে সব কথা শুনছিলাম আর লক্ষ করছিলাম তাঁর বলার ভঙ্গি ও আচরণ। বেশ উৎফুল্ল ভাব। পান চিবোচ্ছেন আর কথা বলছেন। আচরণে কিছুটা অসংলগ্নতার ভাব—এসব কিছু আমার দৃষ্টি এড়াল না। সিনিয়রের সামনে পান চিবোনো যায় না বলে নিজেই বললেন ঘুম ঠেকাতে তিনি পান খাচ্ছেন। মদ পান করলেও অনেকে মুখের গন্ধ ঠেকাতে পান খায়। আমি তাঁর সঙ্গে আসা হাবিলদারকে ডেকে ব্যাগ খুলে টাকা গুনতে বললাম। ঠিকই নয় হাজার টাকা। বেনাপোল তাঁর উইং এলাকার নয়, তার পরও ওখানে কেন অভিযান চালানেন—জানতে চাইলাম আমি। আমার প্রশ্নের খোঁড়া জবাব দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করলেন। আমার বুঝতে বাকি রইল না, কেন তিনি এত রাতে ঘটনা জানাতে বাসায় এলেন এবং কেনই বা ব্যাগটি আমার কাছে রাখার অনুরোধ করছেন। টাকাসহ ব্যাগটি তখনই যশোরে অবস্থিত ৬ উইংয়ের কোয়ার্টার গার্ডে জমা দিতে এবং ট্রাকগুলোও সেখানে নিয়ে রাখতে বলে তাঁকে বিদায় দিলাম। আর সকালে এসব কিছু নিয়ে কথা বলার জন্য অফিসে আসার নির্দেশ দিলাম। তবে তিনি রাতে যশোরে থাকতে চাইলেন না। বললেন, এখনই তিনি খুলনায় চলে যাবেন। কেন এত রাতে খুলনায় যাওয়ার কথা বললেন, সে রহস্য পরে বুঝলাম।

কয়েক দিনের মধ্যেই সেই উইং কমান্ডারের 'বেনাপোল অপারেশন'-এর অনেক কিছুই জেনে ফেললাম। ডিজিকে টেলিফোনে ঘটনার বিবরণ দিয়ে তাঁকে অবিলম্বে খুলনা থেকে অপসারণের অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে ঢাকায় এসে বিস্তারিত জানাতে বললেন। পরের দিনই বিমানে ঢাকায় পৌঁছে তাঁকে সব ঘটনা জানালাম। বিষয়টি তদন্তের জন্য তিনি একজন অফিসার নিয়োগ করলেন। যশোরে এসে তিনি আলাদাভাবে তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করলেন। আমার চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত সেই অফিসারকে ঢাকায় সরিয়ে আনা হলো। খুলনার উইং কমান্ডার সেই রাতে শুধু লবণের ট্রাক ধরেই ক্ষান্ত হননি, আরও অনেক কিছু করেছেন (প্রসঙ্গত সে সময় দেশে লবণের বড় রকমের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় সরকার ব্যবসায়ীদের তা আমদানির অনুমতি দেয় এবং ওই সব ট্রাকযোগে বৈধ কাগজপত্র নিয়েই লবণ আনা হচ্ছিল)। সেদিন সকালেই তিনি

বেনাপোলে গিয়েছিলেন। কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ধরে বিওপিতে আটক রাখেন এবং তাঁদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন (এসবই বিওপির সদস্যরা আমার কাছে প্রকাশ করে)। এরপর সন্ধ্যায় তিনি যান ঝিকরগাছা বাজারে। সেখানে আবদুর রাজ্জাক নামের (গুজরাটি মেমন সম্প্রদায়ের লোক) সরষের তেলের এক ব্যবসায়ীকে আটক করে তাঁকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ১২ হাজার টাকা আদায় করেন। আমার সঙ্গে রাত দেড়টায় কথা বলার পর তিনি খুলনায় না গিয়ে যশোরেরই এক হোটেলে গিয়ে ওঠেন। বেনাপোলে যেসব ব্যবসায়ীকে তিনি আটক করেছিলেন, তাঁদের একজন তাঁকে হোটেলে যেতে বলেছিলেন টাকা দেবেন বলে। সে জন্যই সেখানে তাঁর যাওয়া। তদন্তের ফলে এসব বের হয়ে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, তাঁকে সরিয়ে বিডিআর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে যেন একটা গড়িমসি চলছিল। এসব কিছু যখন চলছিল, তখন হঠাৎ করেই আমার পোস্টিংয়ের নির্দেশ আমাকে রীতিমতো অবাক করে দেয়; যশোর থেকে দিনাজপুরে যেতে হবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই দায়িত্ব হস্তান্তর করে দিনাজপুরের পথে ঢাকায় চলে এলাম। ডিজির সঙ্গে দেখা করতে বিডিআর হেডকোয়ার্টারে গেলাম। সেই অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জোর দাবি জানালাম। ডিজিকে এ-ও জানালাম, যেখানে আমি বিডিআরের ছয়জন সদস্যকে চোরাচালানিদের কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা গ্রহণ করায় শাস্তি হিসেবে তাদের বরখাস্ত করি (যে শাস্তি তিনি কিছুদিন আগে অনুমোদনও করেছিলেন), সেখানে এত বড় অপরাধের দায়ে যদি ওই অফিসারের কোনো শাস্তি না হয়, তাহলে আমাদের আর বিডিআরে কমান্ড করার কোনো নৈতিক অধিকার থাকে না। বুঝলাম, তিনি যেন কোনো অদৃশ্য কারণে বিব্রত বোধ করছেন। ফাইলটি রেখে বললেন, 'আচ্ছা, আমি দেখব।'

এর পরের ঘটনাও না লিখে পারছি না। তাই অতি সংক্ষিপ্ত আকারে সেটা তুলে ধরছি।

১৯৭৫ সালের আগস্ট ও নভেম্বরের দু-দুটো হৃদয়বিদারক ঘটনার পরের কথা। নতুন ডিজি হিসেবে মেজর জেনারেল গোলাম দস্তগীর (প্রয়াত) দিনাজপুর পরিদর্শনে এলে তাঁকে পুরো ঘটনা খুলে বলি। তিনি আশ্বাস দিলেন, এ নিয়ে তিনি সেনা সদর দপ্তরে কথা বলবেন। পরে শুনলাম, সেনা সদরের নির্দেশে একটি কোর্ট অব ইনকোয়ারি হয়েছে কুমিল্লা সেনানিবাসে। সেই অফিসারের তখনকার কর্মস্থল ছিল কুমিল্লা। কয়েক মাস পর ডিজির সঙ্গে

আবার দেখা হলে তিনি জানান, সেনাবাহিনীতে তদন্ত হয়ে গেছে এবং যথাযথ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। সেই অফিসারের বিরুদ্ধে নাকি উত্থাপিত অভিযোগের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। এরই মধ্যে জানতে পারলাম, কুমিল্লার জিওসি মেজর জেনারেল আমজাদের নির্দেশে তদন্ত হয়েছে এবং তদন্ত প্রতিবেদনে জিওসির মন্তব্য ছিল এ রকমের, '...কেস ইজ এ ফেব্রিকেটেড ওয়ান।'

এ মন্তব্য শুনে আমি খুবই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হলাম। সেনাবাহিনীতেও যে প্রহসনমূলক তদন্ত হয়, এটা তারই বিরল দৃষ্টান্তের একটি। ঘটনার স্থান যেহেতু যশোর, ঘটনার উদ্‌ঘাটক হিসেবে মূল সাক্ষী হচ্ছি আমি। আর ডজন খানেক সাক্ষী ছিলেন বেনাপোল, ঝিকরগাছা ও যশোর শহরে, যারা সেই ন্যক্কারজনক ঘটনার ভিকটিম। আরও সাক্ষী ছিলেন বিডিআরের সদস্যরা, যাঁরা সেই অফিসারের সঙ্গে সে সময় দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁদের সাক্ষ্য ছাড়া কোর্ট অব ইনকোয়ারি কী করে তাদের তদন্ত সম্পন্ন করেছিল, সে এক বিরাট প্রশ্ন। মানতে পারলাম না এই সেনাবাহিনীতে দুর্নীতিপরায়ণ অসৎ অফিসারদের জায়গা হতে যাওয়ার ব্যাপারটি। তবু আমি দমে যাওয়ার পাত্র নই। তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বরাবর পাঠানো একটি বড়সড় চিঠিতে (ডিও) সমস্ত ঘটনা তুলে ধরে প্রতিকার চাইলাম। এ-ও জানালাম, ফেব্রিকেটেড হলে তো আমারই কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত। সেই চিঠির কপি ডিজি বিডিআরসহ সেনা সদরের সংশ্লিষ্ট পিএসওদেরও দিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, কয়েক মাসের ব্যবধানেই সেই অফিসার চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, কয়েক বছরের মধ্যে সেই জিওসিও তাঁর চাকরি হারিয়েছিলেন। আমাকে যশোর থেকে হঠাৎ দিনাজপুরে পোস্টিং করে দেওয়ার পেছনে যে জনস্বার্থ বা দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের হাত ছিল, সে কথা আমি এখনো বিশ্বাস করি।

দিনাজপুর সেক্টরে বদলি

১৯৭৫ সালের মে মাসে দিনাজপুরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। তখন দিনাজপুর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল চারটি উইং। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর ও কুড়িগ্রামে ছিল এই উইংগুলোর হেডকোয়ার্টার। ওই জেলাগুলোর সীমান্ত এলাকা বিস্তৃত ছিল হিলি থেকে শুরু করে কুড়িগ্রামের রৌমারী পর্যন্ত প্রায় ৮০০ মাইল এলাকাজুড়ে। দিনাজপুরে অবস্থিত সেক্টর হেডকোয়ার্টার থেকে এত বড় এলাকা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা যথেষ্ট কঠিন ছিল। তবে চোরাচালানের দিক থেকে একমাত্র হিলি ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল তত

কুখ্যাত ছিল না, যতটা খুলনা, সাতক্ষীরা ও বেনাপোল ছিল। আমি যোগদান করার সময় সেখানে যে চারজন উইং কমান্ডার ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন বয়সে তরুণ, কর্মতৎপর ও নিষ্ঠাবান। কয়েক মাসের মধ্যেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার অধিকাংশ বিওপি পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে গেলাম। আগে কখনো উত্তরবঙ্গে আসিনি। এই এলাকা অনেক দিক দিয়ে দেশের পূর্ব ও মধ্যাঞ্চল থেকে ভিন্নতর। আমার খুব ভালো লাগতে লাগল। দিনাজপুর ছোট শহর। যথেষ্ট ছিমছাম। তবে অনুন্নত। শহর থেকে একটু বের হলেই গ্রাম। তার পর থেকে বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি, যার বেশির ভাগেই জন্মায় ধান। ভালো জাতের চালের জন্য বৃহত্তর দিনাজপুর বিখ্যাত। কাটারিভোগ চাল এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হয়। মাইলের পর মাইলজুড়ে ধানখেতের পর ধানখেত। বিওপি পরিদর্শনে বের হলে এসব ধানখেত দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। এখানকার আমও খুব বিখ্যাত। সবচেয়ে বেশি জাতের আম এখানেই পাওয়া যেত। যে বাসায় থাকতাম, সেটা একসময় ছিল এক হিন্দু জমিদারের বাগানবাড়ি। এর চত্বরজুড়ে ছিল প্রায় ৬০টি বিভিন্ন জাতের আমগাছ। এগুলো এমনভাবে লাগানো যে, বৈশাখ মাসে আম পাকা শুরু করত আর শেষ হতো ভাদ্র মাসে। প্রায় পাঁচ মাস আম খাওয়া যেত। অবশ্য বেশির ভাগ গাছ মাত্রাছাড়া বয়সী হয়ে যাওয়ায় এবং যত্নের অভাবে সব গাছে আম ধরত না। সেক্টর হেডকোয়ার্টারও জমিদারবাড়ি, সেখানেও প্রচুর আমগাছ। শহরের অনেকটা এলাকাজুড়েই আম, লিচু ও কাঁঠালের বাগান। শহরের সম্ভ্রান্ত এলাকা বলতে ছিল বড় মাঠের চারদিক জুড়ে থাকা জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের অফিস ও বাসস্থান। আমার বাসা ছিল মাঠের পশ্চিম পাশে। মাঠের মাঝ বরাবর ছিল ব্যবহারের অযোগ্য বহু পুরোনো একটা রানওয়ে। সম্ভবত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের তৈরি। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল এক হেলিপ্যাডও। এখানকার আকর্ষণীয় নিদর্শন হলো রামসাগর দিঘি। সব মিলিয়ে দিনাজপুর আমাদের খুব আকৃষ্ট করেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

১৯৭৫ সালের আগস্ট-নভেম্বরের কাহিনি

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের সেই দিনে

দিনাজপুরে এসে প্রথম কয়েক মাস খুবই ব্যস্ত ছিলাম উইং ও বিওপিগুলো পরিদর্শন করা নিয়ে। এত বিরাট সীমান্ত এলাকা, যা প্রায় তিন দিক জুড়ে বিস্তৃত। একদিকে বের হলে প্রায় তিন-চার দিন লেগে যেত। আগস্ট মাসের ১৪ তারিখ সকালে রেলপথের ট্রলিতে (তখন বিডিআরের একটি মোটরচালিত ট্রলি ছিল) করে রওনা হলাম কুড়িগ্রামের উদ্দেশে। দিনাজপুর ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই ট্রলিটি বিকল হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও ঠিক করা গেল না। সেক্টর হেডকোয়ার্টারের জিপ আমাদের চিরির বন্দর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। ঘুমাতেও দেরি হয়ে গেল। সকালে টেলিফোন বাজার শব্দে ঘুম ভাঙল। দিনাজপুর কলেজের অধ্যক্ষ আলী আহমেদ অপর প্রান্তে। তিনি খুবই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, আমি রেডিও শুনছি কি না এবং রেডিওতে এসব কী বলা হচ্ছে!

আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তিনি আরও বললেন, ঢাকায় বোধ হয় একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। আমি জানি কি না!

রেডিও অন করতেই শুনলাম, একজন বলছে। 'আমি ডালিম কথা বলছি, সারা দেশে মার্শাল ল জারি করা হয়েছে। সেনাবাহিনী শাসনভার গ্রহণ করেছে, প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাগুলো বিশ্বাস করতে প্যারছিলাম না। টেলিফোনে অনেকবার চেষ্টা করেও ঢাকায় বিডিআর হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না।

অফিসারদের তক্ষুনি অফিসে চলে আসার কথা জানিয়ে নিজেও তৈরি হয়ে চলে এলাম সেক্টর হেডকোয়ার্টারে। জেলা প্রশাসকসহ অনেকেই জানতে চেষ্টা করলেন, ঢাকায় কী ঘটেছে! আমরা কিছুই জানি না। রেডিওর মাধ্যমে নানা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। উইং কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বললাম টেলিফোনে। তাদের সতর্ক থাকতে ও যার যার দায়িত্ব পালন করে যেতে বললাম। বিওপিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও সীমান্তের ওপারে নজর রাখার প্রতি গুরুত্ব দিলাম। সবচেয়ে অবাক হলাম, যখন রেডিওতে তিন বাহিনীর প্রধান, পুলিশের আইজি ও বিডিআরের ডিজি অভ্যুত্থানকারীদের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দিলেন। মনটা খুবই বিষণ্ন হয়ে গেল। এক রাতের ব্যবধানে কী পরিবর্তনটাই না হয়ে গেল! বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা, যাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলো এবং যিনি দেশের প্রেসিডেন্ট, তাঁকে ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী এবং পরিবারের সদস্যদের এমন নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, যা কল্পনারও বাইরে! আরও অবাক হলাম এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অন্য কোনো অংশ এবং দলের কেউ প্রতিবাদ করল না বলে। সবাই যেন স্তব্ধ ও আতঙ্কিত। কয়েক দিনের মধ্যে ঢাকায় সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নানা বিবরণ শুনতে লাগলাম। সময় বয়ে যেতে লাগল। সারা দেশই যেন মেনে নিল ওই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড এবং হত্যাকারীদের সমর্থন দেওয়া ছাড়া আর যেন কোনো উপায়ই থাকল না। নানা কারণে বঙ্গবন্ধু বিতর্কিত হয়ে পড়েছিলেন। সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতির প্রবর্তন, সর্বোপরি বাকশাল নামের একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলন করায় তিনি ভীষণভাবে সমালোচিত হতে থাকেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হলো, যিনি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনিই বিতর্কিত হয়ে পড়লেন। এরই সুযোগ নিয়েছে ক্ষমতালোভী একদল রাজনীতিবিদ ও সেনাবাহিনীর ক্ষুদ্র একটি অংশ। অবস্থা এ রকমটাই দাঁড়াল যে দেশবাসীকে বিনা প্রতিবাদে এই রাষ্ট্রদ্রোহী ও মানবতাবিরোধী অপরাধ মেনে নিতে হলো।

কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা। আমার অফিসের দেয়ালে টাঙানো বঙ্গবন্ধুর ছবিটা নামাতে এলেন হাবিলদার মেজর আবুল হোসেন। তাঁর হাতে অন্য একটি ছবি। বললেন, 'স্যার, এই ছবিটা বিডিআর হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছে, লাগাতে হবে।' ছবিটা খন্দকার মোশতাক আহমদের, বঙ্গবন্ধুরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক তখন দেশের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক

শাসক। আমার সামনেই ফ্রেম থেকে ছবিটা খুলে মোশতাকের ছবিটা হাবিলদার আবুল হোসেন লাগালেন। বসে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কার জায়গায় কে এল! আবুলকে বললাম, ছবিটা যত্ন করে রেখে দাও, আবার লাগবে। এরই মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল, সেনাবাহিনীর কারা এই জঘন্য অপকর্মে অংশ নিয়েছিল। এদের কাউকে আমি চিনতাম না। তাদের দাপটের কথাও শোনা যেতে লাগল। বঙ্গভবনে বসে তারাই এখন দেশ চালাচ্ছে। নানা নির্দেশ আসছে। এরই মধ্যে খবর এল সিজিএস (চিফ অব জেনারেল স্টাফ) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আসছেন, তাঁর সঙ্গে থাকবেন মেজর (তখন বোধ হয় লে. কর্নেল হয়েছেন) ফারুক এবং একজন সচিব, সম্ভবত আইনসচিব। তাঁরা জেলার অফিসারদের ব্রিফিং করবেন। জেলা প্রশাসক ম ম রেজা আমাকে সেখানে থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন (জেলা পর্যায়ের কোনো সম্মেলনে সাধারণত আমাকে থাকতে হয় না)। তবে আমিও উৎসাহী হলাম এই আশায় যে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দেখা হবে, কিছু কিছু বিষয়ে জানতে পারব। হেলিকপ্টার থেকে তাঁরা নেমেই সার্কিট হাউসে সমবেত ব্যক্তিদের উদ্দেশে কথা বলতে লেগে গেলেন। ফারুক ও সচিব সামনে বসে একজনের পর একজন পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছেন। তাঁদের কারও কথাই আমার ভালো লাগছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই খালেদ মোশাররফ উঠে পাশের রুমে ঢুকেই আমাকে ডাকলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খারিয়াঁয়। তিনি তখন একটি ব্রিগেডের বিএম (ব্রিগেড মেজর)। তাঁর বাসায় সস্ত্রীক গিয়েছি। ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'খবর কী?' আরও স্পষ্ট করেই বললেন, 'ভেতরের খবর বলো।' তাঁর প্রশ্নের জবাবে আমার অজ্ঞতার কথাই বলতে হলো। এবার তিনিই সংক্ষেপে বললেন ঢাকায় বঙ্গভবনে অবস্থানরত মেজরদের দৌরাত্ম্যের কিছু কথা। তাঁরাই দেশ চালাচ্ছেন। সেনাবাহিনী কথা শুনছে না। তাঁদের ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে ইত্যাদি। এই সঙ্গে জেনারেল ওসমানী ও সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে দিচ্ছেন না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। জানালেন, এখান থেকে তাঁরা রংপুরে যাচ্ছেন। ওখানকার ক্যান্টনমেন্টে সেনা অফিসার কে কে আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন। ঘণ্টা দুই পর সবাই বিদায় নিলেন। কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারলাম। ১৫ আগস্টের ঘটনায় সেনাবাহিনীর অনেকেই ক্ষুব্ধ। খালেদ মোশাররফ তাঁদের অন্যতম। জড়িত মেজরদের তিনি শায়েস্তা করতে চান।

নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থানের দিনে দিনাজপুর

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানের প্রথম খবর পেলাম বিডিআরের অপারেশন কক্ষ থেকে। আমাদের সতর্ক থাকতে বলা হলো। দুপুরের দিকে রংপুর ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল হুদা আমাকে টেলিফোনে জানালেন, ঢাকা এখন ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলের নিয়ন্ত্রণে। আকাশে ফাইটার বিমান উড়ছে। মেজররা আত্মসমর্পণ না করলে বঙ্গভবনের ওপর আক্রমণ চালানো হবে। সেদিন থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত নানা বিভ্রান্তিকর খবর পেতে লাগলাম। বিডিআরের হেডকোয়ার্টার থেকে কেউ কিছু বলছে না। ঢাকার অবস্থা যে খুবই গোলমেলে, সেটা টের পাচ্ছিলাম। আকাশবাণী ও বিবিসি বাংলা বিভাগের খবর বলছে, ঢাকার অবস্থা ভালো নয়। সেনাছাউনিতে বিশৃঙ্খলা চলছে। সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দী করা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে প্রমোশন দিয়ে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হয়েছে। এসব খবর যতই শুনছি, ততই বেড়ে চলেছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। নিরুদ্বিগ্ন সময় কাটানোর বিন্দুমাত্র অবকাশ পাচ্ছি না। ৯ নভেম্বর বেলা ১১টার মতো হবে, হঠাৎ বিমানের আওয়াজ শুনতে পেলাম। জেলা প্রশাসক (ডিসি) ম ম রেজা আমাকে টেলিফোনে বললেন, একটি বিমান বড় ময়দানে নামার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। আমি যেন এক্ষুনি সেখানে যাই। গিয়ে পৌঁছাতেই দেখি, বিমান ঠিকঠাক মতোই অবতরণ করেছে। বিমানে একজন অফিসারের লাশ নিয়ে আসা হয়েছে। লাশটা পৌঁছে দিতে হবে পরিবারের কাছে। জেলা প্রশাসককে পুলিশের সাহায্যে সে ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হতে দেখে আমি বিমানের দুই বৈমানিককে বিডিআর অফিসে নিয়ে এলাম। একজন ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার জিয়া (তিনি পরে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন) এবং অপর একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (তাঁর নাম মনে নেই)। ঢাকার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁরা যা বর্ণনা দিলেন, তাতে চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। তাঁদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সারটা এই : ঢাকায় চরম বিশৃঙ্খলা চলছে। ৭ তারিখ রাতে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে এবং সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করা হয়। তাঁর সমর্থক সেনাসদস্যরা এই অভ্যুত্থান ঘটায়। তাদেরই এই অংশটি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বের হয়ে ক্যান্টনমেন্টে উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। মূলত তারা কমান্ড চ্যানেল অগ্রাহ্য করে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ওই রাতেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল

হুদা ও লে. কর্নেল হায়দারকে সেনাসদস্যরা হত্যা করে। তাদের মূল টার্গেট হয় সামরিক বাহিনীর অফিসার পর্যায়ের লোকজন। একজন মহিলা ডাক্তার ও একজন দাঁতের ডাক্তারকেও তারা তাদের বাসায় গিয়ে গুলি করে মেরেছে। আরও অনেকে নিহত হয়েছেন। সারা ক্যান্টনমেন্টে গুজব ও লিফলেট ছড়ানো হয়। নানা ধরনের স্লোগান দিয়ে তারা শহরময় ঘুরছে। তাদের দাবি, কোনো র‍্যাংক থাকবে না। অফিসাররাও থাকবে না ইত্যাদি। পরে জানা যায়, কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে বিপ্লবী সেনা সংস্থা নামের এক গোপন সংগঠন বিপ্লবের নামে এই অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত, কর্নেল তাহের সেনাবাহিনী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের পর নারায়ণগঞ্জে একটি আধা সরকারি সংস্থায় তখন চাকরিরত ছিলেন। এই গোপন সংস্থার লোকেরা ৮ তারিখ দিনে ও রাতে বেশ কয়েকজন নিরীহ অফিসারকে হত্যা করে। অনেকেই তাদের হাতে লাঞ্ছনার শিকার হন। শুনে মনে হলো, আমরা গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি। আরও শুনলাম, কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সেনা সংস্থার সমর্থক সব ক্যান্টনমেন্টেই রয়েছে। আমার মনে হলো, তাহেরের ওই বিপ্লবী সংস্থার সমর্থক এই অঞ্চল অর্থাৎ রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টেও থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়। তখন দিনাজপুরে বিডিআর ছাড়াও সেনাবাহিনীর একটি ছোট অস্থায়ী ইউনিট ছিল।

কেন জানি একটা তাৎক্ষণিক পূর্বাশঙ্কা আমার মনে দেখা দিল। ভাবলাম, এ দুই ক্যান্টনমেন্টেও সেনাসদস্যরা ঢাকার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। সেখানেও কমান্ড কন্ট্রোল ভেঙে পড়তে পারে। তখনই স্থির করলাম, দুই ক্যান্টনমেন্টের অফিসারদের সতর্ক করতে হবে। তাঁরা হয়তো ঢাকার চলমান অবস্থা সম্পর্কে জানেন না। আগে থেকে সংকেত পেলে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারলে চরম সংকটময় পরিস্থিতিও সামাল দেওয়া সহজ হয়। এয়ারফোর্স অফিসারদের বিদায় দিয়েই আমি রংপুরে লে. কর্নেল হান্নান শাহকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করলাম তিনি ঢাকার অবস্থা জানেন কি না। তিনি বললেন, জানেন না, তবে গুজব শুনেছেন। বললাম, খুব জরুরি গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। আমি আসছি, আপনি বাসায় থাকেন।

রংপুরে আছে আমার অধিনায়কত্বে বিডিআরের উইং। উইং কমান্ডার মেজর নুরুল হককেও বললাম তিনি যেন অফিসে থাকেন। লে. কর্নেল হান্নান (পরে ব্রিগেডিয়ার, অবসরপ্রাপ্ত) তখন ৬ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সিও, অর্থাৎ কমান্ডিং অফিসার এবং রংপুর ক্যান্টনমেন্টের ব্রিগেড কমান্ডারের পর তিনিই সিনিয়র অফিসার। ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল হুদা সেই যে ঢাকায়

গেছেন, এখনো ফেরেননি। তাঁর নিহত হওয়ার খবর শুনলাম। সেক্টরে আমার সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর এ টি এম এন চৌধুরী বললেন, 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব।' তাঁকে নিয়ে রংপুরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখানে পৌঁছেই সোজা লে. কর্নেল হান্নানের বাসায় গিয়ে উঠলাম। ঢাকার অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি, তার সবই তাঁকে জানালাম। ঢাকায় সেনারা নিয়ন্ত্রণে নেই, তারা অফিসারদের বিরুদ্ধে নেমেছে, তাঁদের কয়েকজনকে যে তারা হত্যা করেছে—এসব কথা তাঁকে জানিয়ে বললাম, সেনাসদস্যদের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অফিসাররা যেহেতু তাদের প্রধান লক্ষ্য, অফিসার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। দেখলাম, তিনি এ ব্যাপারে খুবই আস্থাবান। বললেন, তাঁর সেনারা নিয়ন্ত্রণে আছে এবং থাকবে।

গাড়িতে বসে মেজর এ টি এম এন চৌধুরী আমাকে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে বললেন, মনে হলো না ৬ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সিও বিষয়টিকে যথার্থ গুরুত্ব দিয়েছেন।

সেখান থেকে বের হয়েই রংপুর-সৈয়দপুর রাস্তায় বিডিআরের উইং হেডকোয়ার্টারে গেলাম। উইং কমান্ডার তাঁর কিছু লোকজন নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে সম্ভাব্য পরিস্থিতি কী হতে পারে এবং কী ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক হবে, সে ব্যাপারে ব্রিফ করলাম। বললাম, ক্যান্টনমেন্টে কোনো বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হলে কোনোক্রমেই বিডিআরের কেউ যেন তাতে যোগ না দেয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। সব অফিসার, জেসিও ও সেনাসদস্য এখন থেকেই যেন বিডিআরের লাইনে অবস্থান করতে থাকে। নিজের এলাকার বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে। তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সংস্পর্শে আসার আশঙ্কা থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে সেনাদের নিয়ন্ত্রণের তথা কমান্ড কন্ট্রোলের জন্য এসবই হলো কার্যকর ব্যবস্থা।

এখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে গেলাম। আমার কোর্সমেট বন্ধু লে. কর্নেল আবদুল্লাহকে (পরে ব্রিগেডিয়ার, অবসরপ্রাপ্ত) বাসায় না পেয়ে তাঁর অফিসে গেলাম। তাঁকে ঢাকার অবস্থা, সম্ভাব্য পরিস্থিতি কী হতে পারে এবং কী ধরনের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, তা নিয়ে আলোচনা করলাম। তিনি তখন একটি আর্টিলারি রেজিমেন্টের অধিনায়ক। অন্যান্য অফিসারকেও চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে বাসায় ফিরলাম। ততক্ষণে রাত প্রায় একটা।

দিনাজপুর শহরে অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

পরের দিন সকালে, অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১০ নভেম্বর নিজেদের প্রস্তুতির জন্য অফিসারদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলাম। গত রাতেই বিডিআরের সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম, সভা শেষে সেক্টর ও উইংয়ের সর্বস্তরের সদস্যদের সমবেত (যাকে দরবার বলা হয়) করে ঢাকার অবস্থা ব্যাখ্যা করব। দরবারে সোজা-সরল ভাষায় ঢাকার অবস্থা বর্ণনা করলাম। সেখানে সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সেনাসদস্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্যারাক ছেড়ে বের হয়ে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ শুরু করেছে। কমান্ড কন্ট্রোল অগ্রাহ্য করছে, অফিসারদের কর্তৃত্ব মানছে না। এরই মধ্যে কয়েকজন অফিসারকে তারা হত্যা করেছে। অবস্থা এমন চলতে থাকলে দেশের স্বাধীনতা থাকবে না। আমার উদ্দেশ্য হলো, সবাইকে মোটিভেট করা, যাতে কারও প্ররোচনায় তারা উচ্ছৃঙ্খল তৎপরতায় আগ্রহী না হয়। মনে হলো, সবাই আমার কথা গুরুত্বসহকারে শুনলেন। দিনভর দিনাজপুরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকল। রাত ১০টা নাগাদ ৮ উইং কমান্ডার মেজর সলিমুল্লাহ টেলিফোনে আমার বাসায় আসতে চাইলেন। এসেই বললেন, 'আমরা যা আশঙ্কা করছিলাম, তা-ই ঘটছে।' জানালেন, সৈয়দপুর ও রংপুর সেনানিবাসে সেনাসদস্যরা বের হয়ে পড়েছে এবং ঢাকার মতোই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ শুরু করে দিয়েছে।

আমাদের একটা প্রস্তুতি তো ছিলই। সলিমুল্লাহকে রাতে সেক্টর হেডকোয়ার্টারেই থাকতে বললাম। এখন বড় প্রয়োজন সেনাদের সঙ্গে অফিসারদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ও যোগসূত্র রক্ষা করে চলা এবং সবাইকে ব্যস্ত রাখা।

সকালে অফিসে এলাম। মাঠে তখন বিডিআর সেনাদের প্যারেড চলছিল। সেদিকেই গেলাম। একটু পরই দেখি, আর্মির একটি জিপ ঢুকছে। বেসামরিক অর্থাৎ সিভিল পোশাকে বসে আছেন ক্যাপ্টেন নজরুল (পরে মেজর জেনারেল)। তিনি জিপ থেকে নেমে এসে আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, তিনি সৈয়দপুরে যাচ্ছেন। গত রাতে তাঁদের ১৬ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সব সেনাসদস্য হাতিয়ার নিয়ে বের হয়ে পড়েছে। তিনি সেখানকার কারও সঙ্গেই ওয়্যারলেস বা টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারছেন না। ব্যাটালিয়নে কোনো অফিসার নেই।

তাঁকে প্রথমেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি ইউনিফরম ছেড়ে সিভিল পোশাকে কেন?

তিনি জানালেন, তাঁদের সব অফিসারই সিভিল পোশাকে সরে পড়েছে। তাঁকে বললাম, এক্ষুনি যেন ইউনিফরম পরে তিনি আমার অফিসে আসেন। বোঝালাম, একজন অফিসারের বড় সম্পদ হচ্ছে তাঁর ইউনিফরম, যা তাঁর কর্তৃত্বেরও প্রতীক। উল্লেখ্য, সে সময় সৈয়দপুরে অবস্থিত ১৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি আনুমানিক ৫০ জনকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারকাজে দিনাজপুরে মোতায়েন ছিল। রাতে তারা ওয়্যারলেসে জানতে পারে, সেনারা হাতিয়ার নিয়ে বের হয়ে পড়েছে। ক্যাপ্টেন নজরুলকে বললাম, তাঁর ব্যাটালিয়নের কেউ না থাকলে তিনিই দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এবং পরিস্থিতি সামাল দেবেন। আর যত দিন ঊর্ধ্বতন কোনো অফিসার না পাওয়া যাবে, তত দিন আমার নির্দেশে চলবে।

খবর পেলাম, গত রাতে রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে সারাক্ষণ গোলাগুলি চলেছে। সেনারা বের হয়ে নানা ধরনের স্লোগান দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো কোনো ইউনিটে কিছু অফিসার লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং কয়েকজনকে আটক করে রাখা হয়েছে। তবে রংপুর বিডিআরের কেউ বের হয়নি। তারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। খবরটা আমার জন্য স্বস্তিদায়ক হলো। দিনাজপুরে পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কথা নয়। কারণ, এখানে সেনাসদস্য নেই। না থাকলেও বাইরে থেকে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ১০টার সময় অফিসের সামনের আমবাগানে সেক্টর ও উইংয়ের সব স্তরের সদস্যকে সমবেত করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গেলাম। এর আগে অবশ্য সবাইকে অস্ত্র ও গোলাগুলি সমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিলাম। ইচ্ছা করেই অফিসারদের কোনো ধরনের অস্ত্র বহন না করতে বলে দিই। মনে করলাম, এতে 'প্রভোকেশনের' (প্ররোচনামূলক) ঝুঁকি থাকবে না। যদিও কেউ কেউ মনে করছিলেন এতে তাঁরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বেন। সমাবেশে ঢাকা, রংপুর ও সৈয়দপুরে উচ্ছৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির কথা তুলে ধরলাম। বললাম, বিপথগামী কিছু সেনাসদস্য কারও প্ররোচনায় দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। তারা অফিসারদের কর্তৃত্ব না মানার জন্য স্লোগান দিচ্ছে। কয়েকজন লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। অস্ত্র হাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মূল্যবান গুলি নষ্ট করছে। সাধারণ নাগরিকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাদের প্রশ্ন করলাম, পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে কি আপনারা নিজেরাও পাকিস্তানি বাহিনীর মতোই আচরণ শুরু করবেন? অফিসারদের ছাড়া কোনো বাহিনী কি চলতে পারে? আরও প্রশ্ন করলাম, কেউ কি আছেন বা কেউ চান সেক্টর কমান্ডার হতে,

তাহলে সামনে এসে আমার স্থান নিয়ে নিন। অন্য অফিসাররাও তাঁদের পদ বা জায়গা ছেড়ে দেবেন। তবু নৈরাজ্য সৃষ্টি করবেন না। দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবেন না।

সবাই চুপ, মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছেন। মনে হলো, আমার কথায় কাজ হচ্ছে। সামনেই বসা এক নায়েব সুবেদার উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'স্যার, আপনি আমাদের সেক্টর কমান্ডার, আপনাকে ছাড়া কাউকে চাই না, আর কাউকে মানব না। আপনার হুকুমে আমরা চলব।' তিনি আরও বললেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় বুঝেছি একজন অফিসারের কী মূল্য। আমরা তো প্রথম দিনই বের হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না কী করব। কত খুঁজেছি, একজন অফিসার পাই কি না, যিনি আমাদের নেতৃত্ব দেবেন।'

তাঁর কথা শুনে আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের মুখেও একই কথা, 'আপনি আমাদের কমান্ডার, আপনার পেছনে আমরা আছি। আপনি যা হুকুম করবেন, তা-ই করব।'

তাঁদের কথা শুনে আমার বুকটা ভরে গেল। সাহস ও মনোবল অনেক গুণ বেড়ে গেল। আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লাম। এমন একটা নাজুক পরিস্থিতিতে তাঁরা এত সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য ও দেশের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন, আমি ভাবতে পারিনি।

কিন্তু দরবার শেষ করে অফিসে বসতেই শুনতে পেলাম গোলাগুলির আওয়াজ। শহরের দিক থেকেই আসছে। এসপির অফিস থেকে জানাল, কয়েকটি আর্মি ট্রাকে চেপে সেনারা শহরে ঢুকেছে ও গুলি ছুড়ছে। এরই মধ্যে জেলখানা থেকে জেলার টেলিফোন করে জানালেন, সেনাদের একটি দল এসে দাবি করছে, আর্মির যেসব কয়েদি আছে, তাদের ছেড়ে দিতে হবে। তিনি কী করবেন, আমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছেন।

তাঁকে আমি ডিসি ও এসপির সঙ্গে কথা বলতে বললাম। অ্যাডিশনাল এসপি (তখন এসপি ছিলেন না) জানালেন, সেনারা পুলিশ লাইনে এসে পুলিশের অস্ত্রসহ তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলছে। নানা জায়গা থেকে এ ধরনের টেলিফোন আসতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে জেলার জানালেন, আর্মির ছয়জন কয়েদিকে তারা নিয়ে গেছে। অ্যাডিশনাল এসপিও জানালেন, পুলিশ লাইনের সবাই অস্ত্রসহ বের হয়ে পড়েছে। তাদের বাধা দেওয়া গেল না।

দুটো নাগাদ সারা শহর থেকে নানা রকম বিশৃঙ্খলার খবর পেতে লাগলাম। সেনাদের একটি দল গুলি ছুড়তে ছুড়তে ও স্লোগান দিতে দিতে

শহরময় ঘুরছে। আরেকটি দল দোকান ও বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র লুট করছে। রীতিমতো নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি।

ওদিকে ডিসিকে খোঁজ করে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর অফিসেও কেউ নেই। আমার উইং কমান্ডার মেজর সলিমুল্লাহ বিডিআর এলাকার নিরাপত্তার জন্য একটি দলকে মোতায়েন করে নিজেই তদারকির দায়িত্ব নিলেন। বিডিআর লাইনে ঢোকার গেটে একজন নায়েব সুবেদারের নেতৃত্বে একটি দলকে রাখা হলো। বলা হলো, আমাদের নির্দেশ ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেবেন না। সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক বিডিআর ও সেনাদের মধ্যে যাতে কোনো রকম বৈরী পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেভাবে চলতে হবে। উচ্ছৃঙ্খল সেনারা যদি এদের নিতে আসে, তাহলে বাহ্যিক একাত্মতা দেখানোর জন্য একদল সেনা একজন হাবিলদারের নেতৃত্বে বিডিআরের গাড়িতেই অস্ত্রসহ যাবে, কিন্তু গুলি ছুড়বে না। ঠাকুরগাঁও উইং কমান্ডার মেজর আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (পরে ব্রিগেডিয়ার, অবসরপ্রাপ্ত) জানালেন, কিছু সেনা তাঁদের ওখানেও পৌঁছেছে। তবে বিডিআর লাইনে যায়নি। কয়েকজন পঞ্চগড় এলাকার বিওপিতে গিয়েছে। সেনারা কখন বিডিআর এলাকায় আসবে, আমরা তখন সেই অপেক্ষা করতে থাকি। বেলা তিনটার দিকে আমি খেতে বাসায় গেলাম। একটু পরই মেজর সলিমুল্লাহ খবর দিলেন, তিন ট্রাকভর্তি একদল সেনা বিডিআর লাইনে ঢোকার চেষ্টা করছে। গেটের নিরাপত্তার দায়িত্বে নায়েব সুবেদার (নামটা মনে নেই) কাউকে ঢুকতে দিচ্ছেন না। তাঁর সঙ্গে তাদের বাদানুবাদ চলছে। তিনি তক্ষুনি সেখানে যাচ্ছেন বলে আমাকে জানালেন।

আমি খাওয়া সেরে ফিরে এসে শুনি, মেজর সলিমুল্লাহ একটা ট্রাকে কিছু বিডিআর সদস্যকে নিয়ে সেনাদের সঙ্গে চলে গেছেন। অল্পক্ষণ পরই মেজর সলিমুল্লাহ ফিরে এলেন। তিনি ঘটনার বর্ণনা দিলেন। বিডিআরের গেট বন্ধ দেখে সেনারা নেমে আসে। নায়েব সুবেদারকে বলে, 'গেট খুলে দিন এবং আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন।' নায়েব সুবেদার সোজা উত্তর দিলেন, 'স্যারের হুকুম ছাড়া গেট খোলা যাবে না আর কেউ ভেতরে আসতে পারবেন না।'

এ কথা শুনে তারা রেগে যায়। বলে, 'স্যার আবার কে, আপনারা এখনো স্যারদের কথা শোনেন, তাদের তো (গালি দিয়ে) আমরা কোয়ার্টার গার্ডে বন্দী করে এসেছি। তাদের জামানা শেষ।'

সুবেদারও রেগে স্টেনগান উঁচিয়ে বললেন, 'মুখ সামলে কথা বলবেন, স্যারদের গালি দেবেন তো উড়িয়ে দেব।'

তাঁর সঙ্গে থাকা বিডিআর সেনাসদস্যরাও হাতিয়ার তুলে তৈরি হয়ে গেল। বাদানুবাদ যখন চরমে ওঠার উপক্রম, সেই মুহূর্তে মেজর সলিমুল্লাহ উপস্থিত হলেন। সুবেদার বললেন, 'এই যে আমাদের স্যার, বলেন, কী বলবেন।'

মেজর সলিমুল্লাহর উপস্থিতি এবং বিডিআরের লোকদের তাঁর প্রতি দৃঢ় সমর্থন ও প্রস্তুতি দেখে সেনারা ভড়কে যায়। সলিমুল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বললেন এবং বিডিআরের সেনাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, নিজেও তাদের সঙ্গে যান। তাঁর সময়মতো উপস্থিতি ও সাহসী ভূমিকায় একটা বড় ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি পরিহার করা গেল। বিপথগামী সেনারাও বুঝতে পারল, বিডিআরের সেনারা তাদের কথামতো চলবে না, তারা কমান্ডারদের হুকুমেই চলছে।

সারা দিন শহরে গোলাগুলি আর চরম বিশৃঙ্খলা চলল। নানাজনের টেলিফোন আসতে লাগল তারা আতঙ্কিত বলে। যত দূর সম্ভব আমি তাদের সাহস ও ভরসা দিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু বাস্তবে কিছুই করতে পারছি না। আমার প্রায়োরিটি হলো, বিডিআরের লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। কেউ যেন সেনাদের পক্ষে চলে না যায়। এখনো তারা চমৎকার শৃঙ্খলা ও আনুগত্য দেখিয়ে আসছে। কিন্তু তবু আশঙ্কা, কখন কে উত্তেজনাকর কিছু করে বসে। খুবই নাজুক পরিস্থিতি, সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনো ধরনের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে তার পাল্টা পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। গুজবভিত্তিক একটা ইস্যু সৃষ্টি হয়ে যাবে। শহরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের, কিন্তু তারাও যোগ দিয়েছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সেনাদের সঙ্গে। ডিসি ও অ্যাডিশনাল এসপি বা তাঁদের সহকর্মী কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না যে যৌথ কোনো উদ্যোগ নেব। এদিকে রাত যতই বাড়ছে, ততই বাড়ছে গোলাগুলির শব্দ। রাত ১১টার দিকে বাসায় যাব বলে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় হাবিলদার মেজরসহ কয়েকজন এসে ধরলেন, বাসায় যেন না যাই। বললেন, 'স্যার, আজকের রাতটা আমাদের সঙ্গে কাটান (অর্থাৎ বিডিআর লাইনে)। বলা যায় না, কে কখন কী করে বসে।'

আমি রাজি হলাম না। বললাম, তোমরা থাকতে আমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না—এ বিশ্বাস আমার আছে।

বাসায় এসে সবে খেতে বসেছি, এমন সময় গার্ড কমান্ডার ছুটে এসে খবর দিলেন, ট্রাকে একদল সেনা এসেছে, তারা ঢুকতে চায়। গার্ডরা তাদের ঢুকতে দেয়নি। গার্ড কমান্ডার বলেছেন, স্যার হুকুম দিলে তবে ভেতরে যাওয়া যাবে। বললাম, তাদের নেতাদের একজন বা দুজন আসতে পারে।

তাকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল, এমন পরিস্থিতিতে সে কী করবে। গেটে (যা প্রায় ৫০ গজ দূরে) ফিরে গিয়ে গার্ড কমান্ডার যখন বললেন, 'আপনারা দুজন যেতে পারেন। তবে হাতিয়ার রেখে যেতে হবে,' তখন তারা বিডিআর গার্ডের অমন শক্ত অবস্থান দেখে কেবল কতক্ষণ বাদানুবাদ করে গেটের সামনে থেকেই সবাই চলে গেল। বাসার ভেতরে যে টেলিফোন অ্যাটেন্ড করত, সে জানাল, অনেকবার আর্মির কয়েকজন টেলিফোন করেছে, আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে এবং না পেয়ে গালাগালি করে লাইন ছেড়ে দিয়েছে।

সে রাতে ঘুমাতে পারিনি। সারাক্ষণ গোলাগুলির শব্দ। পরের দিন খুব সকালেই অফিসে গেলাম। দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতায় মন ভরে উঠেছে।

বিডিআর লাইনে আসতেই হাবিলদার মেজর আবুল কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আমার অফিসে ঢুকলেন। এবার খুবই কাঁচুমাচু ও বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'স্যার, কয়েক দিনের জন্য র‍্যাংকের ব্যাজটা না লাগালে ভালো হতো। আর্মির লোকেরা র‍্যাংক পরা দেখলে নাজেহাল করে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ ঘটনার কিছুদিন আগে আমি লে. কর্নেল পদে উন্নীত হই।

বললাম, আমি তো তোমাদের কমান্ডার, আর এই র‍্যাংকই তার পরিচয়। আমি যদি র‍্যাংক খুলে ফেলি, তাহলে আর তোমাদের কমান্ডার থাকব না। একবার খুললে আর কোনো দিন পরব না। আরও বললাম, তোমরা থাকতে তোমাদের কমান্ডারকে কেউ অসম্মান করতে পারবে না, সে আস্থা আমার আছে।

অনেকটা বিব্রত হয়েই তিনি ফিরে গেলেন।

সে সময় দিনাজপুরে আমরা তিনজন আর্মি থেকে বিডিআরে নিযুক্ত ছিলাম। সেখানে বিডিআরের নেতৃস্থানীয় যাঁরা আমাদের সহকর্মী ছিলেন, তাঁরাও একই রকম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সবাই শহরের নানা ঘটনার কথা যতই শুনছেন, তত বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। ওই রাতে সেনারা কোনো কোনো দোকানে ঢুকে জিনিসপত্র লুট করেছে। এমনকি কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের নিয়ে টানাহেঁচড়া করার খবরও পেলাম। একজন নিজেকে ক্যাপ্টেন পরিচয় দিয়ে স্কুলপড়ুয়া এক মেয়েকে জোর করে বিয়ে করেছে—পেলাম এমন খবরও (কিছুদিন পর সেই মেয়ের বাবা এসে আমাদের জানান, তাঁদের বাসা থেকে ক্যাপ্টেনের ইউনিফরম, একটি পিস্তল ও কয়েক শ গুলি উদ্ধার করা হয়। সেই সেনাসদস্য ধরা পড়ে এবং তার কোর্ট মার্শাল হয়)। এসব কারণে শহরময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে থাকে। এমনটা

নাকি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে, যখন পাকিস্তানি বাহিনী দিনাজপুর পুনর্দখল করতে আসে। কিছু ঘটনার বিবরণ শুনে ভীষণ রকম ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার শহরের নৈরাজ্য থামাতে কিছু একটা করতে হবে। শহরের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সরাসরি আমাদের ওপর না বর্তালেও এমন পরিস্থিতিতে জনসাধারণের জানমাল রক্ষা করা অবশ্যকরণীয় হয়ে পড়েছে। স্থির করলাম, মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে এবার বিডিআরের সদস্যদের নামাব। লক্ষ্য স্থির করে বিডিআরের সবাইকে দরবারে সমবেত করে আবার তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। বিডিআরের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবার-পরিজনসহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছিল। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, গত রাতে গোলাগুলির শব্দ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তারা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘুমাতে পেরেছিল কি না। উত্তরে দু-একজন যা শোনাল, তাতে আর চুপ করে থাকার অবকাশ পাওয়া গেল না। এই যদি হয় তাদের অবস্থা, তাহলে শহরের সাধারণ বাসিন্দাদের অবস্থা যে কী করুণ, সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বললাম, দেশকে পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আপনারাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলেন। দেশ এখন স্বাধীন। এখন আর পাকিস্তানিরা নেই। তাহলে হানাদার বাহিনীর মতো কেউ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নিরীহ জনসাধারণকে আতঙ্কিত করে তুললে কি আপনারা চুপ করে থাকবেন? একজন জানালেন, কাঞ্চন নদ পার হয়ে বহু পরিবার গত রাতেই গ্রামে চলে গেছে। বললাম, সেনাবাহিনীর বিপথগামী একটি অংশ দুর্বৃত্ত শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে, তা বন্ধ না করলে অবস্থা আরও খারাপ হবে। পুলিশেরও একটি অংশ তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। যদিও তাদের অন্য একটি অংশ নিষ্ক্রিয়। এ অবস্থায় আমরা চুপচাপ বসে থাকলে জানমালের আরও ক্ষতি হবে। মানুষজন আরও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে। দেশের সীমান্ত রক্ষা করা, শত্রুর হাত থেকে জনগণের জানমাল রক্ষা করা এবং তারা যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করার জন্যই আমরা সবাই ইউনিফরম পরেছি। এই পবিত্র দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে। কিছুক্ষণ এ ধরনের কথা আমাকে বলতে হলো। সবার মুখেই উদ্বেগ, আতঙ্ক ও ক্ষোভ। কেউ কেউ যে ক্ষিপ্ত, তাতে সন্দেহ ছিল না। একজন নায়েক হাতে স্টেনগান ধরে এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার, আপনি হুকুম করেন, ওদের লাশ ফেলে দেব। দিনাজপুর শহর ওদের হাত থেকে মুক্ত করব।' আরেকজন গালি দিয়ে বলে উঠল,

দেশের শত্রু। ওদের নির্মূল না করে ছাড়ব না। আপনি শুধু হুকুম করুন কী করতে হবে।' বুঝতে পারলাম, ওদের অপকর্মে সবাই রাগান্বিত। আমার মনোবল আরও বেড়ে গেল। কিছু একটা করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রেরণা বেড়ে গেল।

উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার সৃষ্টিকারীদের দিনাজপুর থেকে বের করতে হবে, তবে সেটা করতে হবে সুকৌশলে। অফিসার ও জেসিওদের (সুবেদার ও নায়েব সুবেদারেরা) নিয়ে বসলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই রাত থেকেই দুটি টহল বা পেট্রোল বাহিনী বা ট্রুপ বের করা হবে। প্রতিটি বাহিনী বা ট্রুপে একজন জেসিওর নেতৃত্বে পাঁচ থেকে ছয়জন সেনা থাকবে। তারা পিকআপ ভ্যানে করে সারা শহর টহল দেবে ও মাইকে সেনাদের যার যার কর্মস্থলে চলে যাওয়ার ঘোষণা দেবে। এ-ও বলতে হবে, যোগদান না করলে তারা চাকরিচ্যুত হতে পারে। মেজর সলিমুল্লাহ তাঁর উইংয়ের দুজন ভালো জেসিওকে এ কাজে লাগালেন এবং নিজে তদারকির দায়িত্ব নিলেন। রাত ১০টার মধ্যে পেট্রোলিং শুরু হয়ে গেল। পাশাপাশি চলতে লাগল মাইকেও ঘোষণা। প্রথম দিকে ব্যাপারটা বলল কিছুটা নরম সুরে অনুরোধের ভাষায়। পিকআপ ভ্যানের সামনে মেশিনগান লাগিয়ে পুরো যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত বিডিআর বাহিনীর টহলে দারুণ সুফল দেখা যেতে লাগল। এতে প্রধানত দুটো কাজ হলো। প্রথমত, উচ্ছৃঙ্খল সেনাদের মধ্যে ভয় ঢোকানো গেল; দ্বিতীয়ত, নগরবাসীর মনে সাহসের সঞ্চার হলো। ব্যাপারটা তাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রশমনের সহায়ক হলো। মেজর সলিমুল্লাহর জেসিও দুজন প্রশংসনীয় কাজ করলেন। একজনের কথা আমার খুব মনে পড়ে। তিনি সুবেদার মমতাজ। কৌশলে সেনাদের তিন-চারজনের কয়েকটি দলকে ওই রাতেই বিভিন্ন জায়গা থেকে পিকআপে তুলে দিনাজপুরের অদূরে চৌরাস্তায় (যা দশমাইল নামে পরিচিত) পাঠাতে সক্ষম হন। এ সময় মেজর সলিমুল্লাহও বসে ছিলেন না। তিনি জিপে টহলরত অবস্থায় তাদের কয়েকজনকে ধরে ফেলেন। একজনকে তো হাত-পা বেঁধে সোজা আমার বাসায় নিয়ে আসেন। সে রাইফেলসহ এক বাসায় ঢুকে পড়েছিল। তাকে রাতেই নিকটবর্তী সীমান্ত বিওপি খানপুরে হেফাজতে রাখতে পাঠানো হলো। পরের দিন সকাল থেকে, অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টির তৃতীয় দিনে বিডিআরের পেট্রোলিং আরও জোরদার করা হলো। ফলে আরও বেশি সুফল পাওয়া গেল। সেদিন বিকেলের মধ্যে সেনাদের অনেকেই দিনাজপুর ছেড়ে চলে যায়। ক্রমেই অবস্থার উন্নতি হতে থাকে।

এবার মনোযোগ দিলাম কী করে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে বহাল করা যায়। পুলিশের প্রায় সবাই অস্ত্রসহ কর্মস্থল ছেড়ে সেনাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। খোঁজাখুঁজি করার পর অবশেষে জেলা প্রশাসককে পাওয়া গেল। তিনি সস্ত্রীক ঠাকুরগাঁওয়ে বিডিআরেরই এক অফিসারের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁকে অভয় দিয়ে অফিসে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। শহরে মাইকিং করে অবিলম্বে সব পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কাজে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলো। বলা হলো, সবাইকে পরের দিন (চতুর্থ দিন) সকাল ১০টায় ডিসি অফিসের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে। আহূত সেই সমাবেশে ডিসি, ভারপ্রাপ্ত এসপিসহ প্রায় সবাই উপস্থিত হলেন। অস্ত্রসহ পুলিশের যেসব সদস্য বের হয়ে পড়েছিল, তারা অস্ত্র জমা দিয়ে কাজে যোগ দেয়। আমি সংক্ষিপ্ত ভাষণে সবাইকে আবারও কাজে যোগ দিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানালাম। এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি অতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করে শহরে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় সবাই স্বস্তি প্রকাশ করলেন। সে সময় দিনাজপুরের বাসিন্দামাত্রই বিডিআরের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। দিনাজপুর পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং পৌরসভার পক্ষ থেকে আমাদের আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানানোর প্রস্তাব করলেন। আমি অবশ্য সে প্রস্তাবে সম্মত হইনি এই বলে যে আমরা আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছি, সেটাই যথেষ্ট। পরে তিনি বিডিআর-প্রধানকে প্রশংসামূলক একটি চিঠি পাঠিয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ছাড়া আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের নভেম্বরের ওই দিনগুলোয় দিনাজপুর শহরে সৈয়দপুর ও রংপুর থেকে আসা উচ্ছৃঙ্খল সেনাদের সৃষ্ট অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল বিডিআর সদস্যদের শৃঙ্খলাবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, সর্বোপরি কমান্ড কন্ট্রোলের প্রতি তাদের সার্বক্ষণিক আনুগত্য বজায় রাখার কারণে। উত্তেজক মিথ্যা প্ররোচনা সত্ত্বেও বিডিআরের একজন সেনাসদস্যও সে সময় বিপথগামী হয়নি। সেনারা যেখানে রাইফেল থেকে অযথা হাজার হাজার গুলি ছুড়ে অপচয় করেছে, সেখানে বিডিআরের কেউ একটি গুলিও ছোড়েনি। সবাই তাদের নিজ নিজ কমান্ডারকে মেনে চলেছে। উচ্ছৃঙ্খল সেনারা কোথাও কোনো বিডিআর সেনাকে তাদের সঙ্গে নিতে পারেনি।

রংপুরের বিডিআর লাইন ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গেই ছিল। সেখানে প্রায় অধিকাংশ ইউনিটের সেনারা যার যার লাইন ছেড়ে অস্ত্র ও গোলাগুলি নিয়ে বের হয়ে পড়ে। শহর ও আশপাশের এলাকায় ঘুরে বেড়ায়, শূন্যে হাজার হাজার রাউন্ড গুলি ছুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এভাবে শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ে, কেউ তাদের কমান্ডিং অফিসারদের মান্য করেনি। যে অবস্থা ঢাকায় সৃষ্টি হয়েছিল, এখানেও অনেকটা সে রকম কিছুই হয়েছিল। তবে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। এমন অবস্থা টানা তিন-চার দিন ধরে চলে। ঢাকা থেকে কর্নেল মান্নাফ (পরে মেজর জেনারেল) এসে ব্রিগেডের দায়িত্ব গ্রহণ করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিডিআরের সেনারা সেদিন কমান্ড কন্ট্রোল ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এক সাহসী ও অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তাদের কমান্ডার হিসেবে আমার প্রতিও তারা আস্থা ও দৃঢ় আনুগত্যসহ যে আন্তরিকতা প্রকাশ করেছিল, তা আমাকে যেমন বিমোহিত করেছে, তেমনি দায়িত্ব পালনে অফুরন্ত সাহস ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে। সে সময় আমার সহকর্মী সেনা অফিসাররা সর্বক্ষণ আমার পাশে থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ৮ উইংয়ের তৎকালীন কমান্ডার মেজর সলিমুল্লাহর (পরে লে. কর্নেল হিসেবে স্বেচ্ছায় অবসর নেন) কথা আমি বিশেষভাবে স্মরণ করে থাকি তাঁর সাহসী ও সুকৌশলী ভূমিকার জন্য। বিডিআরের প্রবীণ সদস্যরা, বিশেষ করে জেসিওরা তাঁদের অধীনদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। বিডিআরে আমার দায়িত্ব পালনকালের এটি ছিল এক চিরস্মরণযোগ্য অভিজ্ঞতা।

দিনাজপুরে মার্শাল লর দায়িত্ব

নভেম্বরের ওই ঘটনার পর আমার ওপর এক বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ে। ক্যু ও কাউন্টার ক্যুর মধ্য দিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের শক্তিধর ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে সামরিক শাসনব্যবস্থা সুসংগঠিত করেন। তিনি রংপুর ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল আবদুল মান্নাফকে সে অঞ্চলের জোনাল মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করেন। প্রতি জেলাতেই মার্শাল লর দায়িত্বে একজন লে. কর্নেলকে নিয়োগ করা হয়। দিনাজপুরের জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়। সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্বের বাইরে সীমিত পর্যায়ে আমাকে কিছু কাজ করতে হয়। সেই সুবাদে জেলার বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা বজায় রাখতে হয়। এ কাজ করতে গিয়ে প্রশাসনের আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে মনোযোগ দিতে হলো। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের নানা সমস্যা ও

অভাব-অভিযোগ শোনার ও জানার সৃষ্টি হলো একক অপূর্ব সুযোগ। অভিযোগের যেমন শেষ নেই, তেমনি শোনার ও সমাধানের পথও নেই বললেই চলে। প্রচলিত থানা-কোর্ট-কাচারির মাধ্যমে অভিযোগের সুরাহা করার পথ ও প্রক্রিয়া খুবই জটিল। সে সময় ঊর্ধ্বতন মার্শাল ল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আরও অভিযোগপত্র গ্রহণের একটা ব্যবস্থা করলে শত শত অভিযোগ জমা পড়তে থাকে। দীর্ঘ লাইন দিয়ে মানুষ অভিযোগপত্র জমা দিতে থাকে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধেই তাদের বেশি অভিযোগ। এসব অভিযোগের বেশির ভাগই ছিল ঘুষ গ্রহণ এবং সরকারি অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎ-সম্পর্কিত।

সে সময় দিনাজপুর জেলার আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে বেশ কিছু ঘটনার স্বরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উদ্‌ঘাটনের কাজে লাগতে হয়েছিল। এখানে যে বিডিআর ও পুলিশের একশ্রেণীর সদস্য ডাকাতি ও খুনখারাবির মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত—এমন কিছু ঘটনার কথা জানতে পেরেছিলাম। একবার তেঁতুলিয়া বিওপির সদস্যরা একদল চোরাচালানিকে মালামালসহ ধরে ফেলে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে মামলা না করে তাদেরকে তারা ছেড়ে দেয়। আমার কাছে অভিযোগ এলে আমি সরেজমিনে তদন্তে গেলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের হওয়ার মতো অবস্থা দাঁড়ায়। যাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, তাদের একজন ছিল ডাকাতদলের সর্দার। তাকে আমরা আবার ধরতে সক্ষম হই। জিজ্ঞাসাবাদে সে আমাকে বেশ গর্ব করে বলে, সে কখনো বাংলাদেশে ডাকাতি করে না, ইন্ডিয়ায় করে। চাপাচাপিতে সে অনেক ঘটনাই বলে ফেলে। কয়েক মাস আগে আমরা জানতে পারি, তেঁতুলিয়া সীমান্তের খুব কাছে ভারতীয় এলাকার এক গ্রামে বড় ধরনের ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা নগদ ও অলংকারসহ কয়েক লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়। ভারতীয় সংবাদপত্রে ফলাও করে খবর বের হয়, ডাকাতেরা বাংলাদেশি। ওই সময় বাংলাবান্ধা বিওপিতে আমাদের সঙ্গে বিএসএফ অফিসারদের একটি পতাকা বৈঠক হয়েছিল। আমার মনে আছে, তখন বিএসএফের প্রতিনিধিরা আমাদের এই ডাকাতির কথা জানিয়েছিলেন। বোঝা গেল, এই ডাকাতের কথায় সত্যতা আছে। সে জানায়, ওই ডাকাতি তেঁতুলিয়া থানার ওসি আবদুল আজিজের পরামর্শ ও সক্রিয় সহায়তায় করা হয়েছিল। ওসি নাকি ডাকাতির জন্য একটা স্টেনগানও তাদের দিয়েছিলেন। সাতজনের একটা ডাকাতদলকে রংপুরের ডোমার ও ডিমলা থানা এলাকা থেকে আনা হয়। তারা অস্ত্রসহ আসে এবং তেঁতুলিয়ার নিকটবর্তী একটা গ্রামের এক কৃষকের

বাড়িতে দিনের বেলাটা কাটায়। রাতে ডাকাতির পর তেঁতুলিয়ায় একত্র হয়ে মালামাল ভাগ-বাঁটোয়ারার পর আবারও সে বাড়িতেই তারা থাকে। ওসি ডাকাতির মালামালের বড় অংশ নিয়ে যাওয়ার পর খুব সকালে তিনিই আবার তার থানার পুলিশ নিয়ে ওই বাড়ি ঘেরাও করে তিনটি বন্দুক ও নগদ ৪২ হাজার ভারতীয় রুপিসহ সবাইকে আটক করে ফেলেন। অস্ত্রসহ ডাকাতদল গ্রেপ্তারের ঘটনা তখন সংবাদপত্রে আসে এবং ওসিকে পুরস্কৃত করার কথাও ঘোষণা করা হয়। এই সংবাদ আমিও পত্রিকায় দেখেছি। ধৃত ডাকাতসরদার আরও জানায়, জব্দ তালিকায় তিনটি বন্দুক দেখানো হলেও রুপি দেখানো হয়নি। আমরা অনুসন্ধান করে তার বক্তব্যের অনেকটাই সত্য বলে জানতে পারি। তবে ওই ওসি তখন তেঁতুলিয়ায় ছিলেন না, অন্য জেলায় বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

এ রকম আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ করছি।

দিনাজপুর শহরের এক বাড়িতে চোরাচালানির মাল জমা করা হয়েছে বলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিডিআরের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। তল্লাশি করার পর রাইফেলের কিছু গুলি পাওয়া যায়। ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন ঠাকুরগাঁও পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক পাম্প অপারেটর। জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধী চক্রের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ধরা পড়ে। শোনার পর আমি নিজে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে ডেকে আনি। তিনি আমার কাছে স্বীকার করেন, এক কালে তিনি ডাকাতদলে ছিলেন, এখন ডাকাতি করতে যান না। আর ভবিষ্যতেও যেতে চান না। কিন্তু কখনো কখনো দলের ডাকাতেরা তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে যেতে বাধ্য করে। তাদের সঙ্গে না গেলে তাঁকে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, সে সময় দিনাজপুর শহরে বেশ কয়েকটি ডাকাতির ঘটনা ঘটে এবং কয়েকজন খুন হয়। পুলিশের এসপি জানান, একটি সংঘবদ্ধ দলই এ কাজ করে চলেছে। ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিলে এই পাম্প অপারেটরই খুনি ডাকাতদলকে ধরিয়ে দিতে পারবেন বলে আমাকে আশ্বাস দেন। তবে আমাকে অনুরোধ করেন, যাতে পুলিশের কাউকে তাঁর কথা না জানাই। সব শোনার পর আমি তাঁকে ছেড়ে দিই। আমার তখনকার সহকর্মীরা ব্যাপারটা দেখে অবাক হলেন। রাইফেলের গুলি পাওয়া গেছে যাঁর বাড়িতে, তাঁকে কিনা আমি ছেড়ে দিলাম! আমি তাঁকে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁকে আমার লক্ষ্য সাধনে কাজে লাগাতে পারব বলে আশা করছি বলার পরও তাঁরা যেন মানতে পারলেন না। কেন যে তাঁকে আমি আস্থায় নিলাম, আমি নিজেও তা জানি না।

সপ্তাহ দুয়েক পরের ঘটনা। ডিসেম্বর মাস (১৯৭৬)। সন্ধ্যায় বাসাতেই ছিলাম। এ সময় সেই পাম্প অপারেটরের টেলিফোন পেলাম। জানালেন, খুবই জরুরি একটা বিষয় আমাকে জানাতে তিনি আমার বাসায় এক্ষুনি আসতে চান। দেরি হলে বিপদ ঘটে যাবে। তাঁকে আসতে বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চলে এলেন। জানালেন, ডাকাতদল ক্ষেত্রীপাড়ার খায়রুল আনমের বাসায় ডাকাতি করতে যাচ্ছে; তাঁকেও যেতে বলেছে। তবে তিনি অসুস্থতার বাহানায় সরে থাকছেন। দ্রুত কিছু না করলে অঘটন ঘটে যাবে। তাঁর কথার ধরন দেখে মনে হলো, তিনি মিথ্যা বলছেন না। ব্যবসায়ী আনমকে আমি চিনতাম এবং তাঁর বাসায়ও গিয়েছি। তৎক্ষণাৎ এসপি সাহেবকে টেলিফোন করলাম। কিন্তু তাঁর টেলিফোন এনগেজড, কয়েকবার চেষ্টা করেও পেলাম না। এবার অ্যাডিশনাল এসপিকে রিং করলাম; তাঁর টেলিফোনও এনগেজড। ব্যর্থ হয়ে থানায় টেলিফোন করলাম। সেটাও এনগেজড। কয়েকবার চেষ্টা করে ছেড়ে দিলাম। এবারকার হতে যাওয়া ডাকাতির খবরটা যে সত্যি, তা নিশ্চিত ধরে নিলাম। শুনেছি, পুলিশের সঙ্গে এদের যোগসাজশ থাকে এবং নির্বিঘ্নে যাতে কাজ সারতে পারে, তাই থানা ও পুলিশের টেলিফোন ইচ্ছাকৃতভাবেই এনগেজড রাখা হয়। তাই সম্ভাব্য দুর্ঘটনাস্থলের কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। পরক্ষণেই স্থির করলাম, যেভাবেই হোক ওই পরিবারকে এমন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে আমিই এগিয়ে যাব। এখন সবচেয়ে মূল্যবান হলো সময়। দেখলাম, আমি নিজে বের না হলে অতিদ্রুত সেখানে সাহায্য পৌঁছানো যাবে না এবং বিপদ ঘটে যেতে পারে। আর সময় নষ্ট না করে আমি বিডিআরের ডিউটি করণিককে বললাম, পিকআপে ছয়-সাতজনের একটি পেট্রোল টিম যত দ্রুত সম্ভব আমার বাসায় পাঠিয়ে দিতে। আমার বাসার অবস্থান বিডিআর অফিসের কাছে। ফলে তারা সহজেই জরুরি অবস্থা বুঝতে পারে। পাঁচ-ছয় মিনিটের মধ্যেই কয়েকজন অস্ত্র হাতে দৌড়ে আমার বাসায় পৌঁছে যায়। আমি তৈরি হতে হতে পিকআপ ভ্যানে করে আরও কয়েকজন এসে গেল। এত দ্রুত যে তারা প্রস্তুত হয়ে এসে যাবে, আমি আশা করিনি।

ডিসেম্বর মাস। দিনাজপুরে তখন খুব শীত। ক্ষেত্রীপাড়ার ওই বাসায় পৌঁছাতে ১০ মিনিটও লাগেনি। নীরব-নিঝুম এলাকা। কোথাও কোনো লোকজন নেই। বাসার গেট বন্ধ, ওখানে দাঁড়িয়েই একতলা বাড়ির বারান্দাটা দেখা যায়। মাঝে ছোট মাঠ। কাউকেই দেখা গেল না; কোনো সাড়াশব্দ নেই, সব চুপচাপ। বাড়িতে কোনো লোকজন আছে বলে মনে হলো না। বারান্দায়

লাইট জ্বলছে। পাম্প অপারেটর বলেছিলেন, ডাকাতদের কাছে স্টেনগান ছাড়াও হ্যান্ড গ্রেনেড আছে। তবে তখন নিশ্চিত হতে পারিনি, ডাকাতেরা বাড়িতে ঢুকেছে কি না। একজনকে সাবধানে এক পাশ দিয়ে এগোতে বললাম। সে বাড়ির দরজায় গায়ে চাদর মোড়া একজনকে দেখে ফেলল। তার হাতে স্টেনগান। এবার নিঃসন্দেহ হলাম, ডাকাতেরা ভেতরে। এমন অবস্থায় হুট করে ঢুকে যাওয়া ঠিক হবে না। বাড়ির লোকদের যেমন বিপদের ঝুঁকি রয়েছে, তেমনি ঝুঁকি আছে আমার লোকদেরও। বাসাটার পেছনে যাদের পাঠালাম, তারা পৌঁছার আগেই ডাকাতেরা টের পেয়ে দেয়াল টপকে পালিয়ে গেল। সবকিছুই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটে গেল। এবার বাসায় মালিকের নাম ধরে ডাকতেই শুরু হয়ে গেল চিৎকার আর কান্নাকাটি। তাঁরা ভাবতেই পারেননি, আমরা সেখানে তাঁদের সাহায্যে গিয়েছি। ভদ্রলোক বাসায় ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী তো আমাকে দেখে অবাক। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কেবল বলতে লাগলেন, এমন বিপদে আপনি এখানে কেমন করে এলেন! আপনাকে আল্লাহ ছাড়া কেউ পাঠাননি। বাসায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর একজন শুধু কলেজপড়ুয়া ছাত্র ছাড়া কেউ ছিল না। তাঁকে ডাকাতেরা গলায় ছুরি ধরে আটকে রাখে। ভদ্রমহিলার কাছ থেকে চাবি নিয়ে মাত্র স্টিলের আলমারি খুলে ২২ বোরের রাইফেল ও অলংকারাদি বের করতে যাচ্ছিল, তখনই আমরা উপস্থিত হই। এমন অবস্থায় কখনো পড়িনি, যেন ছোটখাটো একটা অপারেশন। অনেকটা ফিল্মি ঘটনার মতো। প্রায় তরুণ বয়সের এ ঘটনা আমার মনে এখনো মধুর তৃপ্তি ও আনন্দ এনে দেয় এই কারণে যে বিপদের সময় ওই পরিবারটিকে সাহায্য করতে পেরেছিলাম।

একবার মার্শাল ল অফিস থেকে হুকুম এল জেলখানা পরিদর্শন করে রিপোর্ট দিতে হবে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে নিয়ে জেলখানা দেখতে গেলাম। এর আগে সরেজমিনে কখনো জেলখানা দেখার দুর্ভাগ্য হয়নি। ছায়াছবিতে যা দেখেছি, তার সঙ্গে বাস্তবের মিল আছে সামান্যই। সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা, যা এখনো আমার স্মৃতিতে পাকাপাকি গেঁথে আছে। কারাগার যে মর্ত্যের দোজখখানা, তারই কিছু নমুনা দেখে বেশ কিছুদিন বিষণ্নতায় ভুগেছি। ঘুমাতে গেলে চোখের সামনে মানুষগুলোর করুণ চেহারা ভেসে উঠত। স্ত্রী তো আমার অবস্থা দেখে দস্তুরমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। জেলা পর্যায়ের জেলখানাটির সব অংশের খুঁটিনাটি দেখতে প্রায় তিন দিন লেগে যায়। হাজতি আর কয়েদির সংখ্যা ধারণক্ষমতার কয়েক গুণ বেশি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলার পরই একদিন জেলখানা পরিদর্শনে

যাওয়া হয়। ব্রিটিশ আমলের তৈরি দালানগুলোর এখন জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। বড়-ছোট দালানের বিভিন্ন কক্ষে একত্র করা হয়েছে হাজতি-কয়েদিদের। ঠাসাঠাসি করে বসা। যেখানে বসারই জায়গা হয় না, সেখানে সন্ধ্যার আগেই ঢোকানো হয় তাদের। বন্ধ ঘরগুলোয় গরমের দিনে মশার কামড় খেয়ে এরা যে কী দুর্বিষহ অবস্থায় রাত কাটায়, বাইরে থেকে সে সম্পর্কে অনুমান করা একেবারেই অসম্ভব। জেলখানায় যা দেখলাম, এত বছর পর তার সব দিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে কয়েকটা দিক তুলে ধরছি মাত্র।

হাজতি ও দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিদের থাকা, খাওয়া ও তাদের অন্যান্য ব্যাপারে অব্যবস্থাপনা, অবহেলা ও দুর্নীতির বহু অভিযোগ পাওয়া গেল। সেসব অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রমাণও পাওয়া গেল। সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছিলাম মহিলা ওয়ার্ডে গিয়ে। এখানে রয়েছে বিভিন্ন বয়সের জনা পঞ্চাশেক মহিলা। সঙ্গে ১৭-১৮টি শিশু, যাদের বয়স আট-নয় মাস থেকে পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে। বয়স্কাদের আলাদা লাইনে এবং শিশুদের আলাদা লাইনে বসানো হলো। মহিলা ওয়ার্ডেন একধরনের আওয়াজ করতেই তাদের সবাই একটু নড়েচড়ে আবার স্থির হয়ে বসল। আমার কাছে শিশুদের অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল। মনে হলো, এরা যেন মানবসন্তান নয়। তাদের অবস্থা অনেকটা সার্কাসের পোষা জীবজন্তুর মতো। তাদের কারও মুখে সাড়াশব্দ নেই। চেহারায় মলিনতা। গায়ে সামান্য কাপড়। শরীরজুড়ে পুষ্টিহীনতার চিহ্ন। বেশির ভাগ শিশুর গায়ে স্কেভি-জাতীয় চর্মরোগ। তাদের অভিযোগ শোনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কেউ মুখ খোলে না। তাদের প্রশ্ন করা হলেই তারা ওয়ার্ডেনের দিকে তাকায়। বুঝলাম, ওয়ার্ডেনের সামনে তারা কোনো কথা বলার সাহস করছে না। ফলে ওয়ার্ডেনকে এই ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে যেতে বলা হলো। তার অনুপস্থিতিতে তাদের বক্তব্য শুনলাম। তারা জানাল, বাচ্চাদের জন্য দুধের বরাদ্দ আছে, কিন্তু তারা সেটা পায় না। শোয়ার জন্য প্রত্যেকের একটি করে চাদর-জাতীয় বিছানা পাওয়ার কথা, কিন্তু যা দেখছি, তাকে কাপড় বলা যায় না। বহু অভিযোগ। এখন আর সেসবের অনেক কিছুই মনে নেই। সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল তাদের মামলাগত বিষয়টি। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী জানা গেল, বেশির ভাগই সামান্য অপরাধে এখানে পড়ে আছে বছরের পর বছর। কয়েকজন জেলে আছে ছয় থেকে ১৮ মাস, যাদের একবারও আদালতে নেওয়া হয়নি। মহিলাদের বেশির ভাগই বর্ডার ক্রস করার কারণে পুলিশ কিংবা বিডিআরের হাতে আটক হয়েছে। থানা থেকে তাদের জেলে পাঠানো

হয়েছে। তারপর আর খোঁজখবর নেই। তাদের অপরাধের তদন্ত হয়নি, আদালতেও নিয়ে যাওয়া হয়নি। এরা সীমান্ত এলাকার গরিব বাসিন্দা। ওপারে আত্মীয়স্বজন আছে। সীমান্ত অতিক্রম করে সেই সব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তারা দেখা করতে যাওয়ার সময় বা দেখা করে ফিরে আসার সময় ধরা পড়েছে। অফিশিয়াল রেকর্ড খুঁজে দেখা গেল, তাদের অপরাধ চোরাচালান নয়, বেআইনি সীমান্ত অতিক্রম। জেলা প্রশাসক জানালেন, এই অপরাধে কোনো বিচারক এদের দুই-তিন মাসের বেশি সাজা দেবেন না। অথচ ছয় থেকে ১৮ মাসের ওপরে তারা জেলে আছে। পুরুষ ওয়ার্ডে এমন হাজতির সংখ্যা আরও অনেক বেশি। এ ধরনের আরও অনেক সমস্যার কথা জানা গেল। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সম্মিলিত চেষ্টায় কয়েক দিনের মধ্যেই মহিলাদের বেশির ভাগকেই জেল থেকে বের করার ব্যবস্থা করা হলো। পুরুষদেরও অনেকের জামিনের ব্যবস্থা করা হলো কিংবা যাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত হয়নি বা সামান্য কোনো কারণে অনেক দিন ধরে যারা জেলে আছে, তাদেরও ছেড়ে দেওয়া হলো। একবার থানা-পুলিশ যদি কাউকে জেলখানায় পাঠায়, তারপর তাকে সেখান থেকে বের করে আনার পথ যে কত জটিল, সেটা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলাম। প্রায় তিন যুগ পর এখন মনে হচ্ছে, জেলখানার অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতিসহ সেখানকার আইনশৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থাপনাগত পরিস্থিতির উন্নতির চেয়ে অবনতিই হয়েছে বেশি।

আগেই উল্লেখ করেছি, সার্বিকভাবে দিনাজপুর সেক্টরের অধীন বিশাল সীমান্ত এলাকাজুড়ে সেই কালে চোরাচালানগত তৎপরতা তেমন উদ্বেগজনক মাত্রায় ছিল না। তবে হিলি সীমান্তের চোরাচালানের কথা সারা উত্তরবঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। এর অন্যতম কারণ ছিল রেল যোগাযোগের সুব্যবস্থা। হিলি রেলস্টেশনটির পশ্চিম অংশ ঘেঁষে সীমান্তরেখা এঁকেবেঁকে চলে গেছে জনবসতির ভেতর দিয়ে। সেখানকার বাড়িগুলোর কোনটি বাংলাদেশের আর কোনটি ভারতের পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার, সেটা বোঝা বেশ কঠিন। এক কালে যে ছোট্ট শহরটি একই দেশের অন্তর্গত ছিল, সেটা ভাগাভাগি হওয়ার ফলেই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, যা কল্পনা করাও কঠিন। দুটি স্বাধীন দেশের অংশভুক্ত হলেও এখানকার বাসিন্দারা তাদের সামাজিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখেই বসবাস করে চলেছে। দুই দেশেরই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষে এখানে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের নিজ নিজ দেশের আইন প্রয়োগ করা সত্যিই কঠিন। তাদের এমন সহাবস্থানের

কারণে চোরাচালানসহ বেআইনি কর্মকাণ্ডও এখানে চলে আসছে। ট্রেন যোগাযোগ চোরাচালানিদের, বিশেষ করে ছোট চোরাচালানিদের জন্য একটা সুবিধাজনক মাধ্যম হয়ে উঠেছে। হিলি স্টেশনের আশপাশে বহু চেষ্টা চালানোর পরও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করা কখনো কখনো রীতিমতো অসাধ্য হয়ে পড়ত। সে সময় ফুলবাড়ী থেকে বিরামপুর হয়ে গোবিন্দগঞ্জ পর্যন্ত পাকা সড়ক ছিল না। দিনাজপুর থেকে হিলি যেতে হলে ট্রেন ছাড়া অন্য কোনো দ্রুতগতির পরিবহনগত মাধ্যম ছিল না। এই এলাকার একমাত্র বাহন গরুর গাড়ি। শুকনো মৌসুমে ঝুঁকি নিয়ে জিপে চলাচল করা যেত। সীমান্ত এলাকায় গরুর গাড়ি যেমন সাধারণ মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বাহন, তেমনি চোরাচালানিদের জন্যও খুবই সুবিধাজনক বাহন। শুকনো মৌসুমে মাল আনা-নেওয়া ও যাত্রী বহনে এর জুড়ি নেই। সব জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে। ভারতীয় এলাকায় সীমান্ত ঘেঁষে পাকা রাস্তা রয়েছে। এদিক থেকে গরুর গাড়িতে করে ধান নিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো ট্রাকে উঠিয়ে দিতে তেমন একটা সময় লাগে না। উভয় দেশের চোরাচালানিরা খুবই সংঘবদ্ধ এবং তারা সুপরিকল্পনামতো মালামাল এপার-ওপার করে থাকে। সাধারণত এরা ধরা পড়ে না। যারা ধরা পড়ে, তাদের বেশির ভাগই স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা, পেশাদার চোরাচালানি নয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্য নিকটবর্তী বাজারে যায়। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় বাংলাদেশের মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য অনেক বেশি থাকায় একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর জন্য চোরাচালান যেমন লোভনীয় হয়ে উঠেছিল, তেমনি সীমান্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জন্যও তা হয়ে উঠেছিল একটা লাভজনক কিছু। গরিব শ্রেণীর অনেকেই হয়তো মাথায় করে আধা মণ ধান বা শাকসবজি, হাঁস-মুরগি, ডিম ইত্যাদি নিজের দেশের বাজারে না নিয়ে গিয়ে অপর পারের বাজারে বিক্রি করে সেখান থেকেই নিত্যব্যবহার্য পণ্য নিয়ে আসত। এই বেচাকেনায় তাদের লাভ হতো বেশি। বাংলাদেশ থেকে কৃষিপণ্যের বিনিময়ে কাপড়, ওষুধ, গাড়ির যন্ত্রপাতি, মসলা, বিড়িপাতা (পরে নিষিদ্ধ হয়), গরু ইত্যাদি পাচার করা হতো। মোটামুটি চোরাচালানের চিত্র এমনটাই ছিল।

বৃহত্তর দিনাজপুর ও বৃহত্তর রংপুরের কুড়িগ্রাম মহকুমা (এখন জেলা) ছাড়া বাকি অংশের ভৌগোলিক চিত্র ছিল একই ধরনের। সীমান্তে যাতায়াতের বড় সমস্যাই ছিল খারাপ যোগাযোগব্যবস্থা। বিওপিগুলোয় পৌঁছানো খুবই কঠিন ছিল। শুকনো মৌসুমে জিপে করে গেলেও বহু ধকল সহ্য করতে হতো। কাজেই অফিসার পর্যায়ের তদারকি করা কঠিন হয়ে পড়ত। ফলে

বিডিআর সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারটি শিথিল হয়ে পড়ত। এরই সুযোগ নিত বিডিআরের একটি শ্রেণী। তাদের সঙ্গে চোরাচালানিদের একটা যোগসাজশের সুযোগ ঘটত। আবার দেখা যেত, যেসব অঞ্চলে চোরাচালান কম, সেখানে বিডিআর সদস্যদের কেউ কেউ অবৈধ উপার্জনের জন্য অন্যপথ ধরার চেষ্টা করত। সেটা হলো হয়রানি করার পথ। কাউকে কোনো মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে জোরজবরদস্তি করে তার কাছ থেকে অর্থ আদায় করার পথ। আমি দেখেছি, অফিসার পর্যায়ে এলাকায় নিয়মিত জনসংযোগ রক্ষা করতে পারলে এ জাতীয় অপকর্ম রোধ করা যায়। একবার ঠাকুরগাঁও উইংয়ের এক বিওপি কমান্ডারের বিরুদ্ধে জবরদস্তি করে অর্থ আদায়ের অভিযোগ আসে। এ ব্যাপারে উইং কমান্ডারকে তদন্ত করার দায়িত্ব দিলাম। তিনি তদন্ত করে সত্যতা পেলেন না। কিন্তু আমি যে তথ্য পেয়েছিলাম, তাতে অভিযোগের সত্যতা ছিল সন্দেহাতীত। বাধ্য হয়ে আমি নিজেই তদন্তে গেলাম। অভিযোগ ছিল, এক অবস্থাশালী কৃষকের ১০-১২টি হালচাষের গরুসহ তাঁর ছেলেকে বিডিআর ধরে নিয়ে যায় এই বলে যে, সেগুলো চোরাচালান করে আনা হয়েছে। এক দিন পর কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে তারা ছেড়ে দেয়। এ ঘটনা সম্পর্কে এলাকার অনেকেই জানলেও কেউ প্রকাশ করার সাহস পায়নি। বিওপির সবাইকে প্রত্যাহার করে নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়ার পর সহজেই কয়েকজন সাক্ষী পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসাবাদে মূল হোতা তার অপরাধ স্বীকার করে। এমন আচরণের পরিমাণ পুলিশ সদস্যদের মধ্যেই ছিল বেশি। কারণ, তাদের হাতে আইনি বা বেআইনি দুই ধরনের ক্ষমতাই থাকে, সহজেই যার অপব্যবহার করা যায়। এর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম হলো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির অভাব এবং অভিযোগ পেলে গুরুত্বের সঙ্গে তার ত্বরিত নিরপেক্ষ তদন্ত না করার ব্যাপারটি। এ ছাড়া রয়েছে আইনি জটিলতা ও দুর্বল বিচারব্যবস্থা, যা কোনোক্রমেই জনসাধারণ-বান্ধব নয়। এ প্রসঙ্গে ঠাকুরগাঁও থানার তৎকালীন ওসির বিরুদ্ধে জবরদস্তি অর্থ আদায়ের অভিযোগের কথা মনে পড়ে। আবদুর রাজ্জাক নামের এক চাল ব্যবসায়ী মার্শাল ল অফিসে অভিযোগ করলে তাঁকে আসতে বলা হয়। নিজেই অভিযোগ শুনতে চাইলাম। রাজ্জাক কোনো ভূমিকা না করে সোজাসুজিই বললেন, 'স্যার, আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। আমার ব্যবসা শেষ। আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সংসার চালানো আর সম্ভব নয়। আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই।' তবে পরক্ষণেই তিনি বললেন, মরার আগে

সমস্ত ঘটনা জানিয়ে তিনি বিচার চাইতে এসেছেন। বুঝলাম, এই ভদ্রলোক আসলেই পুলিশের অন্যায় আচরণের শিকার হয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। মার্শাল ল জারি করার পরপরই ঠাকুরগাঁও থানার ওসি চাল ও লবণ ব্যবসায়ীদের তালিকা করেন, তাঁদের ওপর বিভিন্ন অঙ্কের চাঁদা ধরে নির্দিষ্ট দিনে তা থানায় গিয়ে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। থানার একজন সোর্স সবাইকে তালিকা অনুযায়ী টাকা দেওয়ার কথা জানিয়ে দেন। রাজ্জাক তাঁর ওপর ধার্য করা টাকা দেওয়ার অসামর্থ্যের কথা জানান। সোর্স কয়েকবার টাকার জন্য তাঁর কাছে যান। কিন্তু প্রতিবারই তিনি তাঁর অসামর্থ্যের কথা জানান। এ পর্যায়ে একদিন সকালে তাঁকে থানায় যাওয়ার জন্য খবর দেওয়া হয়। যাওয়ার পর সারা দিন তাঁকে থানায় আটক রাখা হয়। রাতে শ্যালক ও স্ত্রী খাবার নিয়ে গেলে শ্যালককেও আটক করা হয়। ওসি দুই দিন দুই রাত তাঁকে থানায় আটক রাখলেও কোনো টাকা আদায় করতে পারেননি। তৃতীয় দিনে রাজ্জাককে চোরাচালানের মামলায় জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছয় মাস জেলে থাকার পর বের হয়ে দেখেন, স্ত্রী তাঁকে ছাড়ানোর জন্য দোকানের মজুদ চাল, লবণ, টিনসহ সব মালামাল বিক্রি করে দিয়েছেন। এখন তিনি আর্থিকভাবে চরম দুর্দশায় পতিত। প্রাথমিক তদন্তের পর জেলা দুর্নীতি দমন দপ্তরকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। আদালতে পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং তাঁর কয়েক বছরের জেল হয়।

সে সময়ের সীমান্ত এলাকা

ঠাকুরগাঁও থেকে পঞ্চগড়, নীলফামারী হয়ে লালমনিরহাট (বর্তমানে এই মহকুমাগুলো জেলা) পর্যন্ত সীমান্ত এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একই ধরনের হলেও দেশের অন্য অঞ্চল থেকে ভিন্নতর। হিমালয়ের পাদদেশীয় সমভূমির অংশবিশেষ। ভূমির উচ্চতা বেশি, তবে অধিকাংশই সমতল ও বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি। ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ, হরিপুর, রানীশংকৈল, বালিয়াডাঙ্গি ও আটোয়ারী উপজেলার প্রায় পুরো অঞ্চল ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। পাকিস্তান আমলে ভারত থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে যাঁরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করতে শুরু করেন, এখানকার এসব সীমান্তঘেঁষা অনাবাদি সমতল জমি সশস্ত্র বাহিনীর তেমন সব সদস্যের সঙ্গে বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই সুবাদে সেখানে অনাবাদি জমিতে আবাদ শুরু হয়। তবে পাকা রাস্তা না থাকায় বেশির ভাগ জমিই পড়ে থাকে। বাংলাদেশে বোধ হয় একমাত্র এই অঞ্চলই বড় বড় কৃষিখামার করার উপযোগী। যত দূর জানি, গত দুই দশকে সড়ক

যোগাযোগব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটায় সেখানে অনেক কৃষিখামার গড়ে উঠেছে। এখন নানা কৃষিপণ্য, বিশেষ করে ধান উৎপাদন অনেক বেড়েছে। বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর জেলার উন্নয়নের পথে প্রধান বাধাই ছিল প্রয়োজনীয় সড়ক যোগাযোগের অনুপস্থিতি। ভারত বিভক্তির সময় সড়ক ও রেলপথের বিন্যাস ছিল উত্তরমুখী, অর্থাৎ যোগাযোগ ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার, আসাম ও মেঘালয় প্রদেশগুলোর (এখন ফাইভ সিস্টার) সঙ্গে। কয়েকটি ছোট ছোট নদীও রয়েছে, তা-ও উত্তর থেকে, অর্থাৎ ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকেছে। ফলে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যাতায়াতের জন্য সড়ক যোগাযোগগত ব্যবস্থা আরও দুরূহ ছিল। সীমান্ত ফাঁড়িগুলোর বেশির ভাগের পক্ষেই সড়কপথে যোগাযোগ করা কঠিন ছিল, বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে। কাঁচা রাস্তা ধরে জিপে কোথাও যেতে হলে ঝুঁকি নিয়ে পৌঁছাতে হতো। ওসব জায়গায় রসদ সরবরাহ করা ও ফাঁড়ির সদস্যদের মালপত্র পাঠানোর মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ি। পঞ্চগড় এলাকার সীমান্ত ফাঁড়িগুলো হয়ে পার্শ্ববর্তী বর্তমান নীলফামারী জেলার ফাঁড়িগুলোয় যাওয়া যেত না। কাঁচা রাস্তা থাকলেও নদী পার হওয়া যেত না। চিলাহাটি বিওপিতে যেতে হলে আগে সৈয়দপুর হয়ে নীলফামারী যেতে হতো। তারপর সেখান থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে হতো চিলাহাটি। প্রসঙ্গত, পার্বতীপুর-সৈয়দপুর ব্রডগেজ রেললাইন এখান দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে, যেখান থেকে তা শিলিগুড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। এখানকার বিওপি হয়ে লালমনিরহাট এলাকার পাটগাঁও ও বুড়িমারীর মতো বিওপিগুলোয় যেতে হলে যেতে হতো প্রথমে রংপুর-লালমনিরহাট হয়ে হাতিবান্ধা, তারপর সেখান থেকে যেতে হতো বুড়িমারী। বর্তমানে এদিককার সড়কপথের অনেক উন্নতি হয়েছে, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্রিজ। নীলফামারী ও লালমনিরহাট মহকুমার (এখন জেলা) বিওপিগুলো রংপুরে অবস্থিত উইংয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৭৭ সালে লালমনিরহাটে উইং হেডকোয়ার্টার এবং রংপুরে আলাদা সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হলে সার্বিকভাবে এই অঞ্চলের বিডিআর কমান্ড কন্ট্রোল সহজতর হয়। তখন কুড়িগ্রামের উইংও এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভৌগোলিক দিক থেকে কুড়িগ্রামের চিত্র ভিন্নতর। এই এলাকাকে তিস্তা-ধরলা-যমুনা প্লাবিত অঞ্চল বলা যায়। অধিকাংশ বিওপিতেই যাতায়াত করতে হতো নদীপথে। ভারত থেকে ধরলা ও যমুনা তার শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশে ঢুকেছে কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে। যমুনার অপর পারে রৌমারী উপজেলার লাগোয়া জামালপুর জেলার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা কুড়িগ্রাম উইংয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

অপ্রতুল যোগাযোগ ও যথোপযুক্ত যানবাহনের অভাবে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় চোরাচালান দমন করা দূরের কথা, সীমান্তে বিডিআর বাহিনীর উপস্থিতিও যে কত কঠিন, সেটা উচ্চপর্যায়ের অনেকের পক্ষেই বোঝার কথা নয়। অবশ্য পরবর্তী সময়ে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

যে ধরনের বিরূপ অবস্থা, কখনো কখনো চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিডিআরের সদস্যরা সীমান্ত এলাকায় দায়িত্ব পালন করে থাকেন, সে সম্বন্ধে দেশের প্রশাসনের উচ্চমহলের সঠিক ধারণা থাকা উচিত। বর্তমানে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে (দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় থেকে পরবর্তী বছরগুলোয় যে অবস্থা ছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই মন্তব্য)। পাকিস্তানি আমলে তৎকালীন ইপিআর বাহিনীর প্রতি সরকারের অবহেলা, অবজ্ঞাজনিত নিস্পৃহ ও অতি দুর্বল ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বৈষম্যমূলক আচরণের বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ করেছি। এটা যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি শাসক শ্রেণীর বৈষম্য ও উপেক্ষার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ঢাকায় অবস্থিত ইপিআর বাহিনীকে দেখে বা প্যারেড প্রত্যক্ষ করে যত স্মার্ট ও ফিটফাট মনে হতো, সীমান্তে দায়িত্ব পালনরত সদস্যদের হাল ছিল অন্য রকম। বিওপিগুলোয় থাকার ঘরের বেশির ভাগই ছিল কাঁচা। আর যেগুলো আধা পাকা ছিল, সেগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উইং ও সেক্টর হেডকোয়ার্টারগুলোর বেশির ভাগই ছিল ভাড়া করা বা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওপর। কোথাও কোথাও সরকারি আবাসস্থল থাকলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। অন্তত যেসব জায়গায় আমি গিয়েছি, সেসব জায়গায় অবস্থাটা এ রকমেরই ছিল। আগেই উল্লেখ করেছি, স্বাধীন হওয়ার পরপর সাধারণ বিডিআরের জনবল ছিল অপর্যাপ্ত এবং তার চেয়েও প্রকট ছিল অধিনায়কত্ব করার মতো উপযুক্ত অফিসার শ্রেণীর অপ্রাপ্যতা। অফিসার র‍্যাংক ছাড়াও বিওপি কমান্ডার, কোম্পানি কমান্ডারসহ সুবেদার, হাবিলদার ও নায়েকের মতো বিভিন্ন র‍্যাংকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যাই ছিল বেশি। কাজেই সাধারণ সদস্যরা সংখ্যায় বেশি হলেও প্রভাবশালী পদগুলোর সংখ্যা সর্বক্ষেত্রে কম ছিল। তদারক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাজের জন্য সীমান্ত ফাঁড়িতে অফিসারদের যাতায়াত ছিল প্রায় বিরল ঘটনা, কখনো বা সেটা ছিল প্রতারণারই নামান্তর। সীমান্ত পরিদর্শনে না গিয়ে ভাতা নেওয়া, পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় জায়গায় আনন্দভ্রমণে গিয়ে শিকার করা, খানাপিনা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকাই ছিল তাদের মুখ্য প্রবণতা। আপ্যায়নের খরচপাতি বহন করা এবং তাদের খেদমত করার

দায়িত্ব বর্তায় ইপিআর সদস্যদের ওপর। অনেকে খুবই দক্ষতার সঙ্গে খেদমত করে কমান্ডারদের মন জয় করতেন। আপ্যায়নে কত খরচ হলো এবং কে তা বহন করবে, এ ধরনের প্রশ্ন কোনো পক্ষই করত না। অধস্তনরা এর বিনিময়ে নিজ নিজ এলাকায় বিনা বাধায় কাজ করার সুযোগ পেত, অর্থাৎ সীমান্ত এলাকা চোরাচালানিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হতো। অনেক উইং ও সেক্টরের অফিসাররা বিভিন্ন এলাকা থেকে মাসিক কমিশন পেতেন। বিডিআরের এসব সদস্যের মুখ থেকেই এ কথা শুনেছি (প্রথম দিকে এ জাতীয় কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছি)। স্বাধীনতার আগে চোরাচালান বিষয়ে খুব একটা খবর বের হতো না। এলাকাবাসী চোরাচালানিদের কর্মতৎপরতাকে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মেনে নিত। জাতীয় পর্যায়েও এ নিয়ে তেমন আলোচনা-সমালোচনা চোখে পড়ত না। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চোরাচালান বেড়ে যায় এবং অর্থনীতির ওপর তার প্রতিকূল প্রভাব পড়তে থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে সময়টায় আমি বিডিআর বাহিনীতে যোগ দিই, তখন কিছু কিছু বিওপির পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারকাজ শুরু হয়। কোনো কোনো হেডকোয়ার্টারের নির্মাণকাজেও হাত দেওয়া হয়। তবে অন্যান্য বাহিনীর মতো বিডিআরে ব্যাপক সম্প্রসারণ শুরু হয় ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর থেকে। কয়েকটি নতুন উইংও এ সময় গঠন করা হয়। বিপুলসংখ্যক লোক বিডিআরে ভর্তি হয়। দিনাজপুর সেক্টরে এদের একটি বড় দলের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পড়ে আমার অধিনায়কত্বে। পাকিস্তান আমলেই ঠাকুরগাঁও উইং হেডকোয়ার্টারে ট্রেনিংয়ের জন্য আবাসনের পাশাপাশি সহায়ক আরও কিছু স্থাপনা ছিল। সে সময় অফিসারের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। ফলে বর্ডার ডিউটির পাশাপাশি ট্রেনিংয়ের কাজও চালিয়ে যেতে তেমন অসুবিধা হতো না। লোক ভর্তি নিয়ে যে প্রতারণা, অনিয়ম ও দুর্নীতি চলে, তেমন ঘটনাও নজরে আসতে থাকে। টাকা দিয়ে বা সুপারিশের মাধ্যমে অযোগ্য লোকদের ঢোকানোর চেষ্টা চলে। বিভিন্ন জেলার বিডিআর অফিসাররা ডাক্তারিসহ নানা পরীক্ষার মাধ্যমে শারীরিক যোগ্যতা, শিক্ষা ও অন্যান্য দিক যাচাই করে লোক সংগ্রহ করার পর তাদের ট্রেনিংয়ের জন্য ঠাকুরগাঁও উইংয়ে পাঠাতেন। মেজর এ টি এম এন চৌধুরী (পরে কর্নেল) তখন ঠাকুরগাঁও উইং কমান্ডার। তাঁর সরাসরি দায়িত্বেই এসব ট্রেনিং হতো। তিনি যেমন নীতিবান ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন, তেমনি ছিলেন খুঁত ধরার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। একবার অনুরোধ করলেন নবাগত রিক্রুটদের দেখতে যেতে। গিয়ে দেখি, মাঠে প্রায় দেড় শ

নবাগতের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন আবার পরীক্ষা নেওয়া, রিক্রুটিংয়ের সময়ই তো সব পরীক্ষা করে নেওয়া হয়ে গেছে। জবাবে তিনি বললেন, এদের একটি বড় অংশই একেবারে মূর্খ। কলম ধরতেও জানে না। তাদের বের করতেই এই পরীক্ষা। এমন ২০ জনের মতো ধরা পড়ল, যারা মিথ্যা সার্টিফিকেট দেখিয়ে ভর্তি হয়েছে। আরেক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে প্রায় ৩০ জনকে। এদের শারীরিক পরীক্ষা হবে। দেখা গেল, এদের কেউ প্রতিবন্ধী, কারও হাঁটুতে সমস্যা, কারও গঠন এমনই যে দৌড়ানো দূরের কথা, স্বাভাবিকভাবে হাঁটতেও পারে না। ঢাকা বিডিআর সদর দপ্তরে এদের বিষয়ে জানানো হলে এদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে এরা কীভাবে ভর্তি হলো, তার তদন্ত শুরু হলে হইচই পড়ে যায়। যাঁদের ওপর রিক্রুটিংয়ের দায়িত্ব ছিল, তাঁদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া চলল। আমার দিনাজপুরে থাকার সময়ই রংপুরে আলাদা সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় এবং কুড়িগ্রাম ছাড়া আরেকটি উইং যুক্ত হয়। এর হেডকোয়ার্টার হয় লালমনিরহাটে। ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের উইং নিয়ে দিনাজপুর সেক্টর পুনর্গঠিত হয়। পরে ফুলবাড়ীতে একটি উইং স্থাপিত হয়। তখন থেকে আস্তে আস্তে বিডিআরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৭৭ সালের মধ্যভাগে আমার পোস্টিং হয় সেনাবাহিনীতে। সাড়ে তিন বছর চাকরিরত থেকে অপূর্ব সব অভিজ্ঞতা ও সুমধুর স্মৃতি নিয়ে বিড়িআর ছেড়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

সেনাবাহিনীর মূলধারায়

সেনা সদর দপ্তরে বদলি

১৯৭৭ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে অবস্থিত একটি বিমানবিধ্বংসী আর্টিলারি রেজিমেন্টের (বর্তমানে এডিএ) অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে এই প্রথম সেনাবাহিনীর মূলধারায় যোগ দিলাম। এখানে আমাকে বেশি দিন থাকতে হয়নি। নয় মাসের মাথায় সেনা সদরে বদলি হয়ে চলে আসতে হলো। ১৯৭৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আমি সেনা সদরে যোগ দিই। এখানে দুই বছর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের (এজি) শাখায় পিএস ডিরেক্টরেটে ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করি। পরবর্তী র‍্যাংকে, অর্থাৎ কর্নেল হিসেবে প্রমোশনও হলো সেনা সদরেই। তখন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান (সিএএস)। মেজর জেনারেল এইচ এম এরশাদ উপসেনাপ্রধান (ডিসিএএস)। জেনারেল জিয়া মাঝেমধ্যে সকালের দিকে আসতেন। আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মতো থাকতেন। বেশির ভাগ কাজ পিএসওরাই (প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার) করতেন। উপসেনাপ্রধান খুব একটা কাজ যে করতেন, মনে হতো না। তিনি তখন বাংলাদেশ স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতেন। এখানেই প্রথম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ টপ ব্রাসদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হলো। ডিরেক্টরের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন হলেন অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, ওই পদে তখন ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মইনুল হোসেন চৌধুরী বীর বিক্রম। কিছুদিন পর এ পদেই তিনি মেজর জেনারেল র‍্যাংকে প্রমোশন পান। এ সময়ই প্রথম মেজর

জেনারেল এইচ এম এরশাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। সে বছরের শেষ দিকে তিনি সেনাপ্রধান নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং পদোন্নতি পেয়ে লে. জেনারেল হলেন। আড়াই বছর সেনা সদরে কাজ করার পর ১৯৮০ সালের আগস্টের শেষ দিকে আমার পোস্টিং হলো ঢাকা সেনানিবাসের ৬ স্বতন্ত্র এএ (অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট বা বিমানবিধ্বংসী আর্টিলারি, বর্তমানে এয়ার ডিফেন্স আর্টিলারি ব্রিগেড বা এডিএ ব্রিগেড) আর্টিলারি ব্রিগেডে। এখানেই আমার পরবর্তী, অর্থাৎ ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকে প্রমোশন হলো। উল্লেখ্য, ঢাকায় আরও দুটি স্বতন্ত্র ব্রিগেড ছিল, যার একটি ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড এবং অপরটি ১২ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার্স ব্রিগেড।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার নৃশংস হত্যা ও মেজর জেনারেল মঞ্জুরের ব্যর্থ অভ্যুত্থান

৬ স্বতন্ত্র এএ আর্টিলারি ব্রিগেডের অধীনে তিনটি এএ রেজিমেন্ট ছিল। ঢাকা ছাড়া এর একটি রেজিমেন্ট চট্টগ্রামের ডাবলমুরিংয়ে এবং অপরটি ছিল যশোরে। এই ব্রিগেড সেনা সদরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে একে স্বতন্ত্র ব্রিগেড বলা হতো। এই সুবাদে তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদের সঙ্গে আমার সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ ঘটত। ১৯৮১ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে আমার নেতৃত্বে ৩ রেজিমেন্টের সিওদের (কমান্ডিং অফিসার বা অধিনায়ক) নিয়ে গঠিত পরীক্ষা বোর্ডের আওতায় ব্রিগেডের অফিসারদের প্রমোশন-সংক্রান্ত পরীক্ষা চলছিল। ১৫-১৬ জন অফিসার ক্যাপ্টেন থেকে মেজর পদে উন্নীত হওয়ার পরীক্ষা দিতে ঢাকায় সমবেত হয়েছেন। এই উপলক্ষে চট্টগ্রামের রেজিমেন্টের সিও লে. কর্নেল মুনিরুজ্জামানও এসেছেন (পরে ব্রিগেডিয়ার হয়ে অবসরে যান, প্রয়াত)। তিনি ২৯ মে সকালে আমার সঙ্গে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা নিয়ে আলাপ করতে চাইলেন। তাঁকে নিয়ে অফিসে একান্তে বসলাম। তিনি জানালেন, সেখানে অফিসার মহলে নানা রকম কানাঘুষা চলছে। ভেতরে ভেতরে একধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে। অন্যান্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট আসা-যাওয়া বেড়ে গেছে। তাঁদের ঘন ঘন ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে যাতায়াত ও গতিবিধি রীতিমতো সন্দেহজনক। মুনিরের কথা শুনে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের এমন অবস্থা আমার কাছে খুবই গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হলো। তিনি আরও জানালেন, গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এদিকে নজর রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু জিওসি

গোয়েন্দা সংস্থার অফিসারদের ক্যান্টনমেন্টে ঢোকা নিষিদ্ধ করেছেন বলে শুনেছেন। কমান্ডার হিসেবে তাঁকে পথনির্দেশমূলক কিছু আদেশ-উপদেশ দিলাম। বললাম, যেন খুবই সতর্ক থাকেন ও ক্যান্টনমেন্টে চলমান কার্যকলাপ সম্পর্কে খবরাখবর রাখেন। সেখানে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটলে বা গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তিনি যেন দ্রুত জানতে পারেন এবং তার মোকাবিলায় প্রস্তুত হতে পারেন। এ-ও বলে এলাম, যা কিছু ঘটুক না কেন, তা যেন আমাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানান। আরেকটি বিষয় তাঁকে বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিলাম, তাঁর অধীন রেজিমেন্ট আমার কমান্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং আমার ব্রিগেড সেনাপ্রধানের কমান্ডের আওতায়। তাঁকে এই চেইন অব কমান্ডে আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। সংকটময় পরিস্থিতিতে আগাম তথ্য পেলে সেটা যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়ক হয়, সে অভিজ্ঞতা ছিল বলেই কথাগুলো বলেছিলাম। বলেছিলাম ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে সংঘটিত দিনাজপুরের ঘটনার কথা মনে রেখেই।

তখন ভাবতেও পারিনি, মুনিরের বর্ণিত লক্ষণ ও আশঙ্কা এত দ্রুত বাস্তব রূপ নেবে। ২৯ মে রাতেই লে. কর্নেল মুনির ট্রেনে ঢাকা থেকে রওনা হন এবং ৩০ মে সকালেই চট্টগ্রামে পৌঁছে যান। পরের দিন, অর্থাৎ ৩১ মে খুব সকালে টেলিফোনের শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। অপর প্রান্তে মুনির। তার গলার স্বরে উদ্বেগের আভাস। আমার টেবিলের ঘড়িতে তখন ভোর পাঁচটা ২২ মিনিট। মুনির বললেন, তাঁকে কয়েক মিনিট আগে জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুর টেলিফোন করে বলেছেন, রাতে কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। এ নিয়ে তিনি সকাল আটটায় মিটিং ডেকেছেন। তাঁকে (মুনির) সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে। জিওসি আরও নির্দেশ দেন, রেজিমেন্টের একটি ব্যাটারি (যা বিমানবিধ্বংসী কামানে সজ্জিত) বিমানবন্দরে এবং আরেকটি ব্যাটারি পতেঙ্গায় নদীর মুখে তক্ষুনি যেন তিনি মোতায়েন করেন; পাশাপাশি বিমানবন্দরে সব ধরনের বিমান ওঠানামা বন্ধ করে দেন। তেমনি কর্ণফুলী নদী দিয়ে নৌ-চলাচলও বন্ধ রাখতে হবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের জিওসি ওই রেজিমেন্টকে মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন। ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে আমার নির্দেশ ছাড়া সিও এই আদেশ মেনে কাজ করতে বাধ্য নন। কেবল একান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে এলাকার ঊর্ধ্বতন কমান্ডারের নির্দেশমতো সেনা মোতায়েন করলেও সংশ্লিষ্ট কমান্ডার ও সেনাসদরকে তা জানাতে হবে।

মুনিরের মুখে এসব কথা শুনে বুঝতে পারলাম, বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে। রেজিমেন্টকে তৎক্ষণাৎ স্ট্যান্ড টু (যুদ্ধের প্রস্তুতি)

ব্যবস্থা নিতে এবং সব সদস্য যেন তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেটা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিলাম। এর মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলে তিনি আমাকে যেন জানান। এমন পরিস্থিতিতে সেনা সদর দপ্তরের সঙ্গে অবিলম্বে আমার যোগাযোগ করা জরুরি কর্তব্য বলে মনে করলাম। আমি ধরে নিয়েছিলাম, কোনো মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে, যা সেনা সদরের অপারেশন বিভাগ নিশ্চয়ই জানে। হয়তো তাই সেনা সদরের সবাই অফিসে উপস্থিত আছেন। জরুরি পরিস্থিতিতে সবাইকেই যার যার কর্মস্থানে যোগ দিতে হয়। এত দিন এমনটাই হয়ে আসছিল। মুহূর্ত দেরি না করে সেনা সদরে অপারেশন ডিরেক্টর (ডিএমও) ব্রিগেডিয়ার ওয়াহেদকে (পরে মেজর জেনারেল এবং সিজিএস) তাঁর অফিসে রিং করলাম। টেলিফোন বেজেই চলেছে, কিন্তু কোনো জবাব নেই। এবার চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) মেজর জেনারেল নূরউদ্দীন খানকে (পরে লে. জেনারেল ও সেনাপ্রধান হন) রিং করলাম। সেখানেও কেউ ধরল না। বাধ্য হয়ে এবার সেনাপ্রধানের অফিসে চেষ্টা করলাম। বুঝলাম, সেখানেও কেউ নেই। ভেবেছিলাম, চট্টগ্রামের বিষয়ে আমি ছাড়া আর সবাই জানে। তিন অফিসের টেলিফোন যখন কেউ ধরছে না, তখন নিশ্চিত হলাম, চট্টগ্রামে জিওসি বর্ণিত 'রাতে সংঘটিত কিছু বিশেষ ঘটনা' বা কোনো সামরিক তৎপরতা বিষয়ে সেনা সদরের প্রধান ব্যক্তিদের কেউই অবগত নন।

এবার আমি ডিএমওর বাসায় রিং করতেই ব্রিগেডিয়ার ওয়াহেদ টেলিফোন ধরলেন। কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝলাম, টেলিফোন বাজার শব্দেই তাঁর ঘুম ভাঙল। জানতে চাইলাম, চট্টগ্রামের কোনো খবর জানেন কি না। বললেন, না, তিনি কিছুই জানেন না। এবার আমি যা শুনেছি, সেটা জানাতেই আঁতকে উঠে তিনি বললেন, প্রেসিডেন্ট তো গতকাল চট্টগ্রামে গেছেন এবং সেখানেই আছেন। মারাত্মক কোনো ঘটনা যে ঘটেছে, সে ব্যাপারে এখন আর কোনো সন্দেহ থাকল না। আমার মনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো, তাহলে চট্টগ্রামের জিওসি কি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে ক্যু করে ফেললেন! জানতে চাইলাম, সিজিএস ও চিফকে (সেনাপ্রধান) বিষয়টি আমিই জানাব কি না। তিনিই জানাবেন বলে টেলিফোন ছেড়ে দিলেন। একটু পরই সিজিএসই টেলিফোন করলেন। তাঁকে চট্টগ্রামে সংঘটিত ঘটনার যা শুনেছি, সে সম্পর্কে বললাম। তারপর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় অবস্থিত আমার কমান্ডের ইউনিটকে 'স্ট্যান্ড টু'-এর নির্দেশ দেওয়ার পর নিজে প্রস্তুত হতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেনাপ্রধানের এডিসি রিং করে বললেন, চিফ কথা বলবেন। টেলিফোনে তিনি

বললেন, 'মনজুর, তুমি কী শুনেছ?' আমি যা যা শুনেছি, তাঁকে সবকিছু জানালাম। তিনি শুধু বললেন, 'তুমি আমার অফিসে এখনই চলে এসো।'

সকাল সাড়ে ছয়টায় সেনা সদরে পৌঁছাতেই এডিসি জানালেন, চিফ সিএমএইচে গেছেন ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে বসতে বলে গেছেন। আমি সিজিএসের অফিসে গিয়ে বসলাম। সিজিএস টেলিফোনে ব্যস্ত। তিনি চট্টগ্রামের জিওসির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন। পাশে ডিএমও চট্টগ্রামের ডিভ হেডকোয়ার্টারের কোনো অফিসারের সঙ্গে যেন কথা বলছেন। বুঝতে পারলাম, প্রেসিডেন্ট জিয়া আর বেঁচে নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেনাবাহিনীর কিছু অফিসারের হাতে বাংলাদেশের আরেকজন প্রেসিডেন্ট নিহত হলেন!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপ্রধান এসে গেলেন এবং আমাকেসহ সব পিএসওকে (প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার) তাঁর অফিসেই ডাকলেন। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল নূরউদ্দীন খান, আমজাদ ও মান্নান সিদ্দিকী (সবাই)। এ ছাড়া ছিলেন ডিজিএফআইয়ের প্রধান মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী। অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল (এজি) মেজর জেনারেল মইন একটু পরে এলেন। সেখানে ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকের ছিলাম একমাত্র আমিই। সেনাপ্রধান বললেন, তিনি সিএমএইচে চিকিৎসারত ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারের সঙ্গে দেখা করে এলেন। তাঁকে তিনি এই বলে অভয় দিয়ে এসেছেন যে সেনাবাহিনী তাঁকে সমর্থন করবে। এ-ও বললেন, বিচারপতি সাত্তার খুবই ঘাবড়ে গেছেন। দায়িত্ব নেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। আমার কাছ থেকে শুনতে চাইলেন, আমি কী কী জানতে পেরেছি। আমার জানা সবকিছু সম্পর্কে তাঁকে আবারও বললাম। এবার সেনাপ্রধান প্রশ্ন করলেন, চট্টগ্রামের ঘটনায় কারা জড়িত থাকতে পারে এবং আমাদের ধারণা কী? এই প্রশ্নে সবাই চুপচাপ। সেনাপ্রধান আমার দিকে তাকিয়ে প্রথম আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'মনজুর, তুমি কী মনে করো?'

উত্তরে বললাম, জিওসি যে জড়িত আছেন, তাতে সন্দেহ নেই। ক্যান্টনমেন্টে তাঁর উপস্থিতিতে বা তাঁর অজান্তে অন্য কারও পক্ষে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার অভিযান চালানো অসম্ভব। এবার প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের এখন কী করা উচিত?' এবারও সবাই চুপ। লক্ষ করলাম, একজন পিএসও, যিনি সেনাপ্রধানের ঠিক সামনের টেবিলের বাঁ পাশে বসা, খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কী কী করা উচিত, তার একটা চেক লিস্ট এখনই করে ফেলি।'

শুরু থেকেই তাঁকে যথেষ্ট উৎফুল্ল ও তৎপর মনে হলো। আর কেউ কিছু বলছেন না। এবারও জেনারেল এরশাদ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মনজুর, তুমি কী বলো?'

আমি চট করেই বলে ফেললাম, সংবিধানে যে ব্যবস্থা আছে, তা-ই আমাদের মেনে চলা উচিত। বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন সবাই আরও চুপ হয়ে গেলেন। মনে হলো, আমি যেন একটা ভুল করে ফেলেছি। একটু পর মেজর জেনারেল মান্নান সিদ্দিকী বলে উঠলেন, 'আমি মনজুরের সঙ্গে একমত। আমাদের সংবিধান মতোই কাজ করা উচিত।'

কেউ আর কিছু বললেন না। সেনাপ্রধান স্পিকার সামসুল হুদা চৌধুরীকে টেলিফোনে মেলাতে এডিসিকে বললেন। স্পিকার ঢাকায় ছিলেন না, সম্ভবত তিনি তখন কুমিল্লায়। তবে মিটিং আর চলল না। দু-একজন ছাড়া সবাই বের হয়ে এলাম। আমরা থাকতে থাকতেই সেনাপ্রধান কুমিল্লা ও যশোরের জিওসিদের সঙ্গে কথা বললেন এবং চট্টগ্রাম ছাড়া সব ক্যান্টনমেন্ট যে সেনা সদরের নিয়ন্ত্রণে আছে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন।

সেনাপ্রধানের অফিস থেকে বের হয়ে সিজিএসের অফিসে ঢুকলাম। সেখানে ডিএমও তখনো চট্টগ্রাম ডিভ হেডকোয়ার্টারের কোনো অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওদিক থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃতদেহ আনার জন্য একটি হেলিকপ্টার পাঠাতে বলা হচ্ছিল। সেনা সদর থেকে বের হয়ে বাসায় গেলাম। প্রায় ১১টা বাজে। তখনো কিছু খাইনি। সকালের নাশতা না খেয়েই বের হয়েছিলাম। স্ত্রী উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি কিছুই জানেন না। খেতে খেতেই বললাম, প্রেসিডেন্ট জিয়াকে চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার হত্যা করেছেন। শোনামাত্র স্ত্রী কেঁদেই ফেললেন। সেনাবাহিনীতে এসব কী চলছে বলে অন্য রুমে চলে গেলেন।

নাশতা শেষ করেই ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের পথে রওনা হলাম। ব্রিগেড স্ট্যান্ড টু অবস্থায় আছে। অফিসাররা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের ঘটনা জানাতে হবে। দিতে হবে পরবর্তী নির্দেশ। শহীদ বাসার রোড (আগের স্টাফ রোড) হয়ে এয়ারপোর্ট রোডের ডান দিকে গিয়ে রেললাইন পার হতে হবে এবং আবারও বাঁয়ে ঘুরে পূর্ব দিকের রাস্তা ধরে যেতে হবে। এএ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার সেখানেই। দেখলাম, বিএনপির কিছু নেতা-কর্মী ট্রাকে করে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছেন। ট্রাকগুলোয় ব্যানার লাগানো। বুঝলাম, প্রেসিডেন্ট জিয়া চট্টগ্রাম থেকে ফিরবেন, এ আশায় তাঁরা তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে যাচ্ছেন। আফসোস, তাঁরা তখনো জানেন না যে তিনি

আর জীবিত নেই। সেদিনই আমার কমান্ডের অধীন ঢাকায় অবস্থিত রেজিমেন্টকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোতায়েন করা হলো। অন্যদিকে পুরো ক্যান্টনমেন্টে নেওয়া হলো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। ঢাকাসহ অন্য সব ক্যান্টনমেন্টে চট্টগ্রামের জিওসির পক্ষ থেকে সম্ভাব্য ক্যু মোকাবিলায়ও নেওয়া হলো সর্বাত্মক প্রস্তুতি। ব্রিগেড অফিস থেকে ডাবলমুরিংয়ে কর্নেল মুনিরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। চট্টগ্রামের দিক থেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। মুনিরের রেজিমেন্টের সঙ্গে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। সকালের জিওসির ডাকা মিটিংয়ে তাঁরও উপস্থিত থাকার কথা। বলতে চাচ্ছিলাম, তিনি যেন ডিভ হেডকোয়ার্টারে না যান। সকাল আটটায় চট্টগ্রামে অবস্থিত সেনাবাহিনীর সব ইউনিট এবং প্রতিষ্ঠানের কমান্ডার ও অধিনায়কদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল।

এদিকে বিকেলের (৩১ মে) মধ্যেই বোঝা গেল, বিদ্রোহীদের মূল ঘাঁটি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টেই তাদের প্রতি সমর্থন কমে আসছে। খুব সকালে প্রেসিডেন্ট নিহত হওয়ার সংবাদ রাজধানী ঢাকায় পৌঁছার পরপরই অতি দ্রুত যথাযোগ্য সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ক্যুর সাফল্য সুদূরপরাহত হয়ে পড়ে। মঞ্জুরের সমর্থনে কোনো ক্যান্টনমেন্ট থেকে কেউ সাড়া দেয়নি। আমি চট্টগ্রাম রেজিমেন্ট নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সিও মুনিরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আমার ভয় হচ্ছিল, চাপে পড়ে তিনি আবার অভ্যুত্থানকারীদের পক্ষে এমন কোনো কাজে জড়িয়ে না পড়েন, যার পরিণতি ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। বিকেলে ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যে বিমানবিধ্বংসী রেজিমেন্টটি মোতায়েন করা হয়েছিল, তার পরিদর্শনে গেলাম। সকালে নির্দেশ পাওয়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সিও লে. কর্নেল গিয়াস চৌধুরী মোতায়েনের কাজ সম্পন্ন করে ঢাকা এয়ারপোর্টের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এয়ারপোর্টে পৌঁছাতেই গিয়াস জানান, তাঁরা পতেঙ্গায় মোতায়েন রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ফেলেছেন। সেটা সম্ভব হয় ঢাকা কন্ট্রোল টাওয়ার ও পতেঙ্গা কন্ট্রোল টাওয়ারের বেতার যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে। চট্টগ্রাম থেকে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন থাকলেও কন্ট্রোল টাওয়ারগুলো সচলই ছিল। এ ব্যাপারে সিভিল অ্যাভিয়েশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে থাকেন। ঢাকা কন্ট্রোল টাওয়ারে বসে খবর দিতেই মুনির পতেঙ্গা কন্ট্রোল টাওয়ারে পৌঁছে আমাকে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানালেন।

বললেন, বিমানবন্দর তাঁর নিয়ন্ত্রণে আছে এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটির সবাই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। ঢাকা থেকে যে বিমানটি সকালে অবতরণ করেছিল, সেটাও সেখানেই আছে। বিমানবন্দর প্রায় শূন্য। সামান্য কিছু লোক ছাড়া সবাই চলে গেছে। মুনিরের প্রতি আমার প্রথম ও প্রধান নির্দেশ ছিল তাঁর অধীন রেজিমেন্ট যেন কোনো অবস্থাতেই জিওসির ক্যুর অনুকূল কোনো কার্যক্রমে অংশ না নেয়। তিনি জানান, সকালে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পরপরই তাঁর রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন বাবরই প্রথম জানান, প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন। বাবর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের কাছেই এক বাসায় থাকতেন। শেষ রাতের দিকে গোলাগুলির শব্দ শুনে আশঙ্কা করেন, কোনো মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। সকালের দিকে পরিস্থিতি শান্ত দেখে সার্কিট হাউসের ভেতরে যান। তখন সেনাবাহিনীর কাউকে দেখেননি। সার্কিট হাউসের এক কর্মচারী তাঁকে প্রেসিডেন্টের মৃতদেহ দেখায়। বাবর আরও জানান, নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম এইচ খানও সেখানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় (প্রসঙ্গত, তৎকালীন নৌবাহিনীর প্রধান প্রেসিডেন্টের সঙ্গেই চট্টগ্রামে যান এবং সে রাতে সার্কিট হাউস-লাগোয়া স্থানীয় নৌ বেস কমান্ডারের বাসায় ছিলেন)। মুনির আরও জানান, জিওসির মিটিংয়ের নির্ধারিত সময়ের পর সকাল ১০টার দিকে ক্যান্টনমেন্টে জিওসির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি নিজেই বলেন, প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন।

পরের দিন, অর্থাৎ ১ জুন দুপুরে মুনির আবারও আমার সঙ্গে কন্ট্রোল টাওয়ারের মাধ্যমে চট্টগ্রামের পরিস্থিতি জানালেন। উল্লেখ্য, কুমিল্লার একটি ব্রিগেডকে বিকেলেই চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদের দমন করতে পাঠানো হলে তারা শুভপুর ব্রিজে অবস্থান নেয়। সেদিন বিকেলে জিওসি হালিশহরে আর্টিলারি সেন্টারে যান, ডাবলমুরিংয়ে এএ রেজিমেন্টে আসার কথা বললেও আর আসেননি। সম্ভবত, তিনি সেখানে যাওয়াটাকে নিরাপদ মনে করেননি। সে রাতেই মুনির জানতে পারেন, ক্যান্টনমেন্টে জিওসির পক্ষের শক্তি কমে যাচ্ছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু অফিসার এরই মধ্যে চট্টগ্রাম ছেড়ে শুভপুর ব্রিজ পার হয়ে কুমিল্লা ডিভ থেকে পাঠানো ব্রিগেডে যোগ দেন। তিনি আরও জানান, ডিভ হেডকোয়ার্টার একজন ক্যাপ্টেনের অধীনে এয়ারপোর্টে একটি ইনফ্যান্ট্রি কোম্পানি পাঠালেও তারা নিষ্ক্রিয় থাকে। ডাবলমুরিংয়ের কাছে রেডিও স্টেশনে যে কোম্পানি দায়িত্ব পালন করছিল এবং জেনারেল মঞ্জুরের পক্ষ নিয়ে যারা তাদের নিরাপত্তা রক্ষার কাজ করছিল, তারাও শেষ রাতে চলে যায়। সেদিনই বিকেলে কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে মুনির আমাকে জানালেন,

জিওসি ও তাঁর সহযোগীরা ফটিকছড়ির এক চা-বাগানে ধরা পড়েছেন এবং পুলিশের হেফাজতে আছেন। ২ জুন সেনা সদরে গেলে জানতে পারি, জেনারেল মঞ্জুর নিহত হয়েছেন। সে সময় সংবাদমাধ্যমে তিনি কীভাবে নিহত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। তবে ঢাকা সেনানিবাসে আমার মতো অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে তাঁকে 'ইলিমিনেট' করা হয়েছে (এ নিয়ে একটি হত্যা মামলা এখনো বিচারাধীন)। প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যার কয়েক দিন পর চট্টগ্রামের রেজিমেন্ট পরিদর্শনে গেলে লে. কর্নেল মুনিরসহ কিছু সেনা অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে উল্লিখিত ঘটনার বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পারলাম। ঘটনার দিন মুনির যখন জিওসির সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়ার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে মুনিরকে নানা বিষয়ে কথা বলেন। মুনির একপর্যায়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'Was it that necessory to kill the President?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'It was beyond my control, they have done it but I owned it. I'm responsible for everything'। শেষ পর্যায়ে মুনিরকে তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে তিনি তাকে পবিত্র কোরআন ছুঁইয়ে শপথ করান। কেবল তাকেই নয়, সকালের মিটিংয়ে উপস্থিত সবাইকেই জিওসি পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে বাধ্য করেন। পরে আলাদাভাবে চট্টগ্রামের ডিভিশনাল কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ, নৌ ও বিমানবাহিনীর বেস কমান্ডারকেও একইভাবে তিনি আনুগত্যের শপথ করান। উল্লেখ্য, বিমানবাহিনীর বেস কমান্ডার গ্রুপ ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাঁকে এবং উইং কমান্ডার শমশের আলীকে কিছুক্ষণ ডিভ হেডকোয়ার্টারে বসিয়ে রাখা হয়।

ঘটনার সূত্রপাত সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত যা জানা যায়, তার সারসংক্ষেপ এ রকম : ৩০ মে সকালের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায়, মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজে পোস্টিং করা হয়েছে। সম্ভবত এ খবরই মঞ্জুর ও তাঁর সহযোগীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই মন-বিগড়ানো খবর যে তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ওই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের চট্টগ্রামে উপস্থিতি ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। জিওসি হিসেবে জেনারেল মঞ্জুরের পক্ষে প্রেসিডেন্টকে চট্টগ্রামে হাতের নাগালে পেয়ে তক্ষুনি ক্যু অভিযানে না নামলে হয়তো ভবিষ্যতে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না—এই বিবেচনাই তাঁদেরকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে নিয়ে যায়। কমান্ড অ্যান্ড

স্টাফ কলেজ একটি সামরিক শক্তিবিহীন প্রতিষ্ঠান। এখানে পোস্টিংয়ের অর্থ হলো তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা। উল্লেখ্য, মেজর জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রামের জিওসি হিসেবে সে অঞ্চলে অবস্থিত তাঁর ডিভিশনের বহির্ভূত সব সেনা ইউনিট ও স্থাপনাগুলোকেও (এসবই ছিল শুধু লজিস্টিক বিষয়কে ডিভিশনের অধীনে) তাঁর কমান্ডে চলার জন্য চাপ দিতেন। চাইতেন, সিও (অধিনায়কেরা) ও কমান্ড্যান্টরা তাঁর কথামতো চলুক। তিনি যে সেখানকার একচ্ছত্র কমান্ডার, এমনটাই যেন সবাই ধরে নেন। অনেকেই বাধ্য হয়ে বিরোধ এড়িয়ে চলতে তাঁর কথাই মেনে চলতেন। তবে কেউ কেউ এর সুযোগও নিতেন। যেমন, আমার কমান্ডের অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রামের ডাবলমুরিংয়ে অবস্থিত রেজিমেন্টের ওপর তিনি অযাচিত হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। এতে পূর্বতন সিও আশকারা পেয়ে আমার কিছু নির্দেশ মানতে অনীহা দেখাতে থাকেন। একপর্যায়ে জিওসির সঙ্গে আমার কিছুটা ভুল-বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে মেজর জেনারেল মঞ্জুর সেনা সদরে সিজিএস পদ থেকে চট্টগ্রামে বদলি হওয়াটাকে ভালোভাবে নিতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মঞ্জুর মনে করতেন, ১৯৭৫-এর পর সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠন তথা বর্ধিতকরণ এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে জিয়ার অবস্থান পাকাপোক্ত করতে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। এদিকে সেনাবাহিনীতে তিনি যে সবচেয়ে দক্ষ, যোগ্য ও বুদ্ধিমত্তার বিচারে শ্রেষ্ঠ জেনারেল, অফিসার মহলে, বিশেষ করে জুনিয়রদের মধ্যে এ রকমের একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁকে ঘিরে একটি অতিভক্ত অনুগত সমর্থকগোষ্ঠীও গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, তাঁদের প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধা অফিসার। তাঁদের বড় একটা অংশই মনে করত, মঞ্জুরই একমাত্র যোগ্য জেনারেল, যিনি ভবিষ্যতে সেনাপ্রধান হবেন। প্রথমদিকে তিনি জিওসি হিসেবে তাঁর পোস্টিং স্বল্পকালীন হবে বলে মেনেই নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়া উপসেনাপ্রধান মেজর জেনারেল এইচ এম এরশাদকেই সেনাপ্রধান নিয়োগ করলে তিনি আশাহত হন। যতই দিন যাচ্ছিল, মঞ্জুর ততই অস্থির ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। এই অস্থিরতা বৃদ্ধিতে তাঁর সমর্থকগোষ্ঠীর প্ররোচনাই বেশি কাজ করছিল। শোনা গেছে, এ ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। অফিসারদের তিনি সস্ত্রীক তাঁর বাসায় আসতে শুধু উৎসাহিতই করতেন না, অনেকটা বাধ্যও করতেন। একটি সুনির্দিষ্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী অফিসারদের তাঁর বাসায় একে একে 'কল অন' করতে হতো। অনেকের ইচ্ছা না থাকলেও যেতে হতো। বাসায়

সামাজিকতার বাইরে কথাবার্তার একপর্যায়ে মূল বিষয় হয়ে উঠত প্রেসিডেন্ট জিয়ার সেনাবাহিনীর স্বার্থ উপেক্ষা করা ও দেশ পরিচালনার স্বার্থে তাঁর গ্রহণ করা নানা পদক্ষেপের সমালোচনা করা। চট্টগ্রামে যাওয়ার পর থেকেই তিনি ব্রিগেড কমান্ডারসহ তাঁর পছন্দসই অফিসারদের সেখানে পোস্টিং করাতে থাকেন। শেষ দিকে তিনি ভক্ত-সমর্থকগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির কৌশলের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের রাখঢাক করতেন না।

চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছিল বলে সবকিছুতেই তিনি অগ্রাধিকার পেতে থাকেন। যা চাইতেন, তা-ই আদায় করে নিতে তাঁর কোনো অসুবিধা হতো না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেনাপ্রধানকে উপেক্ষা করে সরাসরি তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতেন। এভাবে এমন একটা সময় এল, যখন সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও লোকবল ইত্যাদির দিক দিয়ে চট্টগ্রাম ডিভিশনের সঙ্গে অন্য ডিভিশনের তুলনাই হতো না। সময় সময় নিজেই গর্বভরে বলতেন, তিনিই সেনাবাহিনীর অর্ধেকের বেশি কমান্ড করেন। সবকিছুতেই অগ্রাধিকার পেয়ে তিনি যে একজন ক্যারিশমেটিক সামরিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠছেন এবং একসময় হুমকি হয়ে দাঁড়াবেন, প্রেসিডেন্ট জিয়া যে সেটা আন্দাজ করেননি, তা নয়। ৩০ মের নৃশংস ঘটনার কয়েক মাস আগে কক্সবাজার ও হাটহাজারীতে সামরিক মহড়া শেষে অফিসারদের সমাবেশে মঞ্জুর যে কোনো ধরনের রাখঢাক ছাড়াই প্রেসিডেন্ট জিয়ার সমালোচনা করেন, সে কথা অনেকের মুখ থেকেই শুনেছি। মাঠপর্যায়ের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে ওপর মহলকে নিয়মিত জানিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের স্থানীয় শাখার প্রধান লে. কর্নেল লাইস চৌধুরী চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্টের জীবনের ওপর হামলা হতে পারে—এই আশঙ্কা করে সেখানে তাঁকে না যাওয়ার বার্তা পাঠান। এমনকি চট্টগ্রামে যাত্রার আগের রাতেও ডিজিএফআইয়ের প্রধান মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী তাঁর সফরসূচি বাতিল করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করেন। বলা বাহুল্য, তিনি মঞ্জুরকে খুবই বিশ্বাস করতেন। সে বিশ্বাসের চরম মূল্যই তাঁকে দিতে হলো।

মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পরিবারসহ মেজর জেনারেল মঞ্জুর (তখন মেজর), মেজর তাহের, মেজর জিয়া উদ্দিন, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী (পরে কর্নেল) প্রমুখ বাঙালি অফিসার মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছেড়ে শিয়ালকোট সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। এই উদ্যোগ ছিল নিঃসন্দেহে তাঁদের দেশপ্রেম,

সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার এক অবিস্মরণীয় অভিব্যক্তি। পরে মুক্তিযুদ্ধেও তিনি বিশেষ অবদান রেখে বীর উত্তম বীরত্ব খেতাব লাভ করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতার লোভ ও অসহিষ্ণুতা তাঁকে এমন অবস্থানে ঠেলে দেয়, প্রেসিডেন্ট জিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের অবস্থানস্থল সার্কিট হাউসের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালানোর জন্য একদল অপরিপক্ব এবং অতি আশকারাপ্রাপ্ত উগ্রপ্রকৃতির অফিসার নিয়োগ করেন। কারও কারও ধারণা, মঞ্জুর প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করতে চাননি। অতিমাত্রার শক্তি (exessive force) প্রয়োগ করে কমান্ডো স্টাইলে যে তীব্রতা ও নৃশংসতার সঙ্গে অপারেশন চালানো হয়েছে, তাতে মনে হয় না যে ক্যু সফল করতে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করা ছাড়া জিওসির মূল পরিকল্পনার কোনো বিকল্প রেখেছিলেন। এমন অপারেশনের নির্মম পরিণতির কথা তাঁর অজানা থাকার নয়। ১৯৭৫ সালে ক্যু করেছিলেন জুনিয়র র‍্যাংকের অফিসাররা। এবারকার ক্যুর নেতৃত্বে ছিলেন ডিভিশনের জিওসি স্বয়ং। এবারের নৃশংসতা প্রথমবারের তুলনায় কম ছিল না। এই হত্যার দায়ভার তাঁকেই বহন করতে হলো। তিনি নিজেই বলেছেন, 'It was beyond my control, they have done it but I owned it. I'm responsible for everything.' তিনি আত্মসমর্পণ না করে সপরিবারে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে আরও কলঙ্কিত করেছেন। পরে তাঁকে যেভাবে হত্যা করা হয়, তা-ও আরেকটি জঘন্য অপরাধের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ইতিহাসে ক্ষমতা ও অর্থবিত্তের লোভে ষড়যন্ত্র, কুচক্র ও হত্যার মতো ধর্মীয় অনুশাসন, আইন, নৈতিকতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সংখ্যা অগণিত। বাংলাদেশের স্বল্প সময়ের ইতিহাসেও তার সংখ্যা একেবারে কম নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পদাতিক ব্রিগেডে এক বছর

রাঙামাটি ব্রিগেড

ছাত্রজীবনে দু-একবার রাঙামাটি ও কাপ্তাই যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেখা বলতে ওই দুই শহরে যাওয়া-আসার পথে এবং কয়েক ঘণ্টা থেকে যতটুকু দেখা যায়, ততটাই ছিল আমার ওই এলাকা দেখার পুঁজি। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সেনাবাহিনীর কাজে এবং ছুটিতে কয়েকবার রাঙামাটি ও কাপ্তাই গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অভ্যন্তরের কয়েকটি জায়গায় যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। সেই প্রথম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অপরূপ পরিবেশ-ঘেরা এই অঞ্চল দেখে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়েছি। তেমনি বিষণ্ন হয়েছি সেখানকার অশান্ত পরিস্থিতির কথা ভেবে। যেখানেই গিয়েছি, কড়া পাহারার মধ্যে চলতে ও থাকতে হয়েছে। সর্বত্রই যেন আতঙ্ক এবং হঠাৎ কোনো অঘটন ঘটার ভয়। অনেক দিন ধরেই ওখানে চাকরি করার প্রবল ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। মহান সৃষ্টিকর্তার কৃপায় একদিন সেই সুযোগ এসে গেল।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যার কয়েক মাস পর রাঙামাটি এলাকার ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে আমার নিয়োগের নির্দেশ হলো। হঠাৎ পোস্টিংয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ঢাকায় যে ব্রিগেডের দায়িত্বে ছিলাম, সেখানে মাত্র ১৪ মাস কাটিয়েছি। আমার আগেরজন এখানে ছিলেন চার বছরেরও বেশি সময়। ব্যক্তিগত কিছু অসুবিধা থাকলেও রাঙামাটির পোস্টিং আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে তোলে।

ক্যারিয়ারের দিক থেকে ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের দায়িত্ব পাওয়া মানেই ভবিষ্যৎ পদোন্নতির সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাওয়া। ঢাকার বাইরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেখানে বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, এমন অঞ্চলের দায়িত্ব পাওয়াকে আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিলাম। আমি সব সময়ই অ্যাকটিভ, অর্থাৎ সক্রিয় দায়িত্ব পালনে উৎসাহী ছিলাম। বিডিআরের চাকরি আমার খুবই পছন্দের ছিল। সারা বছরই কর্মতৎপর থাকার সুযোগ আর দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা আমার কাছে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার। এবারের পোস্টিং আমাকে আবার সেই সুযোগ এনে দিল। এ ছাড়া যে দুটি প্রধান কারণ আমাকে এখানে দায়িত্ব পালনে উৎসাহ জুগিয়েছে, তার একটি হলো এখানে উপজাতীয়দের ঘিরে যে যুদ্ধাবস্থা চলছে, সে অবস্থা থেকে শান্তি স্থাপনের চেষ্টার সুযোগ সৃষ্টিতে নিজেকে নিয়োগ করা। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা ও উপভোগ করার সুযোগ নেওয়া।

১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসে আমি ওই কর্মস্থলে যোগ দিই। চট্টগ্রাম অঞ্চলের জিওসি প্রয়াত মেজর জেনারেল মঞ্জুরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন মেজর জেনারেল মান্নাফ (প্রয়াত)। তিনি চট্টগ্রামের ঘটনার পরপরই এখানকার দায়িত্ব নেন। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় সেই পাকিস্তানের শিয়ালকোট থেকে। তিনি তখন একটি ক্যাভেলরি রেজিমেন্টে ক্যাপ্টেন র‍্যাংকে এবং আমি তখন সবে কমিশন পেয়ে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হয়ে একটি আর্টিলারি রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছি। পরে অবশ্য খারিয়াঁ ক্যান্টনমেন্টে ৬ আরমার্ড ডিভিশনে তিনি জি-টু আর আমি ব্যাটারি কমান্ডার হই। বাংলাদেশে সেনা সদর দপ্তরে তিনি যখন সিজিএস, আমি সে সময় এজি ব্রাঞ্চে ডিরেক্টর। এ ছাড়া ১৯৭৫-এর নভেম্বরে তিনি রংপুর ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে যোগ দিলে আমি তখন দিনাজপুরে বিডিআরের সেক্টর কমান্ডার। এবার সরাসরি তাঁর অধীনে কাজ করার সুযোগ হলো। তিনি বরাবরই একজন পেশাদার অফিসার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারে জিওসির সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনাগুলোর কথা। এই অফিসে বসেই প্রয়াত মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর ব্যর্থ ক্যু পরিচালনা করেছিলেন। আমি কয়েকবার এখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। ব্যবহার ও কথাবার্তায় তিনি খুবই অমায়িক ও বন্ধুসুলভ ছিলেন। জেনারেল মান্নাফ আমাকে তাঁর অধীন একটি ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু আদেশ-উপদেশ দিলে

তিনি জানালেন, আমার জন্য তিনি পার্বত্য এলাকা, উপজাতীয় অধিবাসী, বিদ্রোহী শান্তিবাহিনী এবং চলমান অপারেশন বিষয়ে যথার্থ ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও জিওসির সঙ্গে দেখা করার পরবর্তী কয়েক দিন ব্রিফিং শুনতে হলো। ডিভিশনের কয়েকজন স্টাফ অফিসার নানা বিষয়ে অবহিত করলেন, আমার কাছে যা সামান্যই প্রয়োজনীয় বলে মনে হলো। শান্তিবাহিনীর ইতিহাস, তাদের সংগঠনের বিবরণ এবং কে কোথাকার কমান্ডার ইত্যাদি শুনে নিলাম। শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যে অপারেশন চলছে, তাকে সামরিক ভাষায় বলা হয় কাউন্টার ইনসারজেনসি, সংক্ষেপে সিআই অপারেশন। সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে হত্যাসহ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীকে যথার্থ অর্থেই আখ্যা দেওয়া হয়। আমাদের সেনাবাহিনীতে সে সময় কাউন্টার ইনসারজেনসি বিষয়ে বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণ চালু হয়নি। ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নগুলোকেই মোটামুটি কিছুটা ধারণা দিয়ে অপারেশনের কাজে নামানো হতো। মাঠপর্যায়ে অফিসারদেরও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ছিল না বললেই চলে। সিনিয়র অফিসার শ্রেণীর অবস্থাও তা-ই। সত্যি বলতে কি, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও ছিল শূন্যের কোঠায়। আর্টিলারির অফিসার হওয়ায় আমার ঘাটতি এ ক্ষেত্রে একটু বেশিই। তবে এ দিকগুলো আমাকে মোটেও নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম করেনি। এখানে মূলত সবাই 'অনদি জব ট্রেনিং'-এর ওপরই নির্ভরশীল। আমার দৃঢ় আস্থা ছিল, ব্রিগেডে সশরীরে উপস্থিত থেকে কাজ শুরু করলে সব বিষয়েই জানা হয়ে যাবে। সদিচ্ছা, সৎ সাহস, কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করলে অসফল হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। এমনটাই আমি সব সময় মনে রেখে চলেছি। তবে সবকিছুর ওপর নির্ভর করেছি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার ওপর। এমনই আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে কয়েক দিন পরই আমি রাঙামাটির পথে রওনা হলাম। এর আগে দুবার রাঙামাটি ভ্রমণে গিয়েছি বলে উল্লেখ করেছি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। এবার আমি সেই এলাকারই সামরিক কমান্ডার হিসেবে যাচ্ছি। আসলে যে দায়িত্ব আমি নিতে যাচ্ছি, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার জন্য অসম্ভব চ্যালেঞ্জিং। এখন থেকে এ অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, উপজাতীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, তাদের জীবনধারা ও সমস্যা এবং চলমান অশান্ত পরিস্থিতির মূল কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানার সুযোগ হবে। রাঙামাটি শহরে ঢোকার কয়েক মাইল

আগে রাস্তাটি একটি পাহাড়ের ওপর উঠে গিয়ে আবার তা নিচের দিকে নামতে থাকে। এখান থেকে রাঙামাটি লেকের (একে কাপ্তাই লেকও বলা হয়) একটি অংশ নজরে পড়ল। আমাকে পেয়ে বসল অপূর্ব এক অনুভূতি।

পরের দিন ব্রিগেড স্টাফ অফিসারদের ব্রিফিং শুনলাম। সেখানে বিএম (ব্রিগেড মেজর) হিসেবে পেলাম তরুণ মেধাবী অফিসার মেজর ফজলে ইলাহী আকবরকে (পরে মেজর জেনারেল র‍্যাংকে পদোন্নতি, জিওসি ও সবশেষে সুদানে নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পালনের পর মার্চ ২০০৬-এ বাধ্যতামূলক অবসরে যান)। তাঁর চমৎকার ব্রিফিংয়ে এলাকার শান্তিবাহিনীর তৎপরতা ও চলমান কাউন্টার ইনসারজেনসি অপারেশনসহ সার্বিক বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা হলো। ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিশাল পার্বত্য এলাকা। রাঙামাটি শহরের একটু দক্ষিণ থেকে শুরু করে কাউখালী, উত্তরে নারিয়ারচর, লংগদু ও বরকল উপজেলা এই ব্রিগেডের অপারেশনাল দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তিনটি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন, যথা : ১৫, ১৬ ও ২৮ ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে গঠিত ব্রিগেডের মূল হেডকোয়ার্টার ছিল তখন রাঙামাটির জেলা প্রশাসকের দপ্তর-লাগোয়া একটি ভবনে। এই ব্যাটালিয়নগুলোর কোম্পানি বা প্লাটুন বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্প স্থাপন করে অপারেশনাল দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রতিটি ব্যাটালিয়নের এলাকাকে জোন বলা হতো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার ও ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করে অফিসার ও সেনাসদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিলাম। সিও ও ক্যাম্প কমান্ডাররা যাঁর যাঁর দায়িত্বভুক্ত এলাকা, অপারেশনগত তৎপরতার বিভিন্ন দিক ও পরিস্থিতি বিষয়ে ব্রিফ করলেন। এ সময় আমি সব শ্রেণীর সদস্যের উদ্দেশে দেওয়া আমার বক্তব্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিলাম তাঁদের দায়িত্ব পালনে সঠিক রণকৌশল অবলম্বন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ওপর। সেনাবাহিনীর অভিযান যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে; নিরস্ত্র, নিরীহ উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে নয় এবং উপজাতীয় বাসিন্দারা যে বাংলাদেশের নাগরিক—সর্বক্ষণ এসব কথা মনে রেখে তাঁদের কাজ করতে বললাম। শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনার সময় যাতে উপজাতীয় বাসিন্দারা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা অত্যাচারের শিকার না হয়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে কমান্ডারদের নির্দেশ দিলাম। কোনো কোনো জায়গায় শান্তি রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কিছু লোক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, এ কথা আমি শুনেছি। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে যে কঠোর ব্যবস্থা আমি নেব,

সে কথাও অকপটে বলি। কয়েক মাসের মধ্যে আমি আমার এলাকার নানা বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হয়ে গেলাম এবং কাউন্টার ইনসারজেনসিগত অপারেশন পরিচালনায় নিজেকে সার্বিকভাবে নিয়োজিত করি।

সে সময় পার্বত্য এলাকার কোনো অংশে পৌঁছার পর কারও পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হতো না যে, সেখানে একটা অশান্ত ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে। উপজাতীয় বা আদিবাসী জনগণ, যাদের পাহাড়িও বলা হয়ে থাকে এবং বহিরাগত, অর্থাৎ দেশের সমতল এলাকা থেকে আসা (যারা বাঙালি নামে পরিচিত) অধিবাসীদের মধ্যে যে সম্পর্কের টানাপোড়েন রয়েছে, সেটাও বোঝা যেত। অস্বাভাবিক বিভাজনের লক্ষণগুলো সহজেই নজরে পড়ত। এলাকার বিষয়ে যতই জেনেছি, দেখেছি ও উপলব্ধি করেছি, ততই মনে এই বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে পাহাড়ি জনগণ নানাভাবেই বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্য ব্রিটিশ আমল থেকেই শুরু হয়েছে, যা পাকিস্তান আমল হয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও চলছে। এখানে ১৩টি অনগ্রসর ছোট-বড় সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর বসবাস। অনগ্রসরতা ও বৈষম্য দূর করার চেষ্টা হলেও কখনোই তা যথেষ্ট ছিল না। কোনো সরকারই বৈষম্যগুলো দূর করার ব্যাপারে যেমন আন্তরিক ছিল না, তেমনি যথাযথ ব্যবস্থাও নেয়নি। ব্রিটিশ আমল থেকেই দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কিছু লোক এসে এখানে বসবাস করতে শুরু করে। এদের বেশির ভাগই ব্যবসা ও সরকারি চাকরিসূত্রে আসে। পরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। পাকিস্তান আমল থেকেই বাড়তে থাকে এই সংখ্যা, বিশেষ করে যখন কাপ্তাই বাঁধ ও পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। স্বাধীনতার পর আরও বাড়তে থাকে এই সংখ্যা, সরকার যখন পার্বত্য এলাকায় বাঙালি পুনর্বাসননীতি গ্রহণ করে। প্রথম দফায় কয়েক হাজার বাঙালি পরিবারকে বিভিন্ন অঞ্চলে খাসজমি, অর্থ ও রেশন বরাদ্দ দিয়ে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থা পাহাড়ি জনগণকে আরও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং তাদের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাওয়ার সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর পক্ষে পাহাড়িদের সমর্থন লাভ সহজ হয়ে যায়। সরকারি মহলের উদ্দেশ্য ছিল, সে অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে সরকার-সমর্থক একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা। কিন্তু আমার মনে হতে লাগল, এতে অবস্থার অবনতি হওয়ার পাশাপাশি সুদূরপ্রসারী ক্ষয়ক্ষতির বিস্তৃতি ঘটছে। আমার দায়িত্বভুক্ত এলাকার তেমন কয়েকটি ক্যাম্প পরিদর্শন করলাম, যেখানে প্রথম দফায় পুনর্বাসন করা হয়েছিল।

এগুলো লংগদু উপজেলার আশপাশে, বিশেষ করে লেকের পাড়ে পাড়ে। লক্ষ করলাম, সেনাবাহিনীর ক্যাম্পগুলোও এদের ঘিরেই স্থাপন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অপারেশন চালানোর পাশাপাশি পুনর্বাসনকেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও তাদের একটি প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল।

রাঙামাটি কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরই নির্দেশ এল, সে এলাকায় দ্বিতীয় দফার পুনর্বাসনকাজ শুরু হতে যাচ্ছে। আমার অধীন ব্রিগেডকে পুনর্বাসিত লোকজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। দিন কয়েক পরই জেলা প্রশাসক পুনর্বাসন পরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্যসহ এক বিরাট তালিকা পাঠিয়ে দিলেন। এতে তিনটি এলাকায় নতুন পুনর্বাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। আরও নিরাপত্তাব্যবস্থার খুঁটিনাটি দিক নিয়ে চিন্তাভাবনার পর সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে থাকি। এরই মধ্যে একদিন সকালে খবর পেলাম, বাঙালি সেটেলাররা রাঙামাটি পৌঁছে গেছে এবং ওই দিনই নির্দিষ্ট এলাকায় (সাইটে) তাদের পাঠানো হচ্ছে। পরের দিন ভোরে পূর্বনির্ধারিত একটি কাজে আমি স্পিডবোটে করে লংগদুতে যাচ্ছিলাম। শুভলং চ্যানেল পার হয়ে শুভলং বাজারের পাশ দিয়ে উত্তরমুখী হলাম। তারপর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে জলবেষ্টিত ছোট ছোট পাহাড় পার হয়ে আঁকাবাঁকা নদী (জলপথটি) ধরে চলছিলাম। এ পথেই বেশির ভাগ লঞ্চ ও ছোট ছোট নৌকা লংগদু-রাঙামাটি আসা-যাওয়া করে থাকে। একটু ভেতরে ঢুকতেই বাঁ দিকে পশ্চিমের বড় পাহাড়ের নিচের দিকে প্রায় মাইল খানেক দূরে গাছগাছড়ায় ঘেরা ছোট ছোট পাহাড় নজরে আসামাত্র দেখলাম, সেখানে একটা লঞ্চ ভেড়ানো। অথচ নিরাপত্তাজনিত কারণে সেখানে কোনো লঞ্চ বা নৌকা যাওয়ার কথা নয়। সব নৌযানকেই এদিকে নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করতে হয়। সন্দেহমুক্ত হতে সেখানে পৌঁছে যা দেখলাম, তাতে অবাক না হয়ে পারলাম না। জঙ্গলঘেরা পাহাড়ের কাছে ভেড়ানো সেই লঞ্চ থেকে নামছে মেয়ে-পুরুষ ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। একটু দূরে একই ধরনের পাহাড়ের নিচে আরও দুটি লঞ্চ ভেড়ানো। নেমে ওপরের দিকে উঠতেই নজরে পড়ল ঝোপঝাড়ের ভেতরে এদিকে-সেদিকে পরিবার-পরিজন নিয়ে আরও কয়েকটি দল। মনে হলো, যেন হলিউডের কোনো জঙ্গলকেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চার ছবি দেখছি। ব্যতিক্রম শুধু মানুষগুলো ও তাদের বেশভূষা। নামতেই লোকজন ছুটে এল। তারা তাদের নানা অভিযোগ ও ভোগান্তির কাহিনি বলতে লাগল। কান্নাতেও ভেঙে পড়ল

অনেকে। তারা এমন নির্বাসনতুল্য বসতির কথা ভাবতেই পারেনি। আসল প্রোগ্রাম ছেড়ে এখানে আমাদের প্রায় ঘণ্টা দুই কাটাতে হলো। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের চরম অব্যবস্থা ও গাফিলতির মধ্য দিয়ে এদের এখানে আনা হয়েছে। যে চিত্র পাওয়া গেল, তা খুবই করুণ ও দুঃখজনক। সমন্বয়হীনতা ও পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই এদের জঙ্গলে এনে এভাবে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে আরও সেটেলার আসতে লাগল। এদের আনা হয়েছে দেশের সমতল এলাকার বিভিন্ন জেলা থেকে। তাদের সংগ্রহ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আছেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। আমার ব্রিগেডের অন্য পুনর্বাসন এলাকাগুলোর একটি ছিল নানিয়ারচর উপজেলাসংলগ্ন এলাকায় এবং অন্য একটি ছিল বরকল উপজেলা সদর থেকে উত্তরে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে। তিনটি পুনর্বাসন এলাকারই যোগাযোগের বাহন লঞ্চ, ইঞ্জিনচালিত নৌকা ও ছোট-বড় অন্যান্য ডিঙি নৌকা। তিনটি নতুন এলাকার অদূরেই স্থাপন করতে হলো তিনটি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প। প্রথমটি হলো দীঘলছড়ি পার হয়ে বারবনিয়া নামের পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা জনমানবশূন্য একটি জায়গায়। দ্বিতীয়টি বরকল থানার কর্ণফুলী নদীর উজানে কলাবুনিযা ও ভূষণছড়া নামের দুটি পাহাড়ি এলাকার উভয় পারে। এই অঞ্চলে এর আগে প্রথম দফায় বসতি স্থাপন করা হয়েছিল গোরস্তান নামের একটি জায়গায়। তৃতীয় ক্যাম্পটি স্থাপন করতে হয়েছিল নানিয়ারচর থানার লেকের ধারে নতুন আরেকটি বসতির নিরাপত্তার জন্য। এ থানায় একটি বাঙালি বসতি ছিল আরও ভেতরের দিকে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সিওরা যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গেই নতুন এলাকায় রেকি (রিকনিসেন্স বা সার্ভে) করে নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে ক্যাম্পের স্থান নির্ধারণ করে যাঁর যাঁর এলাকায় সেনা মোতায়েন করেন।

বিস্তীর্ণ এলাকার ঝোপজঙ্গল কেটে শক্ত ঘাঁটি করতে অবশ্য মাস কয়েক লেগে যায়। একেকটি ক্যাম্প স্থাপন করতে যেমন লোকবলের প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় আর্থিক ও অন্যান্য সংগতিরও। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি থাকায় সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপনে ততটা অসুবিধা হয়নি। বেসামরিক প্রশাসনকে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে সেটেলারদের পুনর্বাসন করতে গিয়ে যে বিশাল কর্মকাণ্ডের ধাক্কা সামলাতে হয় ও জটিল অবস্থায় পড়তে হয়, সেটা লক্ষ করার সুযোগ হলো। পাহাড়ি এলাকায় প্রতিকূল সামাজিক ও আবহাওয়াগত পরিবেশ এবং সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নিরস্ত্র পরিবারগুলোর পুনর্বাসনগত ব্যবস্থাদির আয়োজন করা সত্যিই খুব কঠিন কাজ ছিল।

দীর্ঘসূত্রতা, দায়িত্বে নিযুক্তদের অযোগ্যতা, দুর্নীতি, কর্তব্যে অনীহা ইত্যাদি মিলিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এককথায় তা অবর্ণনীয়। এর ফলে যে অসহনীয় যন্ত্রণা ও ভোগান্তি হয়, তার সবটাই ভোগ করতে হয় সেটেলারদের। দেশের অগণিত ভূমিহীনের পক্ষে বিনা মূল্যে জমি ও ভিটা পাওয়ার লোভ এতই প্রবল ছিল যে, কোনো কঠিন ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলার কথা অনেকেই তাদের বিবেচনায় আনেনি। পুনর্বাসনের মূল দায়িত্ব জেলা প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও নিরাপত্তাব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক বিষয়েই সেনা কমান্ডাররা সাহায্য-সহযোগিতা করতে এগিয়ে যেতেন। বেসামরিক প্রশাসনের নানা বিভাগ ও সংস্থার শাখা-প্রশাখাও পুনর্বাসনকাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। এদের কাজের সমন্বয় করার দায়িত্ব ছিল জেলা প্রশাসকের। বাইরের জেলা থেকে আসা লোকজন বাসে করে রাঙামাটি পৌঁছালে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় লঞ্চে চাপিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় তাদের জন্য নির্ধারিত নতুন বসতি এলাকায়। এখানকার সব কটি এলাকাই ছিল পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা। প্রতিটি সেটেলমেন্টেই কিছু প্রাকপ্রস্তুতি গ্রহণ করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। তাই আমার নজরে পড়ল। লঞ্চ থেকে নামার পর পরিবারগুলোকে যদি কোনো এক জায়গায় জড়ো করে দুই-তিন দিনের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে অত দুর্ভোগে তাদের পড়তে হতো না। ছোট ছোট শিশুসহ অনেক পরিবারকেই জঙ্গলে ঝোপঝাড়ের মধ্যে এক ভীতিকর পরিবেশের মধ্যে রাত কাটাতে হয়েছে। সেখানে সাপ ও মশার উপদ্রব ছাড়াও জীবজন্তুর ভয়ও ছিল। অন্য ব্রিগেডের অধীন এলাকাতেও যে এমন কিছু ছিল না, তা নয়। এসব সমস্যার সমাধানে আমাদের অফিসার ও সেনাসদস্যরা যত দূর সম্ভব সাহায্য করেছেন। সেনাবাহিনীর ওয়্যারলেস যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে যেখানে যে অসুবিধা নজরে পড়েছে, তা যথাসম্ভব জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হতো। নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সেনাক্যাম্পের মূল দায়িত্ব হলেও তরুণ অফিসাররা সেটেলারদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন। আমি ভিজিটে গেলে তাদের সমস্যার কথা জানার চেষ্টা করতাম। সিওরাও তা-ই করতেন। মাঝেমধ্যে জেলা প্রশাসককেও আমার সঙ্গে নিয়ে যেতাম, যাতে সমস্যা সমাধানে সুবিধা হয়।

জেলা প্রশাসন থেকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর অফিসারের অধীনে থাকা একটি দলের প্রতিটি সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে অবস্থান করার এবং সেটেলারদের দেখাশোনা করার জন্য নিয়োজিত থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে

সেটা সম্ভব হতো না বলেই ভোগান্তির শিকার হতো ক্যাম্পবাসী। নিয়মিত রেশন প্রদান ও চিকিৎসাব্যবস্থার পাশাপাশি যে ব্যবস্থাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটি ছিল ত্রুটি ও দুর্নীতিতে ভরা, বিশেষ করে জমি বরাদ্দের বিষয়টি। তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সৃষ্টির কারণগুলো নিহিত ছিল এখানেই। প্রতিটি পরিবারকে বসতভিটাসহ পাঁচ একর খাসজমি বরাদ্দ করার দায়িত্ব জেলার রাজস্ব ও ভূমি প্রশাসন কর্তৃপক্ষের। কাজটি যেমন দুরূহ, তেমনি জটিল ও সময়সাপেক্ষ ছিল। জমি নির্ধারণ ও মাপজোখ করে দিতে গিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতো। ভালো জমি পাওয়া নিয়ে চলত নানা ধরনের অপচেষ্টা। বরাদ্দের ব্যাপারটি নিয়ে একশ্রেণীর কর্মচারীর তালবাহানা করার এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার অভিযোগ আসত। কাজেই সেটেলারদের ভূমি বরাদ্দ পেতে অনেক সময় লেগে যেত। তবে এদের অধিকাংশকেই খুব উৎসাহ নিয়ে বাড়ি তৈরি ও ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখতাম। ওই পথে শুভলং হয়ে লংগদু-মাইনিমুখ বা বরকল-ছোট হরিণায় যাতায়াতের সময় এদের কর্মতৎপরতা নজরে পড়ার মতো ছিল। প্রায় সবাই যে পরিশ্রমী ও তৎপর, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রথমেই তাদের ছোট ছোট নৌকা জোগাড় করে নিজেদের যাতায়াত ও পরিবহনের ব্যবস্থা করে নিতে দেখলাম। গাছপালা ও ঝোপঝাড় ইত্যাদি কেটে পাহাড়গুলো পরিষ্কার করে ফেলতেও দেখলাম। দেখলাম, গাছগাছড়া কেটে লাকড়িবোঝাই ছোট ছোট নৌকা নিয়ে তাদের বাজারের দিকে যেতে। দূর থেকে দেখা যেত তাদের কুঁড়েঘরগুলো। ছোট ছেলেমেয়েদের লেকে গোসল করতে বা তাদের কাউকে কাউকে মাছ ধরতে দেখা যেত। পরিবারগুলো এভাবেই গড়ে তুলেছে তাদের বসতি। তবে সব এলাকার চিত্র এক রকমের ছিল না। লেকের কাছাকাছি যারা ভিটা ও জমি পেয়েছে, তাদের সুবিধা হয়েছে বেশি। যে যত ভেতরে, অর্থাৎ লেক থেকে দূরে বা পাহাড়ি এলাকায় ছিল, তাদের জন্য জীবন গড়ার কাজ ততটাই কঠিন ছিল।

তবে সমতল ভূমি থেকে নিয়ে আসা বাঙালিদের দিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে বসতি গড়ার সমস্যা দিন দিন বাড়তেই থাকল। যতই এ অঞ্চলের পরিস্থিতি ও নানা বিষয় খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলাম, ততই আমার মনে হতে লাগল, বাঙালিদের বসিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলের সমস্যা আরও জটিলতর করে তোলা হচ্ছে। এতে পাহাড়ি জনগণকে আরও বৈরী করে তোলা হচ্ছে, শান্তিবাহিনীর প্রতি তাদের সমর্থন বাড়ছে এবং তাদের অপতৎপরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে। নতুন নতুন বসতি স্থাপনের ফলে আরেকটি বড় ধরনের

সুদূরপ্রসারী ক্ষতির যে বিষয়টি আমি তখন থেকেই লক্ষ করে আসছিলাম সেটা হলো, পরিবেশ ধ্বংসের কাজটি। ছোট ছোট পাহাড় ও টিলার নিচে কোথাও ওপরে, লেকের পাড়ে গাছগাছড়া কেটে পরিষ্কার করে প্রতিটি পরিবার নিজ নিজ কুঁড়েঘর তৈরি করে নেয়। যেখানে এই কিছুদিন আগেও দেখেছি জনমানবশূন্য নীরব-নিঝুম বনজঙ্গল, লেকের কোনো কোনো অংশে অতিথি পাখির বিচরণ, পাহাড়ের এখানে-সেখানে হরিণ ও বনমোরগের ছোটাছুটি কিছুদিনের মধ্যেই এ সবকিছু কোথায় উধাও হয়ে গেল মানুষের অবাধ পদচারণে! মানবকুলের ধাক্কায় কোথায় চলে গেল। শান্তিরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্পগুলো গড়ে উঠেছিল বসতিগুলোর কাছেই। নিরাপত্তার প্রয়োজনে এই ক্যাম্পগুলোর আশপাশ থেকে শুরু করে অনেক দূর পর্যন্ত এলাকার গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে রাখা হতো। নৌযানে করে লেকে চলাচল করার সময় বা হেলিকপ্টারে চড়ে পাহাড়ি এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ক্যাম্পগুলোর অবস্থান বের করতে কোনো অসুবিধাই হতো না। চারদিকে সবুজ গাছপালায় ঘেরা কোনো উঁচু টিলা ঘাসপাতাশূন্য হয়ে আছে দেখলেই সেটা যে একটা ক্যাম্প, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেত।

পরিবেশ ধ্বংসে নতুন বসতি স্থাপনের প্রভাব

বাঙালি বসতি বাড়িয়ে পার্বত্য এলাকায় শান্তি স্থাপনের নীতি যে অদূরদর্শী, সংকীর্ণমনা ও বৈষম্যমূলক, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তখনকার অবস্থানগত কারণে আমার এমন মতামত নিতান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়েই থেকে গেছে। সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নের বাইরে নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল না বলে নিজেকে অসহায় মনে করতাম। ঘরোয়া আলোচনায় আমার এই ব্যক্তিগত মতামত বন্ধুমহলে নানা সময়ে যে ব্যক্ত করিনি, তা নয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতিতে মাঝারি ও তৃণমূল পর্যায়ের উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়েছে আমার। তাঁদের মূল ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল বাঙালি বসতি স্থাপনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, পাহাড়িরা জমি হারাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য হারাচ্ছে, সংখ্যায় তারা কমে যাচ্ছে। ফলে শান্তিবাহিনী এই বলে প্রচারণা চালাতে থাকে যে সরকারের নীতি হচ্ছে পাহাড়িদের এই এলাকা থেকে একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। তাদের এমন ধারণা অমূলক ছিল না। আসলেই পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বাঙালিদের বসতি স্থাপন। আমার কখনো মনে হয়নি,

সচেতন পাহাড়ি জনগণের ১ শতাংশও এই নীতি সমর্থন করে। উপজাতীয় জনগণ যে বরাবর বৈষম্যের শিকার, এই অভিযোগ যে নিরেট সত্য, সেটা অস্বীকার করা অমানবিক নিষ্ঠুরতার নামান্তর। আগেই উল্লেখ করেছি, দেশের কোনো সরকারই তাদের সমস্যার সমাধানে বা দাবিদাওয়া পূরণে আন্তরিক ছিল না।

পার্বত্য এলাকার পরিবেশগত ধ্বংসের পরিমাণ এই অঞ্চলে বসবাসকারীদের শান্তি ও সহাবস্থান বিনষ্ট হওয়ার পরিমাণের চেয়ে অনেক গুণ বেশি হবে বলে আমি সে সময় ধারণা করতাম। একদিন হয়তো শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে, কিন্তু পরিবেশ ধ্বংস হলে তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। বলা বাহুল্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট করার কাজটির সূচনা ঘটেছিল জলবিদ্যুতের প্রয়োজনে কৃত্রিম লেক সৃষ্টি করার ফলে। তখন অবশ্য বিশ্বে পরিবেশসচেতনতা ছিল না বললেই চলে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এত যুগ পরও সেই সচেতনতা আমাদের মধ্যে আসেনি। ১৯৮১-৮২ সালে পরিবেশ ধ্বংসের যে দিকগুলো আমার নজরে পড়েছিল, এখন সেটা আরও বেড়ে মনে হয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

সে সময় মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তারা বলতেন, লেক ভরে যাওয়ার নমুনা তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন। মাছের প্রজনন ক্রমেই কমে আসছে। আরও বলতেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে লেকের মৎস্য উৎপাদন ভীষণভাবে কমে যাবে। অন্যদিকে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, বৃষ্টির পানিতে জমির ওপরের অংশ সরে যায় বলে পাহাড়ি এলাকার, বিশেষ করে ঢালু জমির উর্বরতা দ্রুত কমে যাচ্ছে। তাঁদের মতে, ওই এলাকার জমির উর্বরতা থাকে টপ সয়েলের ছয় ইঞ্চির মধ্যে। কয়েক বছরের বৃষ্টিতে এই টপ সয়েল চলে যাবে। ফলে জমির উর্বরতা কমে যাবে।

এ ছাড়া পরিবেশ ধ্বংসের আরও কতগুলো দিক রয়েছে। লেকের চারদিকে বসতি গড়ে ওঠায় বেআইনি মাছ ধরা ও গাছ কাটা বেড়ে যেতে থাকে। পাহাড়ের গাছ কেটে জ্বালানির সংস্থানকারী বসতির লোকজনদের ঠেকিয়ে রাখাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। গাছ ও মাছ বিক্রি করা ইতিমধ্যে অনেকের পেশা হয়ে গেছে। এসবই আড়াই দশক আগেকার কথা। সেখানকার বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা অতিসম্প্রতি সে অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন এমন ঊর্ধ্বতন কিছু অফিসারের মুখ থেকে শুনেছি। শুনেছি, লেকের মাছ পাওয়া এখন দুষ্কর। সংরক্ষিত বনসহ ছোট-বড় বনাঞ্চল ধ্বংসের সুস্পষ্ট দৃশ্য নাকি এখন হেলিকপ্টারে চড়ে একটু

ঘুরলেই নজরে পড়বে। কেউ হয়তো বলতে পারেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সারা দেশেই পরিবেশ ধ্বংসের কাজটি চলছে। কথাটা ঠিক। পার্বত্য অঞ্চলের জলাভূমি, গাছগাছড়া ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ পরিবেশ দেশের একটি বহু মূল্যবান সম্পদবিশেষ। এ সম্পদ রক্ষা করা অন্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে সহজ ছিল। অদূরদর্শী নীতি গ্রহণের ফলে তা সম্ভব হলো না। অথচ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই এলাকাকে পরিণত করা সম্ভব ছিল একটি মৎস্য উৎপাদনকেন্দ্রে; এটি হয়ে উঠতে পারত বনজ সম্পদের লীলাক্ষেত্র। উপরন্তু, এ রকম প্রকৃতিক ভূসৌন্দর্যে ঘেরা এলাকায় গড়ে তোলা যেত একটি মানানসই পর্যটনশিল্প কেন্দ্রও। এ ছাড়া গ্যাসের মতো কিছু ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ আহরণের সম্ভাবনা তো ছিলই। আরও ছিল বৈচিত্র্যময় একটি সুন্দর জাতিগোষ্ঠী, যাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বদলে বৈরী করে তোলা হয়েছে। আদিবাসীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক সৃষ্টির পথে বাধার পর বাধা আসছে। এই বাধাবিঘ্ন হয়তো একদিন দূর হবে।

রাঙামাটি ব্রিগেডে যোগ দেওয়ার তিন মাসের মাথায় প্রথম বড় ধরনের নৃশংস ঘটনার মুখোমুখি হলাম নির্মিতব্য চেঙ্গী ভ্যালি রোড এলাকায়। রাঙামাটি শহরের অদূরে ঢোকার পথে পাহাড়ি নদীর ওপরের পুলটি পার হতেই বাঁ দিকের রাস্তাটি চলে গেছে মহালছড়ি হয়ে খাগড়াছড়ি জেলা শহরে। কেউ এ রাস্তা ধরে অগ্রসর হলে নজরে পড়বে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঘেরা একটি পাহাড়ি অঞ্চল। পাহাড় কেটে, কোথাও নিচু জমি ভরাট করে, কোথাও বা পাহাড়ের ওপর দিয়ে কিংবা গা ঘেঁষে রাস্তা চলে গেছে। বেশির ভাগ রাস্তাই গেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে। এখান থেকে বাঁ দিকে নিচের দিকে তাকালে দেখা যাবে ছোট ছোট পাহাড়, উঁচু-নিচু জমি, ছোট-বড় গাছ ও ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। গাড়িতে চলার সময় মনে হবে, যেন প্লেনে করে যাচ্ছি। কিছুটা এগোলেই ডান দিকে দূরে লেক দেখা যাবে। একে বলা হয় চেঙ্গী ভ্যালি। আমি যখন প্রথম সেখানে যাই, তখন রাস্তার কাজ চলছে। ১৪-১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তা পাকা হয়ে গেছে। সামনে আরও পাঁচ-ছয় কিলোমিটার পাহাড় ও গাছগাছড়া কেটে মাটি সমান করা হয়েছে। বড় বড় রাস্তা তৈরি করার যন্ত্রপাতিগুলো সমানে কাজ করে চলেছে। রাস্তার কাজে নিয়োজিত কন্ট্রাক্টরের লোকজন দু-একটি জায়গায় ছোট ছোট ঘর বানিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। এই রাস্তার নিরাপত্তার জন্য কয়েকটি জায়গায় সেনাবাহিনীর ক্যাম্পও স্থাপন করা হয়েছে। এই রাস্তার নির্মাণকাজ শুরু

করেছিল একটি বিদেশি কোম্পানি। এই এলাকা থেকেই বছর খানেক আগে শান্তিবাহিনী একজন সুইজারল্যান্ডবাসী ইঞ্জিনিয়ারকে ধরে নিয়ে আটকে রাখে। এ ঘটনার পর সেই বিদেশি কোম্পানি চলে যায় এবং বহুদিন রাস্তাটির কাজ বন্ধ থাকে।

একদিন গেলাম ২০ কিলোমিটারের মাথায়। সেখানে তখন গাছ কাটা এবং বুলডোজার দিয়ে মাটি সমান ও ভরাট করার কাজ চলছে। কাছেই শ্রমিকদের থাকার জন্য ছাপরা ঘর করা হয়েছে। পাশেই করা হয়েছে রান্না করার ব্যবস্থা। শ্রমিকদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হলো। সবাই এসেছে সমতল এলাকা থেকে। তাদেরই একজন সেনাবাহিনীর সাবেক সেনা। আমাকে দেখে তিনি কথা বলতে এগিয়ে এলেন। এইচএসসি পাস। আট-নয় বছর আর্মিতে ছিলেন। স্বাস্থ্যগত কারণে চাকরি হারান। এখানে কয়েক মাস ধরে কাজ করছেন। সাইট ম্যানেজার হিসেবে তাঁর কাজ শ্রমিকদের কাজকর্মের তদারক করা ও খরচপাতির হিসাব রাখা। তিনি নানা সমস্যার কথা বললেন, বিশেষ করে পানির অভাব ও মশার উপদ্রবের কথা। শান্তিবাহিনীর হামলার ভয়ের কথাও জানালেন। নিয়মিত আর্মির পেট্রোলিং হয় বলে অনেকটা স্বস্তিতে আছেন তাঁরা। এসব কথাবার্তার ঠিক দুই দিন পরের ঘটনা। রাতে তাঁদের ওপর শান্তিবাহিনী হামলা করে। ছয়জন শ্রমিক নিহত হন এবং আহত হন ১০-১৫ জন। তাঁদের থাকার ঘরগুলো এবং একটি বুলডোজার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

সকালেই ঘটনাস্থলে গেলাম। পোড়া লাশগুলোর মধ্যে সেই সাবেক সেনার লাশও নজরে পড়ল। এই অঞ্চলের নিরাপত্তার কাজে ১৪ কিলোমিটারের মাথায় কুতুবছড়ির পাহাড়ের চূড়াতেই আমাদের ক্যাম্প। তার একটু দূরেই প্রথম পর্যায়ের একটি বাঙালি বসতি আছে। যথাসাধ্য সতর্কতার মধ্যেও এমন নির্মম হামলায় সবাই মর্মাহত।

এ খবর পেয়ে পরের দিনই চট্টগ্রাম থেকে হেলিকপ্টারে করে জিওসি জেনারেল মান্নাফ এলেন। তাঁর সঙ্গে বেসামরিক প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তাও এলেন। আমরা নিরাপত্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দুর্বল দিকগুলো খতিয়ে দেখলাম। সে সময়ের জেলা প্রশাসক আলী হায়দার (পরে সচিব হন এবং সড়ক দুর্ঘটনায় সস্ত্রীক নিহত হন) পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা বলে প্রায় সর্বজন স্বীকৃত ছিলেন। এই অঞ্চলে বহুদিন চাকরি করার ভেতর দিয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সর্বস্তরের সঙ্গেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। ফলে তাদের মধ্যে ভালো গ্রহণযোগ্যতাও ছিল তাঁর।

অনেক গোত্রের লোকজনের কাছেই ব্যক্তিগতভাবে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, তাদের ভাষা বুঝতে ও বলতে পারতেন। কয়েক মাস আগে তাঁর সঙ্গে এই এলাকার হেডম্যানদের এক বৈঠক হয়েছিল। তাঁরা কথা দিয়েছিলেন, শান্তিবাহিনী যাতে রাস্তার কাজে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, সে দিকটি তাঁরা দেখবেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। রাস্তাটি এলাকার পাহাড়িদের জন্য যে কত সুযোগ-সুবিধা বয়ে আনবে, সেটা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু এখানে যে হামলা চালানো হয়, তার পেছনে কাজ করেছে শান্তিবাহিনীর অর্থ আদায়ের লিপ্সা। পরে জেনেছি, কন্ট্রাক্টরের পক্ষ থেকে ৫০ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কোনো অজ্ঞাত কারণে সে টাকা দেওয়া হয়নি বলেই এমন নৃশংস ঘটনা ঘটানো হয়।

এদিকে ঘটনার পরপরই পার্শ্ববর্তী বাঙালি বসতি ও রাঙামাটি শহরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কিছু মহল নানা গুজব ছড়িয়ে পাহাড়ি ও বাঙালি বাসিন্দাদের মধ্যে সহিংস বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। ফলে শহরে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর টহলের ব্যবস্থা নিলাম। আমার স্থানীয় গোয়েন্দা স্টাফ-প্রধান ঘটনাস্থলের আশপাশে বড় ধরনের একটা অভিযান চালানোর সুপারিশ করেন। এ মুহূর্তে এ ধরনের অভিযান চালালে শান্তিবাহিনীর কারও ধরা পড়ার সম্ভাবনা কতটুকু জানতে চাইলে তিনি বলেন, শান্তিবাহিনী কোনো হামলা চালালে সেনাবাহিনীকে পাল্টা অভিযান চালিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে হবে, তা না হলে বাঙালিদের মনোবল ভেঙে যাবে। যারা এমন নৃশংস অভিযান চালিয়েছে, তারা তত দিনে আর আশপাশে বসে নেই। এমন সুপারিশকে আমি হাস্যকর ও অনাবশ্যক বলে নাকচ করে দিলাম। ক্যাম্পগুলোয় সতর্কতা ও টহল জোরদার করা ছাড়া আর কোনো তৎপরতা চালানো হলো না।

এদিকে খবর পেলাম, সেই এলাকার পাহাড়ি বাসিন্দারা ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায়, মানে আরও গভীর জঙ্গলে চলে গেছে। জেলা প্রশাসক আলী হায়দর খানকে নিয়ে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী কুতুবছড়ি ক্যাম্পে পৌঁছে জানলাম, পাহাড়িরা অভিযানের আশঙ্কায় তটস্থ হয়ে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, এমনকি তাদের রান্না করা খাবার পর্যন্ত ফেলে চলে গেছে। এর নেপথ্যের কারণও জানতে পারলাম। পাহাড়িদের আতঙ্ক অমূলক ছিল না। শান্তিবাহিনী কোথাও হামলা চালালে সে এলাকায় পাল্টা অভিযান চালিয়ে পাহাড়িদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া ও ধরপাকড়ের কিছু ঘটনা অতীতে ঘটেছে। দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর কোথাও

কোথাও নানা অজুহাতে এমন জননিপীড়নের আশ্রয় নিয়ে পরিবেশ আরও অসহনীয় করে তোলার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাকে অভিযান চালানোর পরামর্শ দেওয়ার পেছনে এ রকমেরই একটা উদ্দেশ্য ছিল। জেলা প্রশাসক এবং সে এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ২৮ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সিও লে. কর্নেল আবদুল খালেকের যৌথ প্রচেষ্টায় মাস খানেকের মধ্যে অনেক বাসিন্দাকে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফেরত আনা সম্ভব হয়। তাদের মন থেকে ভীতি দূর করে আস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের ফেলে যাওয়া গরু-ছাগল ও গেরস্থালির জিনিসপত্র হেফাজতের এবং রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে এলাকায় শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং শান্তিবাহিনী আর কোনো সহিংসতা সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তার কাজ আবারও শুরু করা সম্ভব হয়।

আমি ওখানে থাকার সময় এ রকমের আরেকটি নৃশংস ঘটনা ঘটে বরকল উপজেলার আন্দারমানিক বিওপিতে। শান্তিবাহিনীর একটি দল বিডিআরের বিওপিতে আক্রমণ চালিয়ে নিরাপত্তাবেষ্টনীর ভেতরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয় এবং প্রায় ২০-২২ জন সেনাকে হতাহত করে। বিওপির সব বাড়িঘর ও জিনিসপত্র জ্বালিয়ে দেয়। শান্তিবাহিনীরও কয়েকজন হতাহত হয়। এর আগে বিডিআরের কোনো বিওপির ওপর এমন আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। সংবাদ পাওয়ার পরপরই সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা হিসেবে দুই দিক থেকে সেনাবাহিনীর দল পাঠানো হয়। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছানো সহজসাধ্য ছিল না। সেখানে যাতায়াতের একমাত্র বাহন হেলিকপ্টার, তা-ও অবতরণস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। সেদিন বেলা তিনটা নাগাদ জিওসিসহ বিধ্বস্ত বিওপিতে পৌঁছতে সক্ষম হলাম। এর আগে আন্দারমানিকসহ কয়েকটি বিওপি পরিদর্শনে গিয়েছি। ভারতের মিজোরামসংলগ্ন আমাদের সীমান্ত ফাঁড়িগুলোর অবস্থান খুবই নাজুক। যোগাযোগবিচ্ছিন্ন এমন সব ফাঁড়িতে অবস্থান করা যে কত কঠিন ব্যাপার, সেটা সমতলে বসবাসকারীদের পক্ষে আন্দাজ-অনুমান করা কঠিন; এবং এমন এলাকায় আবার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আনাগোনা থাকলে তা আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। যা-ই হোক, জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার ভেতর দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ফাঁড়ি পুনঃস্থাপিত ও সক্রিয় করা হয়। আন্ধারমানিকের ঘটনায় বরকল থানায় মামলা হয়। পুলিশ তদন্ত শেষে ২০-২২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

গঠন করে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যা পুলিশের তদন্ত স্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার মনোভাবকে প্রকাশ করে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ব্রিগেড কমান্ডারসহ জেলা প্রশাসক ও এসপির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির কাছে একটি চার্জশিট উপস্থাপন করা হয়। চার্জশিটে অনেক লোকের নাম থাকায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার ব্যাপারে আমার সন্দেহ হলো। তদন্ত কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারলাম, আক্রমণকারীদের কেউ চেনেনি। সবই অনুমানভিত্তিক গোয়েন্দা তথ্যের ওপর নির্ভর করা। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিচয়াদি জানতে চাইলে বের হলো কয়েকজন আন্দারমানিক স্কুলের শিক্ষকের নাম। তাঁদের বিরুদ্ধে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশেরও কোনো রিপোর্ট নেই। অথচ তাঁদেরও আসামি করা হয়েছে। আমার মনে হলো, তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিট হলে সবাই পালাবেন, স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দেবেন এবং বাধ্য হয়ে তখন হয়তো শান্তিবাহিনীতেই যোগ দেবেন। এভাবে আরও কয়েকটি পরিবার এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বহুসংখ্যক পাহাড়ি বাসিন্দাকে বৈরী করে তুলতে সাহায্য করব। জেলা প্রশাসক আমার যুক্তি সমর্থন করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে আর চার্জশিট দেওয়া হয়নি।

পুলিশের হাতে সারা দেশেই তখন সাধারণ মানুষ অহরহ নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বিনা কারণে বা সামান্য কারণে গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় জড়ানো, মারধর করা, অর্থ আদায় করা, সঠিক তদন্ত না করার মতো অভিযোগের শেষ নেই। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা সংখ্যাগুরু নাগরিকেরা যখন এমন কিছুর শিকার হয়, তখন পুলিশ বা প্রশাসন ও সরকারকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু এমন অপরাধজনক ঘৃণ্য কাজ যখন কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের ওপর সংঘটিত হয়, তখন এর চিত্র অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়। আর এ রকমের নিপীড়নমূলক ঘটনা যদি পার্বত্য এলাকায় কোনো পাহাড়ি সম্প্রদায়ের কারও সঙ্গে ঘটে, তখন তার প্রকাশ ঘটে আরও ভিন্নভাবে। মনে করা হয়, পাহাড়ি বা উপজাতীয় বলেই তারা অত্যাচারিত হচ্ছে। এমনটা মনে করাই স্বাভাবিক। এই প্রেক্ষাপটেই প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার আরও সতর্কতার সঙ্গে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা প্রয়োজন। পাহাড়ি বাসিন্দাদের নানা সমস্যাসহ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানগত বিষয়টিও তাদের বুঝতে হবে। সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারের যেমন বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন, তেমনি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এ ক্ষেত্রে পালন করতে হবে সবিশেষ ভূমিকা। বিভিন্ন

সময়ে পার্বত্য এলাকার উপজাতীয় বাসিন্দাদের শিক্ষা, সরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূমি বরাদ্দ, খাজনা ও কর প্রদানের মতো বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ সুবিধাসংবলিত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সেটা যে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না, সে ব্যাপারে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। অনগ্রসর সরল প্রকৃতির এই নিরীহ অধিবাসীদের একশ্রেণীর বহিরাগত বা অ-উপজাতীয়রা (তাদের ভাষায়) ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে, তেমনি একশ্রেণীর উপজাতিও তাদের ব্যবহার করে সেসব সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। হয়রানি ছাড়াও রয়েছে তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নানা কাহিনি ও অভিযোগ। এর অধিকাংশই যে সত্য, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। অ-উপজাতীয়, অর্থাৎ বহিরাগত বাঙালিদের সে অঞ্চলে বসতি স্থাপনের বিষয়টিকে উপজাতীয় বাসিন্দাদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার একটি অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ বলে মনে করাই স্বাভাবিক। বাস্তবে সরকারের ব্যবস্থাপনায় বাঙালি বসতি স্থাপনকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন আরও উসকে দিয়েছে। শান্তিবাহিনীর তৎপরতা উপজাতীয়দের সমর্থন লাভে সুবিধা হয়েছে। বসতি স্থাপন-প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি। সরকারি নীতি অনুযায়ী বসতি স্থাপন করা হবে খাসজমিতে, অর্থাৎ প্রতিটি সেটেলার পরিবারকে বরাদ্দ দেওয়া হবে খাসজমি। কোনো উপজাতীয় পরিবারের জমি যাতে সেটেলারদের বরাদ্দ দেওয়া না হয় বা কেউ তাদের জমি দখল না করে, তা নিশ্চিত করা সম্ভব হতো না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি পুনর্বাসন

দেশের সমতল এলাকার ভূমিহীন কৃষকদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসন পরিকল্পনা নেওয়া হয় ১৯৭৭ সালের দিকে, যখন ইনসারজেনসি বা বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর তৎপরতা বাড়তে থাকে। শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাড়তে থাকলে নিরাপত্তা বাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করতে হয়, বিশেষ করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হয়।

আগেই উল্লেখ করেছি, বিস্তীর্ণ উপজাতীয়-অধ্যুষিত পাহাড়ি এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর সমর্থনে একটি জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করাই ছিল বাঙালি বসতি স্থাপন প্রকল্পের নেপথ্যের মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে প্রশাসনের কোনো ধরনের রাখঢাক ছিল না বললে অত্যুক্তি হবে না।

রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ মহলের সিদ্ধান্তে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনর্বাসনের নামে বাঙালি বসতি স্থাপনকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বড় আগ্রাসন বলে মনে করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনী ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার স্থানীয় রাজনৈতিক দল এ বিষয়টিকেই বড় করে তুলে ধরেছে। তবে প্রত্যেক পাহাড়িই যে ব্যাপারটিকে মেনে নেয়নি, সেটা ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। বাস্তবতা হলো, দেশের অন্য অঞ্চল থেকে এখানে এসে যারাই বসবাস করছিল, তারা বিদেশি না হলেও ছিল বহিরাগত। শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতার প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ায় বাঙালি বসতিগুলো। আগেও উল্লেখ করেছি, প্রকাশ্যে না বললেও এটা গোপন ছিল না যে, পার্বত্য জেলাগুলোয় বাঙালি বসতি স্থাপন করার লক্ষ্য ছিল সরকারের সমর্থকসংখ্যা বাড়ানো। এর প্রধান প্রবক্তা যে সেনাবাহিনী, তা-ও অস্বীকার করার নয়। যখন যে সরকারই ক্ষমতায় বসেছে, তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সমস্যা মোকাবিলা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপর কোনো গুরুত্বই তারা দেয়নি। এমন অবহেলাজনিত ব্যাপারটি শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপজাতীয়দের পৃথক আলাদা সত্তাকে অগ্রাহ্য করার (স্বীকার না করার) মধ্য দিয়েই জন্ম নেয় বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা। রাজনৈতিকভাবে সমস্যার সমাধান করার চেয়ে সেনাবাহিনী দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করা যাবে বলে ধারণা করা হয়। পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় এ ধারণা আরও পাকাপোক্ত হয় এবং পার্বত্য অঞ্চলে সেনা মোতায়েনের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে। বস্তুত, ওই সময় পার্বত্য এলাকায় বাঙালি বসতি স্থাপনের চিন্তাভাবনা আরও জোরদার হতে থাকে। আমি দেখেছি যে তারা সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তিবাহিনী অর্থাৎ এ দুই পক্ষেরই তৎপরতায় অতিষ্ঠ ও বীতশ্রদ্ধ ছিল। তারা সরকারি বাহিনীকে যেমন ভয়ের চোখে দেখত, তেমনি শান্তিবাহিনীকেও। শান্তিবাহিনীর জবরদস্তিমূলকভাবে চাঁদা আদায়, চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হলে অত্যাচার করা, ধরে নিয়ে আটকে রাখার মতো অপতৎপরতা যেমন সমর্থন করত না, তেমনি অভিযান চালিয়ে সরকারি বাহিনীর ত্রাস সৃষ্টি করার ঘটনাকেও অসহনীয় বলে মনে করত। উপজাতীয়দের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে তাদের এ ধরনের অসহায়ত্বের প্রকাশ লক্ষ করতাম। একবার আমি লংগদু থেকে রাঙামাটিতে ফিরছিলাম। শুভলং চ্যানেল পার হয়ে লেকের রাঙামাটি অংশে প্রবেশ করার আগে পূর্ব

দিকে, অর্থাৎ বাঁ দিকে দূরে পাহাড়ের ওপর টিনের লম্বা একটি স্কুলঘর দেখতে পেলাম। রাঙামাটির দিক থেকে রওনা হলেও দূর থেকেই নজরে পড়ত সেটা। এর আশপাশে পাহাড়িদের টংয়ের ওপরের কিছু ঘরও দেখা যায়। নিচে ছোট-বড় কিছু নৌকা। অনেকবারই ভেবেছি, সেখানে একদিন যেতে হবে, কিন্তু হয়ে উঠছিল না। সেদিন যখন আসছিলাম, দূর থেকেই কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল সবকিছু। এখানে সব সময়ই ঘাটে নৌকা ও আশপাশে লোকজন দেখা যেত। সেদিন কোনো লোকজন নেই বলে মনে হলো। দুরবিন দিয়েও কাউকে দেখা গেল না। সন্দেহ জাগায় স্পিডবোট ঘুরিয়ে ঘাটে পৌঁছে গেলাম। ওপরে উঠে স্কুল পর্যন্ত পৌঁছালে দু-একজন করে লোকজন আসতে শুরু করল। সবার মুখেই ভয় ও আতঙ্ক। ভরসা দেওয়ার পর মাঝারি বয়সের একজন লোক মুখ খুললেন। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। শান্তিবাহিনীর পাঁচ-ছয়জন সদস্য চাঁদা নিতে এসেছিল। আমাদের দেখে তারা সামনের জঙ্গলের ধার দিয়ে চলে গেছে। কিছুদিন পরপরই আসে চাঁদা আদায় করতে। দিতে দেরি হলে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেয়। জিজ্ঞেস করলাম, তাদের চিনতে পেরেছেন কি না! তিনি জানালেন, চেনেন না। নামধাম বললে তাঁদের ওপর মহাবিপদ নেমে আসবে। এটি একটি জেলেপাড়া। শ খানেক পরিবারের বসবাস। সবারই পেশা মাছ ধরা। লোকটি আরও বললেন, আপনারা চলে গেলেই শান্তিবাহিনীর লোকজন আবার আসবে। জানতে চাইবে আপনারা কেন এসেছিলেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে কী বলেছি—এসব জেনে নেবে। তিনিই জানালেন, শান্তিবাহিনীও তাঁদের বিশ্বাস করে না, আর আমরাও করি না। তাদের হাতেও তাঁরা মার খান, আমাদের হাতেও। আফসোস করে বললেন, তাঁরা এখন কোথায় যাবেন! এমন কথা আগেও কয়েক জায়গার উপজাতীয় প্রধানদের মুখে শুনেছি।

সেটেলমেন্ট-সংলগ্ন আমাদের তরুণ ক্যাম্প কমান্ডাররা বাঙালি বাসিন্দাদের নানা অভিযোগ শুনে মীমাংসার চেষ্টা করতেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি তো লেগেই ছিল। কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয় উপজাতীয়দের গুরুতর অভিযোগ আসত। নিকটবর্তী উপজাতীয়-পাড়া থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে যাওয়া, আনারস, আম-কাঁঠাল-বরই প্রভৃতি ফল নিয়ে যাওয়া এবং কখনো কোনো কোনো জায়গা থেকে ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ারও অভিযোগ আসে। কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বাঙালিদের কেউ কেউ এ ধরনের কাজ করে পাহাড়ি-বাঙালি সম্পর্ক বিষাক্ত করে তোলে।

কয়েকজনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে পরিবেশ শান্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও পাহাড়ি ও বাঙালি বাসিন্দাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা আমার কাছে অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল। পাহাড়িদের এলাকায় বাঙালিদের বসতি গড়ার কাজ চালিয়ে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ভালো সম্পর্কের আশা করা বাতুলতা মাত্র। জমিজমা নিয়ে বিরোধ দেশের সর্বাঞ্চলে বিদ্যমান। দেশের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সিংহভাগই জমিজমা-সংক্রান্ত। পার্বত্য এলাকাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। নতুন বসতি স্থাপনকারীদের কেউ কেউ পাহাড়িদেরই জমি দখলের চেষ্টা শুরু করে। এর পেছনে মদদ জোগায় জেলা প্রশাসনের ভূমি বিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একশ্রেণীর কর্মচারী। যদিও নির্দেশ ছিল, উপজাতীয়দের বরাদ্দ দেওয়া কোনো জমি সেটেলারদের দেওয়া যাবে না। কিন্তু কোনো কোনো সেটেলমেন্টে ওই নির্দেশ না মেনে জমি বরাদ্দের অভিযোগ আসে। কোনো জায়গায় আবার সেটেলারদের কেউ কেউ পাহাড়িদের জমি দখল করে নিয়ে তা নিজেদের জমি বলে দাবি করে বিরোধের সূচনা করে। অন্যদিকে সেটেলারদের অভিযোগ তো ছিলই।

সপ্তম অধ্যায়

জেনারেল এরশাদের মার্শাল ল জারি

মার্শাল লর দায়িত্ব

আমি যখন রাঙামাটি এলাকার দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন দেশে সামরিক শাসন জারির জোর গুজব শোনা যাচ্ছিল। সে সময় সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদ প্রায়ই রাজনৈতিক বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছিলেন। ১৯৮২ সালের জানুয়ারির সম্ভবত দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাকে দুই দিনের জন্য ঢাকায় আসতে হলো। সকালে বিশেষ কিছু কাজে সেনা সদর দপ্তরে গেলাম। সেনাপ্রধানের অফিসের সামনের রাস্তা দিয়ে সিজিএস মেজর জেনারেল নূরউদ্দীন খানের অফিসে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, এডিসি হালকা রঙের স্যুট পরা এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সেনাপ্রধানের অফিসের দিকে যাচ্ছেন। অনেক বছর পর হলেও দেখে চিনতে অসুবিধা হলো না। জগন্নাথ কলেজে আমাদের সিনিয়র শিক্ষার্থী ছিলেন। ছাত্ররাজনীতি করতেন। বাড়ি নোয়াখালী জেলায়—অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। আমাকে অবশ্য তিনি চেনেননি। আমি সিজিএসের অফিসে বসা থাকতে থাকতেই তিনিও সেখানে ঢুকলেন। সিজিএস আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি যে তাঁকে চিনি, এ কথা বললাম না। এর একটু পরই আমি বের হয়ে গেলাম ডিএমও ব্রিগেডিয়ার কে এম ওয়াহেদের অফিসে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সিজিএস ইন্টারকমে জানালেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এক ভদ্রলোককে পাঠাচ্ছেন। একটু পরই একজন অফিসার মাহবুবুর রহমানকে নিয়ে ডিএমওর অফিসে এলেন। আমি বিদায় নিয়ে বের

হয়ে গেলাম। সেখান থেকে বের হয়ে শেরেবাংলা নগরে নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবদুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর অফিসে গেলাম। কিছুক্ষণ কথা বলতেই তিনি জানালেন, 'এক ভদ্রলোক দেখা করতে আসছেন। কাজেই বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।'

চা খেয়ে বিদায় নিয়ে বের হতেই বাইরে এবারও দেখি স্যুট পরা সেই একই ভদ্রলোক। বুঝতে অসুবিধা হলো না, দেশে মার্শাল ল জারির প্রস্তুতিপর্বে মাহবুবুর রহমানকে আনা হয়েছে পরামর্শক হিসেবে। তিনি জেনারেল রহমানের বন্ধু। দুজন একই জেলার অধিবাসী। চট্টগ্রামে ফিরলে সহকর্মীরা ঢাকার অবস্থা জানতে চাইলে এ ঘটনা শোনালাম। শুনে কারও বুঝতে অসুবিধা হলো না যে মার্শাল ল আসন্ন।

কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা। রাঙামাটিতে অবস্থান করছিলাম। জিওসি মিটিং ডেকেছেন। সে খবর পেয়ে চট্টগ্রামে চলে এলাম। ১৯৮২ সালের ২২ মার্চ বিকেলে জিওসির অফিসে মিটিংয়ে সমবেত হলাম। সে অঞ্চলের ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকের সব কমান্ডার ও কিছু স্টাফ অফিসার সভায় উপস্থিত হলেন। জিওসি মেজর জেনারেল মান্নাফ মার্শাল ল জারির নির্দেশ পাঠ করে শোনালেন। তিনি আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক এবং তাঁর অধীনে আমরা কজন উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োজিত হলাম। আমাকে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার দায়িত্ব দেওয়া হলো। জিওসি অল্প কিছু কথা বলে বিদায় দিলেন। আমার সঙ্গে একান্তে আলাপচারিতায় জানালেন, তিনি সামরিক শাসন জারির পক্ষে ছিলেন না। তবে দেশ শাসন করার মতো যোগ্যতা আমাদের নেই। শুনেছি, তৎকালীন বিডিআরের প্রধান মেজর জেনারেল আতিকুর রহমানেরও এ রকমেরই অভিমত ছিল। যা-ই বলা হোক না কেন, বাস্তবে আমরা সবাই সামরিক শাসনের পক্ষে ছিলাম; এবং সে লক্ষ্যেই কাজ করেছি।

একটি দুর্নীতি অভিযোগের তদন্তের পরিণতি

আমার অধীন ব্রিগেডের অফিসার ও সেনাসদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। আমি নিজেকে সে কাজেই পুরোপুরি নিয়োজিত রাখতে চাই। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমি মার্শাল লর বিষয়ে মোটেই উৎসাহিত নই। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে একদিন জিওসি তথা আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসককে বলেই ফেললাম, এলাকায় সামরিক শাসন পরিচালনার কাজে নিজেকে বা অধীন কাউকে নিয়োগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আমার সীমাবদ্ধতা মেনে নিলেন। তবে বললেন, বিশেষ প্রয়োজন

না হলে কোনো দায়িত্ব দেবেন না। কিন্তু সে অবস্থা বেশি দিন থাকল না। কর্ণফুলী পেপার মিল ও রেয়ন মিল দুটির দুর্নীতি উদ্‌ঘাটনের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটিতে আমাকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হলো। প্রসঙ্গত, সে সময় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের অধীনে দুটি মিলের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির খবর সংবাদপত্রে বের হচ্ছিল এবং বহু অভিযোগ ঢাকায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তরে আসছিল। সেসব অভিযোগের ভিত্তিতে দুই মিলেরই প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের ইতিমধ্যেই ঢাকার নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মনে করলাম, দায়সারা গোছের তদন্ত করে একটি রিপোর্ট দিয়ে সরে আসব। এর আগের (জেনারেল জিয়ার মার্শাল লর সময়ে) চট্টগ্রামে এ রকমেরই একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি তদন্তের পরিণতিজাত কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে। সে সময়ও মেজর জেনারেল মান্নাফই এখানকার জিওসি ছিলেন। আমার নেতৃত্বে সেই তদন্তে যাঁকে মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদানের জন্য মার্শাল ল কোর্টে বিচারের সুপারিশ করেছিলাম, তাঁকে কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রের মন্ত্রী পদে নিয়োগ করা হয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ শুরু করতে হলো। অন্য সদস্যদের নিয়ে মিল পরিদর্শনে গেলে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা দেখা করতে আসেন। প্রাথমিক তদন্তে যে চিত্র পেলাম, তাতে দায়সারা গোছের তদন্ত করলে কর্তব্যকর্মে নিতান্ত অবহেলা করার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ও নৈতিকতাবিরোধী কাজ করা হবে বলে মনে করলাম। কাজেই যত দূর সম্ভব আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তদন্তকাজ শুরু করলাম। সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ ও অপব্যবহার-সংক্রান্ত নানা তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল। অনেকেই উৎসাহের সঙ্গে তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, পূর্ণাঙ্গ তদন্তকাজ শেষ করতে অনেক সময় লাগবে। তবে এর মধ্যেই যে তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পাওয়া গেছে, তাতে অবিলম্বে দু-এক মামলা অন্তত করা যায়। সিদ্ধান্ত নিলাম, প্রথমে একটি মামলা রুজু করে কাজ শুরু করব। আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসকের সম্মতি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে কাপ্তাই থানায় একটি মামলা রুজু করা হলো। কাপ্তাই মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তাকেই দেওয়া হলো মামলাটি তদন্ত করার দায়িত্ব। এদিকে আমরা আমাদের পূর্ণাঙ্গ তদন্তকাজও চালিয়ে যাচ্ছিলাম। তদন্ত কিছুদূর এগোতেই একদিন মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তা বিনয়ের সঙ্গেই আমাকে জানালেন, ওই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে তিনি

বিপদের আশঙ্কা করছেন। মামলার আসামিরা যে খুবই প্রভাবশালী, সেটা আমার জানা আছে কি না, তিনি সে সম্পর্কেও জানতে চাইলেন। আমি অভয় দিয়ে বললাম, তিনি যেন সুষ্ঠু ও আইনানুগভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত করেন। তদন্ত চলার সময় মাঝেমধ্যে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসতেন। তদন্তে যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে দুই প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছাড়াও করপোরেশনের চেয়ারম্যানের সুস্পষ্ট সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেল। কাজেই চার্জশিটে তাঁর নামই প্রথমে স্থান পায়। আসামিদের বিষয়ে আমি আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করি এবং তাঁর সম্মতি নিয়েই চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য চার্জশিট ঢাকার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অফিসে পাঠানো হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেল। তদন্ত কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে যথারীতি চার্জশিট দাখিল করলেন। করপোরেশনের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। অন্য দুজনকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

চার্জশিট দাখিল করার সপ্তাহ খানেক পর এক সন্ধ্যায় জিওসি আমাকে টেলিফোনে কর্ণফুলী পেপার মিলের মামলা সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তাঁর কথায় বুঝতে পারলাম, তিনি খুবই বিব্রতকর অবস্থায় আছেন। কোথাও এ মামলা নিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে! সকালে মামলার সব কাগজপত্র নিয়ে তিনি দেখা করতে বললেন। রাতেই কাপ্তাই মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তাকে (যিনি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা) মামলার কাগজপত্র নিয়ে পরের দিন সকালে চট্টগ্রাম ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে সামরিক আইন প্রশাসকের অফিসে উপস্থিত থাকতে জানিয়ে দিলাম। সকালে অফিসে ঢুকতেই জিওসি বললেন, চার্জশিট থেকে প্রথম নামটি বাদ দিতে হবে। আমি যতই বোঝাতে চাইলাম, কোর্ট আমলে নিয়েছে যে চার্জশিট এই পর্যায়ে, তার থেকে প্রধান আসামির নাম বাদ দিলে পুরো মামলাই নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া দুর্নীতি নির্মূল করার কথা বলে দেশে মার্শাল ল জারি করা হয়েছে, সেখানে এত বড় মামলা যদি এভাবে পরিচালনা করা হয়, তাহলে আমাদের মুখ থাকবে না।

তিনি মাথা নেড়ে আমার কথায় সায় দিলেও বুঝলাম, তিনি নিরুপায়। আমাকে বারবার বলতে লাগলেন প্রথম নামটি বাদ দিয়ে চার্জশিট পুনর্দাখিল করতে। আমি জানালাম, তাহলে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নাম বাদ দেওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশ তাঁর অফিস থেকে দিতে হবে। তিনি তা-ই করতে সম্মত হলেন। তাঁর অফিস থেকে বের হয়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে এ কথা জানালে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'স্যার, অনেক খাটাখাটি করে তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে

এই কেসের তদন্ত করেছিলাম। এখন প্রথম নামটি বাদ দেওয়া হলে কেস দুর্বল হয়ে পড়বে এবং অন্য অভিযুক্তরা খালাস পেয়ে যাবে।'

মার্শাল ল অফিসের লিখিত নির্দেশ হাতে পেয়ে মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তা প্রথম নামটি কেটে বাদ দিলেন। কার নির্দেশে কাটা হলো, তা-ও সেখানে লিখে দিলেন। সে সময় এ মামলা নিয়ে সামরিক ও বেসামরিক অফিসার মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।

এর কয়েক দিন পরের ঘটনা। জিওসি তাঁর অফিসে ডেকে আমাকে জানালেন, তিনি আমাকে রাঙামাটি ইনফ্যান্ট্রি থেকে চট্টগ্রামে আর্টিলারি ব্রিগেডে বদলি করতে চান। এ ব্যাপারে আমার অভিমত কী! আমি পাল্টা জানতে চাইলাম, তিনি কি রাঙামাটি ব্রিগেডে আমার কর্মদক্ষতায় কোনো ঘাটতি দেখতে পাচ্ছেন! তিনি হেসে বললেন, না, তা নয়। আসলে প্রকৃত কারণটি তিনিও জানেন। আমি ভালো করেই জানি। আমি বলেই ফেললাম, এই ডিভিশনে চাকরি করার উৎসাহ আমি হারিয়ে ফেলেছি। বললাম, আমি এখন অন্য কোনো ডিভিশনে বদলি হলেই খুশি হব।

কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা। সম্ভবত, অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ চট্টগ্রামে এলেন। বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে পৌর মিলনায়তনে মতবিনিময় সভায় মিলিত হলেন। সভা শেষে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে বের হতেই আমার সঙ্গে তাঁর দেখা। হ্যান্ডশেক করে হেসে বললেন, 'মনজুর, তুমি আবার কীভাবে ঢাকায় তোমার পোস্টিংয়ের ব্যাপারটা ম্যানেজ করলে?'

বললাম, আমি তো কিছু জানি না। তিনি জেনারেল মান্নাফের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি মনজুরকে কিছু বলোনি?'

তিনি বললেন, 'না, এখনো বলিনি।' কর্ণফুলী পেপার মিলের মামলার পর আমার যে পোস্টিং হবে, সে আশঙ্কা তো আমার ছিলই। করছিলামও। কিন্তু এত সত্বর হবে, সে আশা করিনি। শেষ পর্যন্ত সাভারে অবস্থিত নবম ডিভিশনের আর্টিলারি ব্রিগেডে আমার পোস্টিং হলো। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিলাম। পেছনে ফেলে এলাম রাঙামাটির অনেক স্মৃতি, অনেক অভিজ্ঞতা ও কিছু আফসোস। প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মস্পৃহা নিয়ে রাঙামাটি ব্রিগেডের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছিলাম। পাকিস্তান থেকে ফেরত এসে তরুণ বয়সে যখন বাংলাদেশ রাইফেলসে যোগ দিই, তখন সেই কর্মক্ষেত্র যেমন আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট ও কর্মচঞ্চল করে তুলেছিল, রাঙামাটি ব্রিগেডের কর্মক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছিল। সদিচ্ছা ও

আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে আমি কখনো ত্রুটি করিনি। আমি নিজেকে শুধু রুটিনকাজে সীমাবদ্ধ রাখতাম না। তরুণ বয়সে আমার এক কমান্ডিং অফিসার বলতেন, 'নির্দেশে যা বলা আছে, ঠিক ততটুকু করেই মনে করো না যে তোমার কাজ শেষ। অনেক সময় নির্দেশের বাইরেও কাজ থাকে, যা তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা ও ইনিশিয়েটিভ দিয়ে সম্পন্ন করবে।' তাঁর বলা সেই কথাগুলো মনে রেখেই সব সময় দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। সামরিক বাহিনীর বাইরে, অর্থাৎ বেসামরিক প্রশাসনসম্পৃক্ত দায়িত্ব পালনে এই উপদেশ আমার বিশেষ কাজে এসেছে। সেখানে কাজের পরিসর সেনাবাহিনীর মতো তেমন বৃত্তাবদ্ধ থাকে না। বুদ্ধি-বিবেচনা ও ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ থাকে, যা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে করলে সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু এতে হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যশোর বিডিআরে থাকার সময় যেমন হঠাৎ অসময়ে বদলি করা হয়েছিল, এবারও তা-ই করা হলো। কিন্তু আবারও যে একটা হোঁচট খাব, ভাবতে পারিনি। রাঙামাটি ব্রিগেডের দায়িত্ব পালনের পুরো সময় পেলাম না। যে কারণে আমাকে এই অকালীন বদলি করা হলো, সে বিষয়ে কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ না করে পারছি না।

কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের যে চেয়ারম্যানের নামে চার্জশিট দাখিল করে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করা হয়, তাঁর নাম ছিল এ কে এম মোশাররফ হোসেন। তাঁর স্ত্রী জিনাত মোশাররফ যে জেনারেল এরশাদের অতি ঘনিষ্ঠদের একজন, এ কথা সে সময় কোনো মহলেরই অজানা ছিল না। পরে অবশ্য কেউ কেউ আমাকে হাস্যচ্ছলে বলেছেন, 'তুমি এমন সাহস করলে কেমন করে?' প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার জোরে এ কে এম মোশাররফ হোসেনের ভাগ্য খুলে যায়। এরশাদ সরকারের পতনের পর তাঁর সাময়িক ভাগ্যপতন ঘটে। কিছুদিন জেলে থাকতে হলেও বেগম জিয়ার শাসনামলে আবার তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। রাজনীতিতে যোগ দিয়ে তিনি যোগ্যতা এবং নেত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততার এমনই প্রমাণ রাখতে সক্ষম হন যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে বহাল হন।

সাভারের দিনগুলো

সাভারের আর্টিলারি ব্রিগেড নবম পদাতিক ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত। প্রয়াত মেজর জেনারেল আবদুর রহমান তখন এ ডিভিশনের জিওসি। তাঁর সঙ্গে আমার আগে থেকে পরিচয় থাকলেও একসঙ্গে চাকরি করার সুযোগ হয়নি।

তিনি আমাকে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। সে সময় ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার ছিল শেরেবাংলা নগরে। একটি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড ও আর্টিলারি ব্রিগেডের অবস্থান ছিল সাভার সেনানিবাসে। ব্রিগেড কমান্ডার ছাড়াও আমাকে স্টেশন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করতে হতো। বিলুপ্ত জাতীয় রক্ষীবাহিনীর ট্রেনিং স্থাপনা হিসেবে এই সেনানিবাস গড়ে ওঠে, যার সঙ্গে পরে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনা যুক্ত হতে থাকে। ঢাকার নিকটবর্তী সুন্দর ছিমছাম ছোট্ট সেনানিবাসটি আমার কাছে বেশ পছন্দনীয় হয়ে ওঠে। জিওসি প্রায়ই সামরিক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে এখানে আসতেন। আবার নানা কাজে ও আলোচনা সভায় যোগ দিতে প্রায়ই আমাকে শেরেবাংলা নগরে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে যেতে হতো। প্রায় দুই বছর এখানে দায়িত্ব পালন করতে হয়। ব্রিগেডের প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক রুটিন কাজকর্ম ছাড়া কোনো বাড়তি দায়িত্ব না থাকায় চাপ সামান্যই ছিল। দেশে তখন সামরিক শাসন চললেও আমাকে আর এ-সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি বলে নির্ঝঞ্ঝাট ছিলাম। জেনারেল আবদুর রহমান তখন ঢাকা অঞ্চলের উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। আমাকে রাঙামাটি ব্রিগেড থেকে কেন সরানো হয়েছিল, সে খবর জানতেন। তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদের ঘনিষ্ঠজনদের একজন বলে পরিচিত ছিলেন। দেশে সামরিক আইন জারির পক্ষে জেনারেল এরশাদের শক্তির প্রধান সমর্থক ও উৎস ছিলেন নবম ডিভিশনের জিওসি। আমি সাভারে থাকার সময়ই তখনকার প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে সরিয়ে এরশাদ নিজেই প্রেসিডেন্ট হন। এ সময়ই টের পেতে লাগলাম যে জেনারেল আবদুর রহমান সামরিক শাসন পরিচালনায় জেনারেল এরশাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট নন। তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে সেসবের সমালোচনা করতেন। তাঁর মন্ত্রিসভা ও মার্শাল লর দায়িত্বে নিয়োজিত কিছু সামরিক কর্মকর্তার দুর্নীতি এবং তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের তৎপরতা নিয়েও তিনি কথা বলতেন। আঞ্চলিক উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের বৈঠকে তিনি উত্থাপন করতেন কিছু সমালোচনামূলক বিষয়, যার ফলে তিনি ক্রমে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের বিরাগভাজন হতে থাকেন। তিনি জেনারেল এরশাদের অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে অন্য জেনারেলরা তাঁকে দিয়ে অনেক সময় অপ্রিয় সত্য কথা বলাতে উৎসাহিত করতেন বলেও কেউ কেউ মনে করতেন।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে যে জেনারেল রহমানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে চলেছে, সেটা টের পাচ্ছিলাম। এর মধ্যে একদিন তিনি আমাকে ডেকে আক্ষেপের সঙ্গে কিছু কিছু ঘটনা শোনালেন। বললেন, তাঁরই কয়েকজন সহকর্মী বন্ধু তাঁর বিরুদ্ধে নানা কথা বলে প্রেসিডেন্টের কান ভারী করে চলেছেন। ফলে মোহাম্মদপুরে তাঁর সরকারি বাসার সামনে সারাক্ষণই থাকে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের নজরদারি। প্রাইভেট কারে করে তিনি বের হলেই গোয়েন্দারা তাঁর পিছু নেয়। তাঁর টেলিফোনও টেপ করা হয়। সবকিছুর বর্ণনা দিলেন তিনি। একদিন সাভারে অবস্থিত সব সেনাসদস্যের সমবেত দরবারে জেনারেল রহমান ভাষণ দিতে এলেন। ভাষণে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কিছু সিদ্ধান্ত ও সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিষয় এমনভাবে তুলে ধরলেন, যাকে সমালোচনাও বলা যায়। প্রসঙ্গত, সে সময় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসককে নিয়ে মুখরোচক নানা কথা শোনা যেত। জেনারেল রহমানের ভাষণে কিছু বক্তব্য ছিল, যা অতিরঞ্জিত হয়ে সর্বক্ষমতাধর প্রেসিডেন্টের কানে পৌঁছালে তিনি যে ক্ষুব্ধ হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বাস্তবতও তা-ই হলো। কাজেই জিওসিকে সাইজ আপ করার সিদ্ধান্ত আসতে দেরি হলো না। এ ক্ষেত্রে যে তাঁর কোনো কোনো সহযোগী বন্ধুর নেপথ্য ভূমিকা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরে জেনারেল রহমান আমাকে বলেছিলেন, গোপনে তাঁর ভাষণ টেপ করা হয় এবং প্রেসিডেন্টকে শোনানো হয়।

এর মধ্যে একদিন রাতের দিকে প্রেসিডেন্ট আমাকে টেলিফোন করেন। সাধারণত প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান ব্রিগেড কমান্ডারদের সঙ্গে খুব জরুরি প্রয়োজন না হলে সরাসরি কথা বলেন না। তাঁর টেলিফোন পেয়ে আমি কিছুটা অবাক হলেও আঁচ করলাম, এর পেছনে কোনো বিশেষ কারণ রয়েছে। কুশলাদি বিনিময় করার পর বললেন, কাল সকালে মেজর জেনারেল কে এম ওয়াহেদ নবম ডিভিশনের জিওসির দায়িত্ব নেবেন এবং আমি যেন তাঁকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করি। আসলে আমাকে তাঁর টেলিফোন করার আসল উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, আমাকে এটাই বোঝানো যে, আমার প্রতি তিনি আস্থাবান আর আমি যেন তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে দ্বিধা না করি। তাঁর কথাবার্তা শুনে আরও মনে হলো, তিনি জেনারেল রহমানের দিক থেকে কোনো ধরনের প্রতিরোধের আশঙ্কা করছেন। পরের দিন সকালে জিওসির টেলিফোন পেয়ে শেরেবাংলা নগরে তাঁর অফিসে উপস্থিত হলে তিনি জেনারেল রহমানের অপসারণের কথা বললেন। তিনি জানতেন না, আমি

রাতেই তাঁর পোস্টিংয়ের বিষয়ে জেনেছি স্বয়ং প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে। বিষয়টি ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁকে শান্ত থাকার অনুরোধ করলাম। আলাপচারিতায় বুঝলাম, এমনটা যে ঘটতে যাচ্ছে, তিনি সেটা আঁচ করেছিলেন। ব্যাপারটায় তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছেন। অথচ জেনারেল এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে জেনারেল রহমানের সমর্থন ছিল সবচেয়ে বেশি। আর তাঁকেই কিনা এখন অপসারণ করা হলো। রাষ্ট্রক্ষমতায় সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সংশ্লিষ্টতায় এমন ঘটনা নতুন কিছু ছিল না। জেনারেল রহমান কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়ে ভগ্নহৃদয়ে দেশ ত্যাগ করেন। রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করার সময়ই প্যারিসে তাঁর অকালমৃত্যু হয়। স্বভাবে কিছুটা রগচটা হলেও জেনারেল রহমান আচার-আচরণে অমায়িক ছিলেন। দুবার বিয়ে করেও তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। এসব নিয়ে তাঁকে যথেষ্ট বিড়ম্বনার মধ্যে থাকতে হতো।

সাভারে প্রায় আড়াই বছর শান্তিতেই কাটল স্বাভাবিক ও রুটিনমাফিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে, যা অনেকটাই বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়েমি ধরনের। সেনাদের ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা তদারক করা এবং প্রশাসন পরিচালনার রুটিনমাফিক দায়িত্ব পালন করাই ছিল অন্যতম মূল কাজ। তবে বছরে একবার কি দুবার ট্রেনিং মহড়ায় আর্টিলারি ইউনিটগুলোকে নিয়ে কয়েক সপ্তাহ বাইরে অবস্থান করা এবং হাটহাজারী রেঞ্জে হাতে-কলমে (লাইভ) ফায়ারিং পরিচালনা বা তদারকির মতো বিষয়গুলো ছিল ব্যতিক্রমধর্মী ও আকর্ষণীয়। এ সময় আমাকে বা আমার অধীন কোনো ইউনিট বা অফিসারকে মার্শাল লর দায়িত্ব নিতে হয়নি বলে অনেকটাই শান্তিতে থাকা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি সেনা সদরে আর্টিলারি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর দৈনন্দিন কাজ আমার কাছে আরও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে। তবে মাঝেমধ্যে বিভিন্ন সেনানিবাসে আর্টিলারি ইউনিট পরিদর্শন ও ট্রেনিং পরিচালনা তদারক করার জন্য যেতে হতো। বিশেষ করে, আর্টিলারি সেন্টারে ট্রেনিংয়ের বিষয়গুলো তদারক করার জন্য চট্টগ্রামের হালিশহরে যেতে ভালো লাগত।

১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে ঢাকায় অবস্থিত ৬ অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট ব্রিগেডে দ্বিতীয়বার পোস্টিং আমাকে অনেকটাই নিরুৎসাহিত করে ফেলে। যা-ই হোক, সে বছরেরই নভেম্বরে মেজর জেনারেল র‍্যাংকে প্রমোশন আমার পেশাগতজীবনে নতুন করে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। যে কারণে আমাকে রাঙামাটি ব্রিগেড থেকে সরানো হয়েছিল, সেই একই কারণ যে আমার পরবর্তী পদোন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করবে, সে ব্যাপারে আমি অনেকটাই নিশ্চিত

ছিলাম। কিন্তু তা হয়নি। জেনারেল এরশাদ সম্পর্কে এ রকমের একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, তিনি কারও ওপর একবার নারাজ হলে আর রক্ষা ছিল না। কোনো না কোনোভাবে তাকে ভুগতে হতো। এর মধ্যে পরবর্তী প্রমোশন থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি থাকত। আমার ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেনি। পরে আরও অবাক হলাম, যখন আমাকে তিনি সামরিক সচিব নিয়োগ করলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আমাদের দেশে মেজর জেনারেল পদে প্রমোশন অনেকটাই রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রথা চালু হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই। এই পদে বা বাহিনীর প্রধান নিয়োগে কিছুটা রাজনৈতিক বিবেচনার প্রাধান্য থাকে অনেক দেশেই। তবে আমাদের দেশের মতো এতটা প্রকাশ্যে প্রধান নির্বাহীর পছন্দই একমাত্র বিবেচ্য হওয়ার মতো ঘটনা অন্য দেশের ক্ষেত্রে কমই ঘটে থাকে বলে শুনেছি। এরশাদ-পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনামলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। বিধিবিধান, নিয়মনীতি ও প্রচলিত প্রক্রিয়া অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রাধান্য পাওয়ার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে। এই নজির জেনারেল জিয়া বা এরশাদের সময়কেও ছাড়িয়ে গেছে। সব প্রমোশনের ক্ষেত্রেই ওই দুই শাসকের সময়ে মোটামুটি একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হতো। সেনাপ্রধানকে প্রধান করে চাকরিরত মেজর জেনারেলদের নিয়ে গঠন করা প্রমোশন বোর্ডই যে লে. কর্নেল থেকে মেজর জেনারেল র‍্যাংকে প্রমোশনের বিষয়টি বিবেচনা করবে, এসব ধারাই প্রচলিত আছে। এই বোর্ডের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করেই সরকার সাধারণত প্রমোশনের বিষয়টি অনুমোদন করে থাকে। এরশাদ ও জিয়ার সময়ে সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব মেজর জেনারেলের প্রমোশন এ প্রক্রিয়ায় অব্যাহত ছিল।

রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব

১৯৮৬ সালের ১৫ নভেম্বর আমার মেজর জেনারেল র‍্যাংকে পদোন্নতির ঘোষণা হয়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিজেই আমাকে টেলিফোনে অভিনন্দন জানান এবং পরের দিন তাঁর একজন ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে অভিনন্দনপত্র পাঠিয়ে দেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মেজর জেনারেল পদে গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। পরের বছরের নভেম্বরে এই কারখানার প্রশাসনিক সংস্কার ও শৃঙ্খলামূলক কিছু বিষয়ে জরুরি আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে

দেখা করতে তাঁর অফিসে ঢুকতেই আমাকে বললেন, 'মনজুর, তোমাকে তো আমি সামরিক সচিব নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তাঁর কথা শুনে আমি চমকে গেলাম। ভেতরে ভেতরে কিছুটা ভয়ও পেলাম। আমি ভাবতেও পারিনি, তিনি আমাকে ওই পদে মনোনীত করবেন। তাঁর পারসোন্যাল স্টাফদের অন্যতম প্রধান হওয়ার যেসব বিশেষ যোগ্যতা দরকার, আমার মধ্যে তার প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। সেদিন তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসি।

আমি বরাবরই পেশাদারিকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। সামরিক কর্মজীবনে অধিনায়কত্বের (কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল) কোনো স্তরে কোনো রকমের ব্যর্থতার ছাপ ছিল না। শৃঙ্খলা বিধানে আমার আপসহীন অবস্থান জেনারেল এরশাদসহ অনেক ঊর্ধ্বতনেরই প্রশংসা কুড়িয়েছিল। পাকিস্তান আমলে ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতেও আমার সার্ভিস রেকর্ডে কখনো কোনো কালো দাগ পড়েনি। তবে সামরিক সচিব পদে নিয়োগ আমার জন্য যে খুবই বিব্রতকর ও অমঙ্গলজনক হবে, সেটা ধরেই নিয়েছিলাম। এমন আশঙ্কার অনেক কারণ ছিল।

তখন সেনা মহলে এ ধরনের একটা রটনা ছিল যে, প্রেসিডেন্ট সামরিক সচিব পদে একজন মেজর জেনারেলকে নিয়োগ করতে যাচ্ছেন। পরে শুনেছি, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁদের ঘনিষ্ঠজনদের এই পদে নিয়োগে সুপারিশ-তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি আমি দায়িত্ব গ্রহণের পরও এক মন্ত্রী না জেনে আমাকেই তেমন একজন মনে করে অভিনন্দন জানাতে এসে একটা বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হন। অবশ্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঘনিষ্ঠ এক মন্ত্রী দাবি করেন যে সামরিক সচিব পদে আমার এই নিয়োগে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। আমি গর্বভরে আরও বলতে পারি, সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট থেকে মেজর জেনারেল র‍্যাংক পর্যন্ত পদোন্নতিতে আমি কখনো সুপারসিড হইনি। কখনোই পদোন্নতি বা বদলির বিষয়ে তদবির-সুপারিশের জন্য আমাকে কারও শরণাপন্ন হতে হয়নি।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সামরিক সচিব নিয়োগ করবেন বলে আমাকে জানানোর প্রায় এক বছর পর আমার বদলির সরকারি নির্দেশ আসে। এরই মধ্যে অবশ্য আমাকে বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়। পাশাপাশি এতৎসংক্রান্ত কিছু প্রশাসনিক সংস্কারমূলক কাজও আমাকে সম্পন্ন করতে

হয়। সমরাস্ত্র কারখানায় দুই বছর দায়িত্ব পালন করে ১৯৮৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর আমি বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব হিসেবে যোগ দিই। অস্বস্তি, নানা শঙ্কা ও দুর্ভাবনা নিয়ে সেদিন যখন বঙ্গভবনে প্রবেশ করি, তখন অতীতের অনেক ঘটনার কথাই আমার মনে পড়তে থাকে। এখানেই একদিন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহ্মান রাষ্ট্রপতির জন্য নির্ধারিত অফিসটিতে বসতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর খুনিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এলেন খন্দকার মোশতাক। কিছুদিনের জন্য এ ভবন হয়ে উঠল খুনি আর ষড়যন্ত্রকারীদের হেডকোয়ার্টার। ওই বছরেরই নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থানের কয়েকটি দিন এই ভবন হয়ে ওঠে নানা কর্ম আর অপকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকেই পরিচালিত হয়েছিল ঢাকা জেল হত্যাকাণ্ড, যার ফলে মৃত্যুবরণ করেন আওয়ামী লীগের চারজন ঊর্ধ্বতন নেতা। পরে এই অফিসে বসেন একে একে বিচারপতি সায়েম, জেনারেল জিয়া, বিচারপতি সাত্তার, বিচারপতি আহসান উল্লাহ ও জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ইতিহাসের অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছে এই সুদৃশ্য ভবন। ১৯৭৮ সালে সেনা সদর দপ্তরে কর্মরত থাকার সময় কয়েকবার সরকারি কাজে রাষ্ট্রপতির অফিসকক্ষের ঠিক সামনে সামরিক সচিবের অফিসে এসেছি। তা ছাড়া প্রতিবছরই স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভবনটির উত্তর পাশের সবুজ সুন্দর মাঠে আসার সুযোগ হতো। কাজে যোগ দেওয়ার পরের দিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি নানা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু দিকনির্দেশ দিলেন।

বিদেশ সফরের কিছু অভিজ্ঞতা

সামরিক সচিবের দায়িত্বের প্রধান কাজগুলোর অন্যতম ছিল প্রেসিডেন্টের বিদেশ সফরের সফরসঙ্গীদের তালিকা চূড়ান্ত করা, সফরকালে সফরসূচির সমন্বয় সাধন করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আনুষ্ঠানিকতাগুলোর ফিরিস্তি তৈরি করা। আমার দায়িত্ব গ্রহণ করার পরের দিনই প্রেসিডেন্ট এরশাদ চতুর্থ সার্ক সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের উদ্দেশে রওনা হলে তাঁর সফরসঙ্গী হলাম। এটাই ছিল মিলিটারি সেক্রেটারি হিসেবে আমার প্রথম বিদেশ সফর। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ছাড়ার পর সেবারই প্রথম (ও সম্ভবত শেষ) আমার সে দেশ সফরে যাওয়া। চাকরিজীবনে ইসলামাবাদে শেষবারের মতো যাই ১৯৭১ সালের মে মাসে।

তিন দিনের সেই অবস্থানকালে ইসলামাবাদের সামান্য কিছু এলাকাই দেখার সুযোগ হয়েছিল। তবে এবার টের পেলাম, ১৮ বছরের ব্যবধানে সেটি এখন পরিচিত হয়েছে একটি অত্যাধুনিক শহরে। তবে ঠাসা সরকারি সফরসূচির বাইরে আমার পক্ষে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। আমার দু-একজন কোর্সমেট টেলিফোনে যোগাযোগ করে আমার সঙ্গে দেখা করার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তাদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি। ইসলামাবাদের পর ফেব্রুয়ারিতেই প্রেসিডেন্ট এরশাদের ছয় দিনের রাষ্ট্রীয় সফর ছিল যুক্তরাজ্যে। সে সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মার্গারেট থ্যাচার। তিনি তখন বিশ্ব রাজনীতিতে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অন্যতম। 'আয়রন লেডি' নামে পরিচিত এই নারী প্রধানমন্ত্রীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করত। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ এবং বিখ্যাত ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে অংশগ্রহণ আমার কাছে খুবই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মিসেস থ্যাচারকে সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় ব্রিটেনের গত ১০০ বছরের ইতিহাসে সর্বোত্তম দুজন প্রধানমন্ত্রীর একজন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী এবং ১৯৭৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৮২ সালে আর্জেন্টিনার দখল থেকে ফকল্যান্ড উদ্ধারে তাঁর সাহসী ভূমিকা ব্রিটেনবাসীর মন জয় করে। আরেকজন নারী, যাঁর নাম আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছিলাম এবং শ্রদ্ধা করি, তিনি হলেন ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এই সফরে এসে বিখ্যাত বাকিংহাম প্যালেসে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ ও মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ আমার জন্য আরেক স্মরণীয় ঘটনা। প্রিন্স চার্লসও ওই ভোজে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সফরে এলে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমি উপস্থিত ছিলাম। লন্ডনে সফরসূচির মধ্যে ছিল ওয়েস্টমিনস্টারে হাউস অব কমন্সের স্পিকারের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন এমপির সঙ্গে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ। সফরসূচির মধ্যে আরও ছিল লন্ডনের অদূরে হেটফিল্ডে ব্রিটিশ অ্যারোস্পেসের কারখানা পরিদর্শন এবং সিটি হলে লন্ডনের মেয়রের দেওয়া নৈশভোজে অংশগ্রহণ।

ব্রিটেন সফরের পরই ছিল পাঁচ দিনের ফ্রান্স সফর। ওই সফরের পর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেরার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদের ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তা মনে রাখার মতো। সে তুলনায় যুক্তরাজ্যে দেওয়া সংবর্ধনা যৎসামান্যই বলা যায়। এলিসি

প্যালেসের রাষ্ট্রীয় ভোজও ছিল অনন্য ও অনবদ্য। ১৭১৮ সালে নির্মিত এই প্যালেস ১৮৭৩ সাল থেকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টদের সরকারি বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এরই উল্টো দিকে অবস্থিত এলিসি প্যালেস হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। প্যারিসের রাষ্ট্রীয় সফর শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের অ্যাভিনিউ দ্য চ্যাম্পসে এলিসির অপর প্রান্তে অবস্থিত আর্ক দ্য ট্রায়ম্ফে গার্ড অব অনার ও পুষ্পস্তবক স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এই সৌধ নেপোলিয়নের বিভিন্ন বিজয়স্মৃতি রক্ষায় তৈরি করা হয়। ১৮০৬ সালে এর নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৮৩৬ সালে। ১৯২০ সালে এর আর্চের নিচে প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত অজ্ঞাত এক সেনার মরদেহ সমাহিত করা হয়। তারপর প্রজ্বালন করা হয় চিরস্থায়ী অগ্নিশিখা। বিখ্যাত আইফেল টাওয়ারসহ কয়েকটি দর্শনীয় স্থানও দেখার সুযোগ হলো। এক কালের একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী এ দুই ঔপনিবেশিক শক্তির অনেক কিছুরই তুলনামূলক চিত্র চোখে ধরা পড়ল। দুই দেশেই ঔপনিবেশিক আমলের ঐতিহ্য, শানশওকত আর চাকচিক্য এখনো বহাল আছে। তবে আমার কাছে মনে হলো, এদিক দিয়ে ফ্রান্সই এগিয়ে আছে।

সে বছরেরই জুলাই মাসে আবার বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যাওয়ার আমন্ত্রণ আসে। এবার বিখ্যাত ব্যাস্তিল দিবসের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশাল উৎসব দেখার সুযোগ হলো। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই ব্যাস্তিল দুর্গ (যেখানে রাজনৈতিক বন্দীদের রাখা হতো) আক্রমণের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা হয়। ফ্রান্সের জাতীয় দিবস এটি। এই উৎসবে উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের শতাধিক রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান উপস্থিত ছিলেন। প্যারিসের ঐতিহাসিক কনকর্ড স্কয়ারে অনুষ্ঠিত সামরিক প্যারেড ও রাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সত্যিই মনে রাখার মতো ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বুশও (সিনিয়র) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হোটেলে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে দেখা করতে যাঁরা আসেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের অনেক দেশ সফরে আমি তৎকালীন প্রেসিডেন্টের সব কটিরই সফরসঙ্গী ছিলাম। পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স ছাড়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে এবং একটি ছোট অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওয়াশিংটনে, আরও পরে রাষ্ট্রীয় সফরে ইতালি, বেলজিয়াম ও ন্যাম সম্মেলন উপলক্ষে বেলগ্রেডে যাই। এ ছাড়া প্যারিসে দুবার ও রোমে একবার

যাত্রাবিরতির জন্য থাকতে হয়েছিল। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো সফরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জাপানের টোকিওতে সম্রাট হিরোহিতের শেষকৃত্যে একবার এবং পরের বছর নতুন সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের অনুষ্ঠানে আরেকবার যোগ দেওয়ার ঘটনা। সফর তালিকায় আরও ছিল ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, ইরাক, তুরস্ক ও সর্বশেষ মালদ্বীপ। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে কমনওয়েলথ সম্মেলন এবং মালদ্বীপের মালেতে পঞ্চম সার্ক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। এর মধ্যে যাত্রাবিরতির জন্য তিনবার সৌদি আরব এবং একবার সিঙ্গাপুরে যেতে হয়। সৌদি আরবে যাত্রায় দুবার পবিত্র মক্কায় ওমরাহ পালন করার এবং রাসুল (সা.)-এর রওজা মোবারক জিয়ারতে পবিত্র মদিনায় যাওয়ার সুযোগ হয়।

১৯৮৯ সালের জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে জেনারেল এরশাদের মন্ত্রিপরিষদের এক কালের মন্ত্রী মওলানা আবদুল মান্নান (প্রয়াত) রাতে টেলিফোন করে জানালেন, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের দাওয়াতে প্রেসিডেন্ট ইরাকে যাচ্ছেন আগামী সপ্তাহে। এ ব্যাপারে আমি যেন যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণের কাজ শুরু করি। প্রেসিডেন্ট যে বাগদাদ সফরে যাবেন, কথাটা এই প্রথম শুনলাম। সাধারণত বছরের শুরুতেই তিনি কোন কোন দেশ সফরে যাবেন, তার একটা মোটামুটি ধারণা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিয়ে থাকে। তা না হলেও সফরের মাস খানেক আগে ব্যাপারটা সম্পর্কে অবশ্যই জানা যেত। অথচ এক সপ্তাহের কম সময়ে এ সফরের কথা শুনলাম। তা-ও এমন একজন বলছেন, যিনি সরকারের সঙ্গে বর্তমানে কোনোভাবে সম্পর্কিত নন। সম্ভবত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও কিছু জানে না। আমি বললাম, প্রেসিডেন্টের বিদেশ সফরের প্রাথমিক কাজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করে থাকে; চূড়ান্ত হলে আমাকে জানাবে এবং তখন প্রয়োজনীয় কাজ করা হবে। তিনি বললেন, সব কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেই আমাকে টেলিফোন করেছেন।

পরের দিন সকালে প্রেসিডেন্ট নিজে আমাকে তাঁর এই সফরের কথা জানালেন। আরও জানালেন, মওলানা মান্নানকে যেন তাঁর সফরসঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত করি। মওলানা মান্নান মাঝেমধ্যে রাতে আমাকে টেলিফোন করতেন প্রেসিডেন্টকে রাজনৈতিক কোনো অনুষ্ঠানে নেওয়ার প্রোগ্রাম জানাতে। তাঁর এলাকায় এবং মাদ্রাসাশিক্ষকদের একাংশকে নিয়ে তিনি যে প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, তার কোনো কোনো অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্টকে প্রধান অতিথি করে কয়েকবারই তিনি নিয়ে গেছেন। প্রতিবারই তিনি সেনাভবনে (প্রেসিডেন্টের

বাসভবন) গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করে আমাকে জানাতেন। পরের দিন হয়তো আমাকে প্রেসিডেন্ট বলতেন।

মওলানা মান্নান যে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ, সেটা তিনি হাবভাবে মাঝেমধ্যেই প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। বাগদাদ সফরের সব ব্যবস্থা পাকা করে এবার আরও প্রমাণ করলেন যে, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে। ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ইরাক সফরের অনেক কিছুই মওলানা মান্নানই চূড়ান্ত করলেন। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাগদাদ দূতাবাসের কাজ কমে গেল। ১৩ আগস্ট বাগদাদে পৌঁছাল প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে এরশাদকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানান। তিন দিনের সফরে প্রথাগত দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে আলোচনা ও রাষ্ট্রীয় ভোজ ছাড়া উল্লেখযোগ্য ছিল বাগদাদের কয়েকটি জায়গায় নির্মিত বিশাল আকারের কিছু স্থাপত্য, স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর পরিদর্শন। প্রায় সর্বত্রই দেখা গেল সাদ্দামের বিশাল আকৃতির প্রতিকৃতি ও মূর্তি। বাগদাদের ৩৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত নাসিরিয়া শহরের উপকণ্ঠে অতি প্রাচীন সামারিয়া সভ্যতার রাজধানী উরের খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের নিদর্শন দেখতে গেলাম। হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ (আ.) এখানে জন্মগ্রহণ করেন। বাইবেলে এর উল্লেখ রয়েছে। সেদিনই বিশেষ বিমানে ইরাকের অন্যতম বিখ্যাত শহর বসরায় গেলাম। তখনো সেটা যুদ্ধবিধ্বস্ত, অনেক অংশই পরিত্যক্ত। মাত্র ১০-১২ মাস আগে জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় ইরানের সঙ্গে ইরাকের আট বছরের যুদ্ধের অবসান ঘটে। বসরা শাত-ইল আরব নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর সম্মিলিত ধারা শাত-ইল আরব নামে পরিচিত। ১৯৮৭ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরানি বাহিনী এ শহরের পূর্ব তীরের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং শহর ও তার আশপাশে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে শহরের ক্ষতবিক্ষত চিত্র আমাদের দেখানো হলো। নদীর তীরবর্তী দালানগুলোর অধিকাংশই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত। এখানকার অধিবাসীরা তখন শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ইরাকি বাহিনী দাবি করে, তাদের তীব্র বাধার মুখেই প্রতিপক্ষ নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছিল। বসরার নদীতীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সাদ্দামসহ ইরাকি যোদ্ধাদের সারি সারি মূর্তি। আমাদের বাগদাদ সফর করতে হয়েছিল কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে, যা অন্য কোনো দেশ সফরের সময় দেখিনি। যাঁরা শহরের হোটেলে ছিলেন, তাঁরা জানালেন তাঁদের নানা দুর্ভোগের কথা। সাদ্দামের সঙ্গে আমাদের প্রেসিডেন্টের কখন ও কোথায় সাক্ষাৎ হবে, আগে থেকে সেটা জানা

কঠিন ছিল। তাঁদের প্রতিটি সাক্ষাতের সময়ই মওলানা মান্নানের উপস্থিতিতে ছিল লক্ষণীয়। বাগদাদ পৌঁছার পরপরই তিনি আমাকে বেশ গর্বভরে বলেছিলেন, ঢাকা ফিরতে বাংলাদেশ বিমানের দরকার হবে না। তিনি বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করছেন। ফেরত আসার আগের রাতে জানালেন, ইরাকি প্রেসিডেন্টের বিশেষ বিমানটি আমাদের ঢাকায় পৌঁছে দেবে।

পরের দিন আমরা সেই বিমানেই ঢাকায় পৌঁছলাম। মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের তাঁর বিশেষ যোগাযোগের মাধ্যমে মওলানা মান্নান যে প্রেসিডেন্ট এরশাদের কাছ থেকে নানা ধরনের ফায়দা আদায় করে নিতেন, সেটা আমি লক্ষ করেছি। আমাদের সফরের এক বছরের মাথাতেই ইরাকের এই স্বৈরশাসক কুয়েত দখল করে মধ্যপ্রাচ্যে এক অশুভ সময়ের সূচনা করলেন।

১৯৮৯ সালের জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফরাসি বিপ্লবের দ্বিতীয় শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্যারিসে যাওয়ার পথে যাত্রাপথে প্রেসিডেন্ট এরশাদের জেদ্দায় যাত্রাবিরতি, পবিত্র মক্কায় ওমরাহ্ পালন ও পরের দিন তাঁর মদিনায় মহানবীর (সা.) রওজা মোবারক জিয়ারতের সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হলো। এই সফর আমাকে খুবই উদ্দীপ্ত ও পুলকিত করে তোলে। কোনো মুসলমানের পক্ষে ওই পবিত্র দুই নগর দর্শনে যাওয়া, ওমরাহ ও হজব্রত পালন করা অতি পুণ্যের কাজ। সামরিক সচিবের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ ধরনেরই একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। জানতাম, প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রায়ই ওমরাহ্ করতে যান। ক্ষমতায় থাকার সেই সময়টায় যখনই তিনি পাশ্চাত্যের কোনো দেশ ভ্রমণে বের হতেন, তখন যাত্রাবিরতি করে তাঁর মক্কা-মদিনায় যাওয়া অনেকটা রুটিন হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে জেদ্দা পৌঁছেই যথারীতি এহরাম বেঁধে রওনা হলাম। প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গীরা ছাড়াও রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম দস্তগীরসহ দূতাবাসের আরও কয়েকজন আমাদের সঙ্গী হলেন। যাত্রার শুরু থেকেই এক অপূর্ব অনুভূতি পেয়ে বসল আমাকে। যতই পবিত্র মক্কার নিকটবর্তী হচ্ছিলাম, ততই মনে হচ্ছিল, মহান আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত অনেক নবী ও শেষ রাসুল মোহাম্মদ (সা.)-এর পদচারণ-ভূমির দর্শন লাভ করে আমি আমার জীবন ধন্য করতে যাচ্ছি। মনের পটে অনেক ছবি ভেসে উঠছিল। একসময় নজরে পড়ল, উঁচুতে পবিত্র নগরের একটা অংশ। অল্পক্ষণের মধ্যেই হেরেম শরিফের প্রধান গেটে এসে পৌঁছলাম। একটু পরই নজরে পড়ল কাবা শরিফ। এই সেই গৃহ, যার সম্বন্ধে কত ঘটনাই না পড়েছি ও শুনেছি! তাওয়াফ ও হজরে আসওয়াদে চুম্বন সেরে কাবাঘরের দরজার পাশে দুই রাকাত নামাজ পড়ে বসলাম আল্লাহর

দরবারে মোনাজাত করার জন্য। বিশ্বাসই হচ্ছিল না, শত শত মাইল দূর থেকে যে কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে আসছিলাম, তারই গা ছুঁয়ে আজ মোনাজাত করতে বসেছি। নামাজ আদায় করার পরপরই আমাদের কাবাঘরের ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করা হলো। সে আরেক বিস্ময়। প্রায় ১০ ফুট উঁচুতে কাবা শরিফের একমাত্র দরজায় লাগানো হলো একটা বিশেষ ধরনের সিঁড়ি। ১৫-১৬ জন লোক সেটা ধরাধরি করে কোথা থেকে যেন এনে লাগিয়ে দিল। বিশেষ রাষ্ট্রীয় মেহমানদেরই কেবল কাবা শরিফের ভেতরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ভেতরটা অন্ধকার, স্বল্প আলোর কয়েকটা মাত্র বাতি জ্বালিয়ে আমাদের তার ভেতরটা ঘুরে দেখার ব্যবস্থা করা হলো। কালো রঙের পাথরের চার দেয়ালে আরবিতে লেখা রয়েছে পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত। দোভাষীর মাধ্যমে একজন বর্ণনা করছিলেন অভ্যন্তরের নানা ইতিহাস। মনে ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি তখন চরম পর্যায়ে। মুসলমানমাত্রই এই ঐতিহাসিক ঘরটিকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখে থাকেন। পবিত্র কাবাঘরের ভেতরে প্রবেশ করার এই সুযোগ ছিল আমার জীবনের এক পরম পাওয়া। এখানকার চার দেয়ালের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া যায়। আকুল মনে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলাম। কাবা শরিফ থেকে বের হয়ে গেলাম বিখ্যাত নহর আবে জমজমের কাছে। তারপর সাফা-মারওয়ার আনুষ্ঠানিকতা সেরে আসরের নামাজ সেরে জেদ্দায় ফিরলাম। পরের দিন গেলাম পবিত্র মদিনায়। মসজিদে নববিতে মহানবীর (সা.) রওজা মোবারক ও ভেতরের দিকে তাঁরই আবাসস্থলের কিছু অংশ দেখারও সুযোগ হলো। যেখানে রাসুল (সা.) নামাজ পড়তেন, সেখানেই আমরা জোহরের নামাজ আদায় করলাম। একটি হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ সেরে বিকেলেই জেদ্দায় ফিরে এলাম। সেদিন রাতেই পিআইএর একটি ফ্লাইটে প্যারিসের উদ্দেশে আমরা যাত্রা করি।

কয়েক মাস পর, অর্থাৎ ১৯৯০ সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে আবার পবিত্র মক্কা-মদিনা সফরের সুযোগ এল। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এবার ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন। এই সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য 'বাইবেল স্টাডি প্রেয়ার গ্রুপ' নামের একটি খ্রিষ্টধর্মীয় সংগঠনের আমন্ত্রণে ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে অংশগ্রহণ করা। যাত্রাবিরতি করবেন জেদ্দায় আর বিশেষ সওয়াব হাসিলের জন্য যাবেন পুণ্যস্থান মক্কা-মদিনায়। পরের দিন যোগ দেবেন অন্য ধর্মের একটি অনুষ্ঠানে। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির প্রথম বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে যে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকেন প্রধান অতিথি। এতে বিশ্বনেতাদেরও আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

আগের মতোই জেদ্দায় পৌঁছেই বিকেলে মক্কা শরিফের উদ্দেশে রওনা হতে গিয়ে হোটেলের লবিতে আমরা সমবেত হলাম। একটু পর প্রেসিডেন্টও নেমে এলেন। সৌদি আরবে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম দস্তগীরসহ সফরসঙ্গীরা সবাই অপেক্ষা করছি। এমন সময় প্রেসিডেন্ট গাড়ির দিকে না গিয়ে এডিসির কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে এডিসির সঙ্গে রাগতস্বরে কথা বলতে শুনলাম। তার পরই দেখলাম, এডিসি লিফটের দিকে ছুটছেন। এরই মধ্যে নজরে পড়ল কালো বোরকা পরিহিত এক নারী। চিনতে অসুবিধা হলো না; তিনি জিনাত মোশাররফ। তৎকালীন শিল্পসচিব মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী। সঙ্গে তিনিও আছেন। তাঁদের দেখে অনেকটা অবাক হয়ে গেলাম। প্লেনে তাঁদের দেখিনি। সম্ভবত অন্য কোনো এয়ারলাইনসে আগেই পৌঁছেছেন। এরশাদ ও জিনাত মোশাররফের বিশেষ বন্ধুত্বের বিষয়টি দেশে খুব একটা গোপনীয় ছিল না। সেই বন্ধুত্বের ধারা যে মুসলমানদের পবিত্রতম স্থান কাবা শরিফ ও মদিনায় মসজিদে নববিতে মহানবীর রওজা মোবারক সফর করা পর্যন্ত গড়াবে, সে কথা কল্পনাও করিনি। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাধ্য হয়ে তাঁদের সঙ্গে থেকেই ওমরাহর সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে রাতেই জেদ্দায় ফিরলাম। পরের দিন সকালে বিশেষ বিমানে করে মদিনা শরিফেও তাঁরা আমাদের সঙ্গী হলেন। ওই রাতেই সৌদিয়া এয়ারলাইনসের বিমানে নিউইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে এবারের পবিত্র মক্কা-মদিনা সফরটিকে স্বাভাবিক ধর্মীয় উচ্ছ্বাস ও অনুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারিনি। মনের এই বেদনা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি।

৩০ জানুয়ারি সকালে নিউইয়র্কে পৌঁছে কিছুক্ষণ হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে অন্য ফ্লাইটে বিকেলে ওয়াশিংটনে পৌঁছালাম। নিউইয়র্ক থেকে সঙ্গী হলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের তৎকালীন বিকল্প স্থায়ী প্রতিনিধি এরশাদের শ্যালক মহিউদ্দিন। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আতাউল করিম ও দূতাবাসের কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানান। থাকার ব্যবস্থা করা হলো ম্যাডিসন হোটেলে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সরকারি আতিথেয়তার ব্যবস্থা করলেও নিরাপত্তা ও ন্যূনতম প্রটোকলের ব্যবস্থা করল। সে দেশের সিক্রেট সার্ভিসের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থার অধীনেই থাকতে হলো। হোটেল ছাড়াও প্রেসিডেন্ট যখন যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই তাঁর সঙ্গে থাকছেন সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা। অবশ্য আমাদের পিএসএফ (প্রেসিডেন্টস সিকিউরিটি ফোর্স। এখন স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স) অফিসাররা তো আছেনই। বিব্রতকর ও অপছন্দনীয় হলেও প্রেসিডেন্টকে এই নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার মধ্যে পাঁচ-

পাঁচটা দিন কাটাতে হলো। ৩০ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওয়াশিংটনে অবস্থানকালে প্রেসিডেন্টের কর্মসূচিতে ১ ফেব্রুয়ারি সকালে ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে অংশগ্রহণ ছাড়াও ছিল ২ ফেব্রুয়ারি হোয়াইট হাউসের সামনে অবস্থিত প্রেসিডেন্টের অতিথিশালা ব্লেয়ার হাউসে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করা। চিফ অব প্রটোকলের আমন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ছাড়া আমাদের দিক থেকে আমন্ত্রিত ছিলেন রাষ্ট্রদূত আতাউল করিম, অতিরিক্ত পররাষ্ট্রসচিব এম মহসিন (তিনি আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন) এবং আমি ও মহিউদ্দিন। অন্য ১১ জন আমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে ছিলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ারের ডেপুটি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট টু প্রেসিডেন্ট, পিস কোর, এইড ও ইউএসআইয়ের কর্মকর্তারা। আর ছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি টেরিস্টা সেফার্স ও তাঁর স্বামী বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত সেফার্স। উল্লিখিত কর্মসূচি ছাড়া রাষ্ট্রদূত আতাউল করিমের বাসায় সান্ধ্যভোজে আমরা সবাই যোগ দিই। বাকি সময় প্রেসিডেন্ট নিজস্ব কর্মসূচি অনুযায়ী সময় অতিবাহিত করেন। ম্যাডিসন হোটেলে কয়েকজন সাক্ষাৎও করেন তাঁর সঙ্গে। অবসর সময়ে তিনি কয়েক জায়গায় যান। উল্লেখ্য, জিনাত মোশাররফ ও তাঁর স্বামীও ওয়াশিংটনে পৌছান এবং অন্য একটি হোটেলে ওঠেন। ফেরার পথে আমরা প্যারিসে যাত্রাবিরতি করি। লক্ষ করলাম, জিনাত মোশাররফ ও তাঁর স্বামীও আলাদা ফ্লাইটে সেখানে হাজির এবং উঠলেন অন্য একটি হোটেলে। সেখানে কোনো সরকারি কর্মসূচি না থাকায় প্রেসিডেন্ট নিজের মতো করে সময় কাটান তাঁদের সঙ্গেই। রাতে প্যারিসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তোজাম্মেল হোসেন প্রেসিডেন্টের খোঁজে হোটেলে আসেন। তাঁকে না পেয়ে আমার স্যুটে আসেন। আমি কিছু জানি না শুনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন বলে মনে হলো। আমরা, অর্থাৎ সফরসঙ্গীরা যার যার মতো প্যারিসের নানা দর্শনীয় জায়গা দেখে দিন দুই কাটালাম।

সে বছরের সেপ্টেম্বরে আবারও নিউইয়র্ক সফরে যেতে হলো। সেবার প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বেগম রওশন এরশাদ তাঁর সফরসঙ্গী। সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়া ছাড়াও প্রেসিডেন্টের কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের (সিনিয়র) সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎপর্ব আমার কাছে যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। নিউইয়র্কের এক অতি সুরক্ষিত বহুতল ফ্ল্যাটে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। নানা কিসিমের নিরাপত্তাবেষ্টনী পেরিয়ে ফ্ল্যাটের কোনো এক উঁচু তলার এক কক্ষে গিয়ে বসলাম। প্রেসিডেন্ট ছাড়া

আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, আমি ও প্রেস সচিব। অল্পক্ষণ বসতেই প্রেসিডেন্ট বুশ এলেন। সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করা শেষে তিনি আমাদের প্রেসিডেন্টের পাশে বসলেন। তাঁদের পক্ষে চার-পাঁচজনের মধ্যে সেক্রেটারি অব স্টেট বিল রোজার্সের কথা মনে আছে। সে সময় কুয়েত ইরাকের দখলে এবং সৌদি আরবও হুমকির মুখে। কুয়েত পুনরুদ্ধারের কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি তখন সামরিক প্রস্তুতিও চলছে। বলা বাহুল্য, এর মুখ্য নেতৃত্ব দিচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্র। আলোচনায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে যে তাঁর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক রয়েছে, সে কথা উল্লেখ করে বললেন, সাদ্দাম সহজে দমার পাত্র নন। কূটনৈতিক প্রয়াস ও শক্তি প্রদর্শনের মহড়ায় কোনো কাজ হবে না। এরশাদের পরামর্শকে বুশ যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হলো। তিনি কয়েকবারই এরশাদের বক্তব্যের প্রতি রোজার্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রায় ৩০ মিনিটের বৈঠকে কুয়েত-ইরাক বিষয়টিই প্রাধান্য পেল। এরপর সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো আরেকটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্টে। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সঙ্গে এরশাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা নির্ধারিত ছিল। তাঁর সঙ্গে এরশাদের অনেকক্ষণ আলাপ হলো। ব্যক্তিগতভাবে কার্টারকে আমার কাছে খুবই ভালো লাগত। এবার সামনাসামনি পেয়ে তাঁর আন্তরিকতা ও বন্ধুসুলভ ব্যবহারে আরও মুগ্ধ হলাম। বারবার মনে হলো, এই লোকটিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে কেন নির্বাচিত করেনি!

আরও কয়েকটি সরকারি-আধা সরকারি কর্মসূচি শেষে এরশাদ স্ত্রী রওশন এরশাদ ও ছেলে সাদকে নিয়ে কলোরাডোর ডেনভারে চলে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন হাতেগোনা কয়েকজন সফরসঙ্গী। উল্লেখ্য, তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল রফিকুল হকও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। আমি এবং প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গীদের বেশির ভাগই থেকে গেলাম নিউইয়র্কে। আমরা যেন দিন সাতেকের জন্য ছুটিই পেয়ে গেলাম। যার যার সুবিধামতো আমি ও চিফ অব প্রটোকল ব্রিগেডিয়ার মুনসুর আফজল নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনের কাছে ইউএনও প্লাজা হোটেলেই থেকে গেলাম। এখানে আসার পর প্রেসিডেন্টসহ আমাদের অনেকে এই হোটেলেই উঠেছিলাম। মোট ১৪ দিন এখানেই থেকেছি। এই সুযোগে আমার নিউইয়র্কের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার ও কয়েকজন বন্ধু, আত্মীয় ও বাঙালি পরিবারের বাসায় বেড়ানো সম্ভব হলো। প্রেসিডেন্টের বিদেশ সফর ঘিরে নেপথ্যে যেসব ঘটনা ও তৎপরতা চলতে

থাকে, তা নিয়ে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা হলো। সরকারি খরচে বিদেশ ভ্রমণের অপ্রতিরোধ্য আগ্রহ যেমন ওপরের স্তরে, তেমনি মধ্যম, এমনকি নিম্ন পর্যায়েও সমানভাবে কার্যকর থাকে। আর প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য দস্তুরমতো চলতে থাকে প্রতিযোগিতা, সুপারিশ-তদবির ইত্যাদি। প্রতিবারই কোনো না কোনো মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রীদের জোর সুপারিশ আসতে থাকে। সফরের আগে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নামগুলো আসত প্রেসিডেন্টের নিজের বিভাগের (পারসোন্যাল ডিভিশন) প্রধান সামরিক সচিবের কাছে। প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত স্টাফদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রণীত তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আমি প্রেসিডেন্টের কাছে উপস্থাপন করতাম। প্রায় সময়ই প্রেসিডেন্ট আমাকে তালিকা ছোট রাখতে বলতেন। সেই চেষ্টা করতে গিয়ে আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হতো। এমন কারও কারও নাম আসত, যাঁদের সফরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এর আগে তাঁদের অনেকে কয়েকবার বিদেশ ঘুরে এসেছেন। এমন লোকজনকে বাদ দিলে চলত সুপারিশ বা তদবির। কখনো কখনো চাপও সৃষ্টি করা হতো। এমনও হয়েছে, প্রেসিডেন্ট স্বয়ং কারও নাম কেটে বাদ দিয়েছেন, পরে আবার তাঁকে তালিকাভুক্ত করতে হয়েছে। একবার এক ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব আমাকে খুব করে ধরলেন, যাতে তাঁর নাম নিউইয়র্ক সফরের তালিকায় থাকে। বললেন, মন্ত্রী তাঁর নাম পাঠাবেন। নাম দেখে প্রেসিডেন্ট কেটে দিয়ে আমাকে বললেন, জাতিসংঘে তাঁর তো কোনো কাজই নেই। পরের দিন মন্ত্রী এসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে তালিকায় আবার তাঁর নাম ওঠালেন। সেবার ১৪ দিন নিউইয়র্ক অবস্থানকালে জাতিসংঘ ভবন চত্বরে বা আমাদের মিশন দপ্তরে কোথাও তাঁকে দেখিনি। শুধু একদিন তাঁকে হোটেলের লবিতে দেখলাম। আমার কাছে গর্ব করেই বললেন, তিনি তাঁর শ্যালকের বাসায় উঠেছেন এবং তাঁর নিজের ট্যাক্সিক্যাব তাঁকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে। অথচ সরকারি কোষাগার থেকে তিনি হোটেল ভাড়া ও অন্যান্য ভাতা ঠিকই নিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত স্টাফদের এমন কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হতো, যাঁরা কোনো সফরেই বাদ পড়েননি (অন্তত আমার দায়িত্বকালে)। প্রেসিডেন্টকে একবার একজন সম্বন্ধে বললাম, তাঁর তো কোনো কাজই নেই। তিনি সম্মত হলেন, কিন্তু পরে তাকে নিতে হলো। বিদেশ সফরের সঙ্গে যুক্ত এ রকম আরও অনেক অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার-স্যাপার দেখেছি, সেগুলো পরিহার করা কঠিন ছিল না। তাতে সরকারি অর্থব্যয় কম হতো।

১৯৮৯ সালের শেষ দিকে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট কোরাজন অ্যাকুইনোর আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের সফরে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরশাদ সস্ত্রীক ম্যানিলায় যান। তাঁর সফরসঙ্গী হয়ে এবার আরেক ধরনের অভিজ্ঞতা হলো। যাওয়ার চতুর্থ দিন সকাল থেকেই সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস আসতে থাকে। বিকেলে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সব প্রোগ্রাম বাতিল করা হয় এবং সবাইকে হোটেলে অবস্থান করতে বলা হয়। আমরা অবস্থান করছিলাম বিখ্যাত ম্যানিলা হোটেলে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ফিলিপাইন দখলের পর প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার মার্কিন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ম্যাক আর্থারের হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছিল এই হোটেলে)। হোটেলের অবস্থান ছিল ম্যানিলা বে-র ঠিক পূর্ব তীরে। হোটেলের রুমে বসেই পশ্চিম দিকে বহুদূর পর্যন্ত সাগর দেখা যায়। হোটেল কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য ঝড়ের কবল থেকে রক্ষার জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা নিল। সন্ধ্যার পরপরই ঝড় শুরু হয়ে গেল। শেষ রাতের দিকে সেই ঝড় ধারণ করল প্রচণ্ড রূপ। সকাল আটটায় খবর এল ম্যানিলা বিমানবন্দরে অবস্থানকারী বাংলাদেশ বিমানের ডিসি-১০ বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশে রাখা অন্য একটি ছোট বিমান ঝড়ের তোড়ে উড়ে এসে আমাদের বিমানটিকে আঘাত করেছে। এ সংবাদ শুনে প্রেসিডেন্ট তো ভীষণ রেগে গেলেন। প্রথমেই আমাকে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন, ডিসি-১০ এখানে থাকছে কেন? তাঁর প্রশ্নের জবাব আমার জানা ছিল না। আমার জানারও কথা নয়। সে হোটেলেই অবস্থান করছিল বিমানের এমডি অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন শওকতুল ইসলাম। তাঁকে ডাকা হলো। এরই মধ্যে চলে আসেন ফিলিপাইনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল রামোস (পরবর্তী সময়ে তিনি ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট হন) ও আমাদের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মান্নাফ। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমানের এমডি চলে আসেন। তিনি যে আমাদের সঙ্গে এসেছেন, এটা শুনে প্রেসিডেন্ট আরও রেগে গেলেন। কৈফিয়ত চাইলেন ডিসি-১০ ঢাকায় চলে গেল না কেন? এখানে রাখা হলো কার নির্দেশে এবং তিনিও এলেন কার অনুমতি নিয়ে। প্রচণ্ড রাগারাগি ও চাপের মধ্যে থেকেও বিমানের এমডি খুবই সুন্দরভাবে সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ের ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি যা ব্যাখ্যা দিলেন, তা শুনে প্রেসিডেন্ট শুধু শান্তই হলেন না, মনে হলো, কিছুটা লজ্জিতও হলেন। অনেক বিষয়ই যে প্রেসিডেন্টের জ্ঞাতসারে হয় না এবং সব নিয়মকানুন যে তাঁর জানা নেই, সেটা বোঝা গেল। বিমানের এমডির ব্যাখ্যাগুলো জানার মতো। ভিভিআইপিদের ভ্রমণ বিষয়ে নানা

বিধিবিধান রয়েছে, তা-ই পূরণ করে চলেছে বাংলাদেশ বিমান। বিমানের আর্থিক ক্ষতি হলেও বিমান কর্তৃপক্ষকে বিধান মেনে চলতে হচ্ছে। এমনটাই জানালেন বিমানের এমডি গ্রুপ ক্যাপ্টেন শওকতুল ইসলাম। তিনি হিসাব করে দেখিয়ে দিলেন, ডিসি-১০ বিমানটি ম্যানিলা বিমানবন্দরে রাখাটাই যুক্তিসংগত ও আর্থিক দিক দিয়ে কম ক্ষতিকর ছিল। আরও যে দিকগুলো তিনি তুলে ধরলেন, তা-ও কম গুরুত্ববহ ছিল না। ভিভিআইপি, অর্থাৎ প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমানে এমডির থাকাটা সরকারেরই করা বিধান, যার জন্য আলাদা অনুমোদন নিতে হয় না; শুধু মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হয়। বিমানের এমডি তখনই জানালেন, ঢাকা থেকে স্ট্যান্ডবাই ডিসি-১০ প্লেনটি রওনা হয়ে গেছে। তখনই জানতে পারলাম, ভিভিআইপি ফ্লাইটের জন্য ঢাকা বিমানবন্দরে একটি বিমানকে ক্রুসহ তৈরি রাখার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ, একই সময়ে দুটি বিমান যাত্রী বহন করা থেকে বিরত থাকে। মজার বিষয় হলো, সেবার ডিসি-১০ বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আমাদের ঢাকায় ফেরত আসায় তেমন বিলম্ব ঘটেনি। কাজেই অনুমান করা কঠিন নয়, কেন বাংলাদেশ বিমান মুনাফার মুখ দেখে না। তেমন অবস্থা যে এখনো চলছে, সেটা বলাই বাহুল্য।

ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটি ফেরত আনতে কয়েক দিন লেগে যায়। এর পেছনে বিমানের কত টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে, তা অবশ্য জানতে পারিনি। বাংলাদেশ বিমানের আর্থিক অসাফল্যের পেছনে ভিভিআইপিদের বিদেশ সফর একটি অন্যতম কারণ। আরেকটা কারণ ছিল, বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক হলেও কয়েকটি শহরে বিমানের ফ্লাইট চালু করার পেছনে রাজনৈতিক প্রভাব। নিউইয়র্ক ও টোকিওর সঙ্গে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু করা হোক—ওই দুটি জায়গায় বসবাসকারী বাংলাদেশিরা খুব চাইতেন। সরাসরি ফ্লাইট থাকলে যে তাঁদের যাতায়াতের খুবই সুবিধা হয়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিমানের যে আর্থিক ক্ষতি হতো, বিমান কর্তৃপক্ষ সেটা তুলে ধরলেও উচ্চতর মহল তার তোয়াক্কা করত না। করত না তাদের প্রতিষ্ঠানের সুনামহানি বা জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে, এই ধারা সব সরকারের আমলেই অব্যাহত থাকে, কেবল রাজনৈতিক স্বার্থজনিত কারণে।

তৃতীয় পর্ব

এরশাদের পতন

প্রথম অধ্যায়

গণ-অভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ

পতনের সূচনা

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুতে, অর্থাৎ ১৯৯০ সালের সূচনায় প্রেসিডেন্ট এরশাদের সামরিক কাম বেসামরিক সরকার নবম বছরে পদার্পণ করে। প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব হিসেবে আমার কার্যকাল তখন মাত্র এক বছর পূর্ণ হয়েছে। মনে হচ্ছিল, সরকারের অবস্থান যথেষ্ট সুরক্ষিত এবং বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর এরশাদের ভালো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাঁর সব সময়ের শত্রু বিরোধী রাজনৈতিক শিবির এবং আকস্মিক প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সৃষ্ট কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই ১৯৮৯ সাল কেটে যায়। ওই বছরটা মোটামুটি স্বচ্ছন্দে ও বাধাহীনভাবে পার হওয়ায় প্রেসিডেন্ট এরশাদের আত্মতুষ্টির যথার্থ কারণ ছিল। তিনি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য দাবি করতেন। দেশের ভেতরে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্ববহ সাফল্য ছিল বিরোধী দলগুলোকে দুর্বল ও বিভক্ত করা এবং রাজপথ থেকে দূরে রাখা। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের আমন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট এরশাদের ছয় দিনের ব্রিটেন সফর এবং পরবর্তীকালে চার মাসের মধ্যে দুবার ফ্রান্স সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কূটনৈতিক সাফল্য বলে অভিহিত করা হতো। তিনি ১৯৮৯ সালেই আরও সফর করেন বাগদাদ, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন উপলক্ষে বেলগ্রেড, ম্যানিলা এবং কমনওয়েলথ সম্মেলন উপলক্ষে কুয়ালালামপুর। গুরুত্বপূর্ণ

সরকারপ্রধানদের মধ্যে ওই বছর ঢাকা সফরে আসেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো ও চীনের প্রধানমন্ত্রী লি পেং। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়াঁ মিতেরাঁ ও জাপানি প্রধানমন্ত্রী কাইফুর ঢাকা সফরের বিষয়টিও ওই বছরেই চূড়ান্ত করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের বিদেশ সফর এবং বিদেশি প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের ঢাকা সফরকে সব সময়ই ক্ষমতাসীন সরকারের বৈদেশিক নীতির সাফল্য হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রচারগুরুত্বও অনেক। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এসব তথাকথিত দক্ষতার প্রায় আকাশছোঁয়া রেকর্ড এবং অতি আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে ১৯৯০ সালে বিদেশ সফরের পরিকল্পনা শুরু করেন। ওই তালিকার প্রথমেই ছিল ওয়াশিংটন সফর। ওখানে যাওয়ার পথে তিনি পবিত্র মক্কা ও মদিনা সফর করেন। ধর্মের প্রতি যে তাঁর বিশেষ ভক্তি রয়েছে, সেটা দেখানোই ছিল এ সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে তাঁর মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাব ও অশোভন আচরণ তুচ্ছ করার মতো ছিল না (প্রথম খণ্ডের শেষ অংশে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে)। আমার মনে হচ্ছিল, এ সফর থেকেই তাঁর পতনের দিন গণনা (কাউন্ট ডাউন) শুরু হয়ে যায়। বস্তুত, এরশাদ নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে অতি আত্মবিশ্বাসী দম্ভে অন্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ভুগছিলেন চরম আত্মতুষ্টিতে। ভেবেছিলেন, তিনি চমৎকারভাবে নিজেকে সবার নজর থেকে ঢেকে রেখেছেন। তার কাছে জবাবদিহির কোনো বালাই নেই। সবকিছুর ঊর্ধ্বে তিনি এবং সব ধরনের অপকর্ম করে পার পেয়ে যাবেন বলে মনে করেছিলেন তিনি। ওই সফর শেষ করে তিনি ১৯৯০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ফেরেন। ঠিক এর ১০ মাস পর, অর্থাৎ ১৯৯০-এর ৬ ডিসেম্বর অত্যন্ত অপমানজনকভাবে বাংলাদেশে তাঁর এই কলঙ্কজনক শাসনের অবসান ঘটে।

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর থেকে সম্মিলিত বিরোধী জোট নতুন করে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরের পর প্রেসিডেন্ট এরশাদকে হটানোর লক্ষ্যে তারা বড় ধরনের কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। এর প্রধান কারণ, বিরোধী দলগুলোর মধ্যে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মধ্যকার মতপার্থক্য। তবে সবকিছুর মূলে ছিল উভয় দলের দুই নেত্রীর ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। বিরোধী দলগুলোর জন্য এটা হতাশাব্যঞ্জক হলেও প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তাঁর পার্টির জন্য ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। তাঁকে প্রায়ই গর্বের সঙ্গে

বলতে শুনেছি, যত দিন এই দুই নেত্রী বিবাদে লিপ্ত থাকবেন, তত দিন তিনি ভালো থাকবেন। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে বিরোধী আন্দোলন দমনের ব্যাপারে নিজের কৌশল নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট গর্বিত ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ছিলেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে যখনই বিরোধী দলের আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা হতো, তিনি দম্ভ করে বলতেন, ১৯৮৭ সালে তিনি তাঁদের অল্প চেষ্টাতেই দমন করেছিলেন, কিন্তু এবার তিনি তাঁদের পুরোপুরি নির্মূল করে ছাড়বেন। কিন্তু এরশাদ ও তাঁর পরামর্শদাতারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে এবার বিরোধী জোটগুলো অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত এবং আন্দোলনের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত।

বিরোধী জোটগুলো ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে এবং সচিবালয়ের চারদিকে অবস্থান নেয়। পুলিশ পাহারায় চলাচল করা সামান্য কিছু যানবাহন ছাড়া রাস্তাঘাট প্রায় যানবাহনশূন্য ছিল। দোকানপাট ও বেসরকারি অফিসগুলো ছিল বন্ধ। তবে স্বল্পসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি অফিসগুলোর কাজকর্ম চলে। সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে সচিবালয়ের চারদিকে বিডিআর ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। চীনের কারিগরি সহায়তায় নির্মিত জলসেচের একটি ছোট বাঁধ উদ্বোধন করার জন্য বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্ট ঢাকা ছেড়ে রূপগঞ্জে যান। হরতালের দিন রাজধানী ছেড়ে বাইরে গিয়ে জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া ছিল এরশাদের একটা অন্যতম রাজনৈতিক কৌশল। এর ভেতর দিয়ে তিনি রেডিও ও টিভি মারফত দেখানোর চেষ্টা করতেন যে, হরতাল সফল হয়নি বা হরতালের ভয়ে তিনি ভীত নন। ডেপুটি কমিশনার (ডিসি বা জেলা প্রশাসক) ও এসপিদের (পুলিশ সুপার) সহায়তায় স্থানীয় জাতীয় পার্টির নেতারা এ ধরনের সভার আয়োজন করতেন। ওই দিনও এ জাতীয় রুটিন-ব্যবস্থার হেরফের হয়নি। ছোট্ট একটি বাঁধের উদ্বোধনের পর প্রেসিডেন্ট জনসভাস্থলে যান। জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল ঠিক শীতলক্ষ্যা নদীর পাড় ঘেঁষে। তিনি স্বভাবসিদ্ধভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর তীব্র সমালোচনা করেন এবং টিভি ক্রুরা বিটিভির সান্ধ্য খবরের জন্য জনসভার এমন কিছু কৌশলী ছবি তোলেন, যাতে সভাকে বিশাল জনসমুদ্র বলে মনে হয়। এর উদ্দেশ্য অতি সুস্পষ্ট, অর্থাৎ দেশি শ্রোতা-দর্শক ও বিদেশি কূটনীতিকদের দেখানো যে বিরোধীদের ডাকা হরতাল ব্যর্থ হয়েছে এবং গ্রামবাংলার মানুষের এখনো তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। ঢাকায় ফিরে আরও শুনতে পাই,

রাজনৈতিক বিক্ষোভ হিংস্র রূপ ধারণ করেছে, পুলিশকে গুলি ছুড়তে হয়েছে। তাতে কিছু লোক নিহত হয়েছে। আহতও হয়েছে অনেকে। ঘটেছে অনেক যানবাহন পোড়ানোর মতো ঘটনাও। সন্ধ্যা নাগাদ আরও জানতে পারি, বিভিন্ন স্থানে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচজনে।

পরদিন সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগে তিনি আমার অফিসে বসেন এবং গত দিনের সংঘর্ষের কথা বললেন। তাঁকে না জানিয়ে জাতীয় পার্টির কিছু নেতা যেভাবে হরতাল ঠেকানোর ব্যবস্থা করেছেন, তা নিয়ে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। বললেন, গতকালের নিহত পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে দুজন মাত্র মারা গেছেন পুলিশের গুলিতে। আল্লাহওয়ালা ভবনে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিক্ষোভকারীদের হামলা হতে পারে—এ রকম অনুমান করে আগেই ভবনটি পাহারা দেওয়ার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। ভবনের সামনে দিয়ে যখন বিএনপির মিছিল অতিক্রম করছিল, তখন ভবনের ভেতর থেকে মিছিলটি লক্ষ্য করে গুলি করা হয় এবং তাতে তিন ব্যক্তি নিহত হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী, কর্তব্যরত পুলিশ জাতীয় পার্টির বন্দুকধারীদের ওপরতলায় উঠতে দেখে তাঁদের পথ রোধ করে, কিন্তু প্রেসিডেন্টের অফিসের নির্দেশ পেয়ে তারা তাঁদের ওপরে উঠতে দিয়েছে। পরদিন কিছু কিছু পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আল্লাহওয়ালা ভবন থেকে ছোড়া গুলিতেই তিন ব্যক্তি নিহত হয়। এ ঘটনা সম্মিলিত বিরোধী দলের আন্দোলনকে আরও বেগবান হতে সাহায্য করল। সাহায্য করল আরও বেশিসংখ্যক মানুষকে আন্দোলনে নামানোর মতো একটা ইস্যু সৃষ্টিতে। এরশাদ ও তাঁর দলের নেতারাই সেই সুযোগ বিরোধীদের হাতে তুলে দিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হলো। হরতাল শেষে অনুষ্ঠিত হলো জনসভার পর জনসভা; এবং এসব জনসভারই একটিতে পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহত হয় আরও একজন।

বিরোধী জোটগুলোর আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ছিল ১০ নভেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন। ওই দিনই সকালে বেগম রওশন এরশাদ ও ছেলে সাদসহ প্রেসিডেন্ট এরশাদের টোকিওর উদ্দেশে যাত্রা করার কথা। কিন্তু হরতালের কারণে তাঁদের এক দিন আগেই, অর্থাৎ ৯ নভেম্বর বেলা ১১টায় ঢাকা ত্যাগ করতে হয়। বিমানবন্দরে বিদায়ী সংবর্ধনার অনুষ্ঠান যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্যই পরিকল্পনা পাল্টাতে হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট,

মন্ত্রী অন্যরা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অন্য সময়ের মতো একইভাবে প্রেসিডেন্টকে বিদায় জানান। জাপানে সম্রাট আকিহিতোর অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও বেগম রওশন এরশাদ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমাদের যাত্রাবিরতি ঘটে এক রাতের জন্য ব্যাংককে। পরদিন, অর্থাৎ ১০ নভেম্বর (১৯৯০) আমরা টোকিওতে পৌঁছি এবং রাত সাড়ে আটটা নাগাদ হোটেল নিউ ওটানিতে উঠি।

প্রতিটি সফরেই স্বাগতিক নগরের হোটেল কিংবা রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় পৌঁছেই প্রেসিডেন্টের প্রধান ও প্রথম কাজ হতো ঢাকায় টেলিফোন করা। ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, কয়েকজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী, সচিব ও বন্ধুদের তিনি ফোন করতেন। হোটেলের সাধারণ আইএসডি টেলিফোন ছাড়াও বিশেষভাবে ২৪ ঘণ্টার সক্রিয় ও তাৎক্ষণিক সংযোগ ব্যবস্থাযুক্ত হটলাইন টেলিফোনের মাধ্যমে এসব যোগাযোগ করা হতো। ওই দিন তিনি ভাইস প্রেসিডেন্টসহ অন্য অনেকের সঙ্গে কথা বলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর তিনি আমাকে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠান। দেখে মনে হলো, বেশ চিন্তিত। ১২ নভেম্বর দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা যায় কি না, তা দেখার জন্য বললেন। প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর এবং আরও কয়েকজন নেতা তাঁকে অতিসত্বর দেশে ফেরার পরামর্শ দিয়েছেন। জানা গেছে, বিরোধী দলগুলো ১৭ নভেম্বর মন্ত্রিপাড়া ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে। সুতরাং, পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটতে পারে। আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম, ১২ তারিখে বাণিজ্যিক বিমানে যাওয়ার ব্যবস্থা কঠিন হবে। তা ছাড়া অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ছাড়াও ঠিক এ পর্যায়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটি স্বাগতিক সরকার অসৌজন্যমূলক মনে করতে পারে। জবাবে এরশাদ বললেন, দেশের প্রয়োজনে যদি তাঁকে দ্রুত চলে যেতে হয়, সবাই তাঁর প্রশংসা করবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসান তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। পরে তিনি আমার সঙ্গেও আলাপ করে বললেন, পরিস্থিতি এতটা খারাপ নয় যে প্রেসিডেন্টকে এখনই ফিরতে হবে। ব্যঙ্গাত্মক সুরে আরও বললেন, মন্ত্রীরা আসলে প্রেসিডেন্ট দেশে না থাকায় ভীত হয়ে পড়েছেন এবং সে কারণেই তাঁরা তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন।

পরদিন সকালে যখন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখন তাঁকে আর উদ্বিগ্ন মনে হলো না। ঢাকায় ফেরার কথাও আর তোলেননি। তবে হরতাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আমি ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি

কেমন, জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলই হরতালের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য তাদের মাস্তান (অস্ত্রধারী) বাহিনীকে ব্যবহার করেছে; তবে সুবিধা করতে পারেনি। আরও বললেন, তাঁর দলেরও শক্তিশালী কর্মিবাহিনী দরকার (আসলে মাস্তান বাহিনী)। শুধু পুলিশ-বিডিআর দিয়ে বিরোধী দুই দলের মাস্তানদের কন্ট্রোল করা যাবে না। কিছুক্ষণ আগে নাকি তিনি এক ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলেছেন। ওই সম্পাদকও পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁর পার্টির কর্মিবাহিনী শক্তিশালী করা উচিত। আমি বললাম, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিশেষ বাহিনী নিয়োগ করলে অবস্থা কী দাঁড়াবে, তা তিনি ভেবে দেখেছেন কি না! কারণ, তাদের তখন কেউ কন্ট্রোল করতে পারবে না, খুনখারাবি বেড়ে যাবে এবং মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আমি আরও বললাম, যিনি তাঁকে এ পরামর্শ দিয়েছেন, তিনি হয়তো বিরোধী শিবিরকেও একই উপদেশ দিয়েছেন। পরে দেখা যাবে, তাঁর পত্রিকারই প্রথম পাতায় এই মর্মে খবর হয়েছে যে, তিনি মাস্তান বাহিনী দিয়ে বিরোধীদের আন্দোলন দমন করেছেন। পছন্দ না করলেও তিনি আমার কথাগুলো শুনলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রসঙ্গ পাল্টালেন। মাস্তানদের নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বললাম বিশেষ কারণে। ১০ অক্টোবর বিরোধী দলের হরতালে বিক্ষোভকারীদের ওপর জাতীয় পার্টির মাস্তানেরা হামলা করলে তিনজন যে নিহত হয়েছিল, সে খবর আমার জানা ছিল। অর্থাৎ, তাঁর দলের মাস্তান বাহিনীকে এর আগেই মাঠে নামানো হয়েছিল (১০ অক্টোবরের ঘটনার বিবরণ দ্রষ্টব্য)। রাজনীতি নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে সচরাচর আলোচনা করতেন না। আমি নিজেও যেচে এ বিষয় নিয়ে কথা বলতে যেতাম না। তবে মাঝেমধ্যে কথা বলতেন, বোধ হয় আমাকে পরীক্ষা করার জন্য। বেশ কয়েক মাস আগে একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর দলের ছাত্র শাখা আবার সংগঠিত করলে কেমন হয়? আমার সরল উত্তর ছিল, তিনি জোরের সঙ্গে একবার ঘোষণা দিয়েছেন যে তাঁর দলের ছাত্রসংগঠন রাখবেন না, কিন্তু এখন সেই সিদ্ধান্ত পাল্টালে তাঁর ভাবমূর্তি (Credibility) ক্ষতিগ্রস্ত তো হবেই, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় খুনখারাবির সংখ্যাও বেড়ে যাবে। জবাবে তিনি আর কিছু বললেন না। আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছুদিন আগেও তিনি একই কথা জিজ্ঞেস করেন। এবার আরও বললেন, তাঁর দলের অনেক নেতারই ইচ্ছা, ছাত্র শাখা পুনর্গঠন করা। আমি আগেও এ মতই প্রকাশ করেছিলাম। তবে তাঁর ছাত্র শাখা শেষ পর্যন্ত আর চালু হয়নি।

টোকিওতে পরবর্তী কয়েকটা দিন শান্তিপূর্ণভাবে কেটে গেল। অন্তত আমার জানামতে, ঢাকা থেকে তেমন বড় ধরনের সমস্যার সংবাদ আর যায়নি। আমি প্রেসিডেন্টকে শান্ত ও সুস্থির দেখেছি। মনে হয়েছে, তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছেন। টোকিওতে ১১ নভেম্বরের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যে ছিল আকাসাকা প্রাসাদে জাপানের প্রধানমন্ত্রী মি. কাইফুর সঙ্গে সাক্ষাৎ; জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি, অর্থনৈতিক ও ব্যাণিজ্যিক সহযোগিতামূলক যৌথ কমিটি, পার্লামেন্টারি লিগ প্রভৃতি সংগঠনের একটা যৌথ সংবর্ধনা এবং আমাদের রাষ্ট্রদূত হেদায়েতুল হকের.আমন্ত্রণে তাঁর বাসায় নৈশভোজে অংশগ্রহণ। মূল অনুষ্ঠান অর্থাৎ জাপান সম্রাটের অভিষেক অনুষ্ঠান ছিল ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায়। প্রেসিডেন্ট, বেগম রওশন এরশাদ, রাষ্ট্রদূত ও তাঁর স্ত্রী ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আমরা হোটেলে বসে টিভিতে ওই অনুষ্ঠান দেখি। সকালে প্রেসিডেন্ট ভারত ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে হোটেল নিউ ওটানিতে তাঁদের কক্ষে গিয়ে দেখা করেন। সম্রাটের ভোজ উৎসবের আয়োজন করা হয় রাতে, রাজপ্রাসাদে। ওই অনুষ্ঠানে এরশাদ একাই অংশ নেন। কেননা, নাইরোবিতে আয়োজিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার শীর্ষক সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য বেগম রওশন এরশাদ সেই সন্ধ্যায়ই সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে টোকিও ছেড়ে যান। অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সব দেশের প্রতিনিধিদের সম্মানে জাপানের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ১৩ নভেম্বর আকাসাকা প্রাসাদেও এক সংবর্ধনার আয়োজন করেন। সন্ধ্যায় হোটেল নিউ ওটানিতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী, সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মানে আরেকটি নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটে ১৩ নভেম্বর ইনভেস্টরস ফোরাম নামে কথিত একটি গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সভায়। হোটেলের একটি ছোট হলরুমে প্রায় ৪০ জন জাপানি শিল্পোদ্যোক্তা এ সভায় যোগ দেন। বাংলাদেশে জাপানের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে প্রেসিডেন্টের ভাষণ দেওয়া এবং তাঁদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তখনকার ক্ষমতাধর শিল্পসচিব মোশাররফ হোসেন ঢাকা থেকে টোকিওতে যান। বৈঠকের আয়োজনটি ছিল লক্ষ্যহীন ও ত্রুটিপূর্ণ। আমি লক্ষ করলাম, শুরু থেকেই প্রেসিডেন্টের মনোযোগ বৈঠকে নেই। প্রথমে রাষ্ট্রদূত বক্তব্য দেন, পরে মোশাররফ এবং সবশেষে এরশাদ। সবাই ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলেন। যদিও ভাষান্তরের জন্য লোক ওখানে দাঁড়ানোই ছিল, কিন্তু কাউকে বক্তৃতা ভাষান্তরের জন্য ডাকা হলো না।

জাপানি শ্রোতারা চুপচাপ বসে রইলেন। স্পষ্টই দেখলাম, দেশে বিনিয়োগের পরিবেশকে অনুকূল বলে বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য সভার আয়োজন করা হলেও ওই সভার পরিবেশ সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী জাপানিদের বোঝার জন্য মোটেই অনুকূল ছিল না। প্রেসিডেন্ট এরশাদ অতি দ্রুত, এমনকি চা পান ছাড়াই বৈঠকস্থল ত্যাগ করলেন। তিনি মোশাররফকে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে বললেন। আমাদের দূতাবাসের উদ্যোগে বাংলাদেশের টাকায় এই সভার আয়োজন করা হলেও বিষয়টি তুলে ধরা হয় এমনভাবে, যেন স্থানীয় বিনিয়োগকারী সম্প্রদায়েরই দায় বেশি। পরে দেখলাম, সভার খরচ বহন করতে হলো বলে চিফ অব প্রটোকল দূতাবাস কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করছেন।

টোকিও থেকে ফিরেই প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১৭ নভেম্বরের সম্মিলিত বিরোধী রাজনৈতিক জোটের ডাকা ঘেরাও কর্মসূচির মোকাবিলার প্রস্তুতি নেন। বিরোধী জোট মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির নেতাদের বাসভবন ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা করে। এতে মন্ত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। জাতীয় পার্টির নেতারা বিরোধী দলের কর্মসূচি বানচাল করার জন্য মিন্টো ও বেইলি রোডের চারদিকে বিভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি জনসভা করার সিদ্ধান্ত নেন। ওই দিন সকাল ১০টায় বিজয়নগরে স্কাউট কাউন্সিলের সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের যোগদান করার কথা। ১৬ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আমাকে বললেন, স্কাউট সম্মেলনের পর প্রেসিডেন্ট নয়টি জনসমাবেশে বক্তব্য দেবেন। প্রথমে কাকরাইল মসজিদের সামনের রাস্তার মোড়ে, পরে মগবাজার চৌরাস্তার মোড়, শেরাটন হোটেলের মোড়ে, বাংলামোটর ক্রসিং এবং রমনা পার্ক স্টার গেট ক্রসিংয়ের মতো বিভিন্ন জায়গায় পর পর ভাষণ দেবেন। দিনের সবচেয়ে ব্যস্ত সময়ে রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে রাস্তার ওপর এতগুলো জনসমাবেশের পরিকল্পনা দেখে আমি অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। এমন সমাবেশ রাজধানীজুড়ে দুই থেকে তিন ঘণ্টার এক ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি করবে, যা সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভোগান্তির কারণ ঘটাবে। প্রেসিডেন্ট এ কর্মসূচি অনুমোদন করেছেন কি না, প্রধানমন্ত্রীকে এ কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সুনিশ্চিতভাবে বলেন, প্রেসিডেন্ট সব কটি সমাবেশে যোগদানে সম্মত হয়েছেন।

এই অবস্থায় আমি রীতিমতো অসহায় বোধ করতে থাকি। দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী—সবাই যখন জনজীবনের ভোগান্তির কথা

বিবেচনা করছেন না, তখন আমার নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। রাজনৈতিক বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে বেশি কিছু বলতে যাওয়াটাও আমার দায়িত্বের বাইরে। আসলেই এসব কিছুর লক্ষ্য ছিল বিরোধী জোটের ঘেরাও কর্মসূচি থেকে বেইলি রোড ও মিন্টো রোডে অবস্থিত মন্ত্রীদের বাসভবনগুলো রক্ষা করা। প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর একেই অভিহিত করতেন বিরোধী শিবিরকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে।

১৭ নভেম্বর সকালে বিজয়নগর স্কাউট কাউন্সিলের সভাস্থল পর্যন্ত আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছিলাম। যাওয়ার পথে চারটি স্থানে সমাবেশের উদ্দেশ্যে রাস্তা অবরোধ করে নির্মিত প্ল্যাটফরমের দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। সমাবেশের জন্য নগরবাসীকে সম্ভাব্য যে ভয়াবহ যানজটের মধ্যে পড়তে হবে, সে কথা ওঠালাম। তিনি স্বীকার করলেন, কিন্তু চুপ থাকলেন। বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত মিন্টো ও বেইলি রোডে অবস্থিত মন্ত্রীদের বাসভবন ঘিরে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন দেখে তাঁকে না বলে পারলাম না যে এগুলো তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনারই জন্ম দেবে। তিনি ঠাট্টাচ্ছলে মন্তব্য করলেন, মন্ত্রীরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু যানজট-সম্পর্কিত আলোচনা এড়িয়ে গেলেন। স্কাউট কাউন্সিলের মিটিং শুরু হলে আমি বঙ্গভবনে চলে যাই। প্রেসিডেন্ট সব কটি সমাবেশেই বক্তব্য দেন, তবে পুলিশ প্রত্যাহারের পর অধিকাংশ সভাস্থলই বিরোধীদলীয় কর্মীরা পুড়িয়ে দেন।

পরে জানতে পারি, পুলিশ ও বিডিআরের সাহায্যে এবং সভা-সমাবেশের মাধ্যমে জাতীয় পার্টির নেতারা মন্ত্রীদের বাসভবনের দিকে অগ্রসরমাণ সম্মিলিত বিরোধী দলের মিছিল প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল। সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের অফিসের দিকে যাওয়ার সময় ফার্মগেট ক্রসিংয়ে একটি বিধ্বস্ত সমাবেশস্থল দেখতে পাই। জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা আ স ম আবদুর রবের অনুসারীরা এই সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। আ স ম আবদুর রবকে সাধারণত এরশাদের অনুগত বিরোধী নেতা বলে আখ্যায়িত করা হতো। বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে সমাবেশের আয়োজন করে আবারও তিনি এরশাদের প্রতি তাঁর শেষবারের মতো আনুগত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

টোকিওর পর প্রেসিডেন্ট এরশাদের পরবর্তী বিদেশ সফর ছিল মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে। রাষ্ট্রপ্রধানদের পঞ্চম সার্ক সম্মেলনে

যোগদানের জন্য ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর বিকেলে বেগম রওশন এরশাদসহ তিনি মালেতে পৌঁছান। এখানে তিন দিন ছিলেন। এই তিন দিন তিনি যে বেশ চিন্তিত ছিলেন, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এ সময় টেলিফোনে ঢাকায় বিভিন্ন নেতার সঙ্গে ঘন ঘন কথা বলতেন।

ওদিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে দেশে এরশাদ হটাও আন্দোলনে সম্মিলিত বিরোধী জোটের শক্তি ও প্রেরণা প্রতিদিনই বাড়ছিল। তাঁদের কার্যক্রম ব্যাপকতর হতে থাকে এবং ঘোষণা করা হতে থাকে একটার পর একটা কর্মসূচি। নভেম্বরের (১৯৯০) শেষ সপ্তাহটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের মূল শক্তি হিসেবে সক্রিয় ছিল আট দল, সাত দল, পাঁচ দল ও জামায়াতে ইসলামীর সম্মিলিত গ্রুপ। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের ঊর্ধ্বে উঠে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের সার্বিক নিয়ন্ত্রক বা চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার দীর্ঘদিনের অনৈক্যই এরশাদকে হটানোর সব উদ্যোগ বানচাল করার সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত একত্রে কাজ করার সিদ্ধান্তে অটল থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। ◦

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনে গতিসঞ্চার

জরুরি অবস্থা ঘোষণা

২৭ নভেম্বর ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সম্মিলিত বিরোধী জোট পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করে। ঢাকায় বিরোধী জোটের ব্যাপক শক্তি প্রদর্শনের সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই এরশাদ ওই দিন সকালে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের (ইপিজেড) মূল ভবন এবং পতেঙ্গার কাছে ইপিজেড-১-এ অবস্থিত দুটি জাপানি কারখানা উদ্বোধনের জন্য চট্টগ্রামে যান। চট্টগ্রামের জাতীয় পার্টির নেতারা এ উপলক্ষে নগরে একটা জনসভার আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। আমি আভাস পেয়েছিলাম, তিনি সেখানে গেলে বিক্ষোভের মোকাবিলা করতে হবে এবং অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের পুলিশ কমিশনারও আমাকে অনুরোধ করেন, প্রেসিডেন্ট যেন তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত করেন এবং শহরে না যান। কিন্তু জাতীয় পার্টির কিছু স্থানীয় নেতা মুখরক্ষার খাতিরে তাঁকে একটা জনসভায় নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ইপিজেড অফিস উদ্বোধন এবং দুটি কারখানা সফরের পর প্রেসিডেন্ট দোটানায় পড়ে যান। বস্তুত তিনি চট্টগ্রামে যান রেডিও ও টেলিভিশনে তাঁর জনসংযোগগত তৎপরতা সম্প্রচারের জন্যই। বেশি তৎপরতা যদি না দেখানো যায়, তাহলে জনগণ ভাবতে পারে চট্টগ্রামেও তাঁর শক্তি কমে গেছে। তিনি চট্টগ্রামে তাঁর অবস্থানের সময়সীমা বাড়াতে চাচ্ছিলেন এবং এ লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক কিছু কর্মসূচিও গ্রহণ করে ফেলেন। ইপিজেডের পর তিনি চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে যান। জাপানি রাষ্ট্রদূতকেও আমাদের সঙ্গে নেওয়া হলো। রানওয়ের

মাঝামাঝি গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী ও বিমানবন্দরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি কিছুক্ষণ সময় কাটালেন। এই ফাঁকে টিভির ক্যামেরাম্যানরা তাঁর ছবি তুললেন। আসল উদ্দেশ্য, সান্ধ্য খবরের আইটেম বাড়ানো। যেমন, তিনি চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের উন্নয়ন পরিকল্পনা মূল্যায়ন করেন। বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে করে হালিশহরে যাই এবং সেখান থেকে গাড়িতে কৈবল্যধামে পৌঁছাই। কৈবল্যধাম ছিল একটা হিন্দুমন্দির। দিন কয়েক আগে দুষ্কৃতকারীরা এর ক্ষয়ক্ষতি করে। প্রেসিডেন্ট মন্দিরের ক্ষয়ক্ষতি ঘুরেফিরে দেখেন এবং সেখানে ত্রাণকাজের জন্য যাওয়া সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেন। এ ছাড়া কাছের অগ্নিদগ্ধ জনপদও ঘুরে দেখেন। এসবই খবরের শিরোনাম হিসেবে বেশ উপযুক্ত। এরই মধ্যে আরও জানতে পারি, ইপিজেড থেকে চট্টগ্রাম শহরে যাওয়ার রাস্তার কয়েক জায়গায় অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এরশাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য সেখানে কয়েক হাজার লোক সমবেত রয়েছে। ওদিকে আর যাওয়ার চেষ্টা না করে কৈবল্যধাম থেকে আবারও হালিশহর সামরিক ছাউনিতে যাই। উদ্দেশ্য ছিল দুপুরের আহারপর্ব শেষে ঢাকায় ফিরে আসা। সেখানে পৌঁছতেই আমি এনএসআইয়ের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফের টেলিফোন পাই। তিনি আমাকে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির কাছে দুই পক্ষের গুলিবিনিময়ের মধ্যে পড়ে মিলন নামের একজন ডাক্তার নিহত হয়েছেন। আশরাফ এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও কিছুক্ষণ কথা বলেন। আর এসব শোনার পর মধ্যাহ্নভোজ না সেরেই চট্টগ্রাম ত্যাগ করি। আমার মনে হলো, অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। তেজগাঁও হেলিপ্যাডে আশরাফকে দেখলাম। গাড়িতে তিনিই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সেনাভবনে গেলেন। আমি হেলিপ্যাড থেকে সোজা বঙ্গভবনে চলে যাই। পথে কিছু কিছু জায়গায় অগ্নিদগ্ধ যানবাহন ও অন্যান্য ধ্বংসচিহ্ন দেখলাম।

বঙ্গভবনের বাসায় পৌঁছামাত্র প্রেসিডেন্টের টেলিফোন পেলাম। তিনি রাত নয়টায় টেলিভিশন ও বেতার মারফত জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। সাড়ে ছয়টায় তাঁর অফিসে আমাকে তাঁর ভাষণ রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করতে বললেন। আরও বললেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হচ্ছে এবং সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ঢাকা শহরে কারফিউ বলবৎ করা হবে।

সন্ধ্যা ছয়টায় যখন প্রেসিডেন্টের অফিসে পৌঁছাই, তখনো প্রেসিডেন্ট আসেননি। রেডিও ও টেলিভিশনের লোকজন ভাষণ রেকর্ডিংয়ের জন্য তৈরি হয়ে আছেন। আধা ঘণ্টার মধ্যেই তিনি এসে গেলেন এবং জানালেন,

রেকর্ডিংয়ের পরপরই জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির নেতাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন। এরই মধ্যে টেলিফোনে তাঁদের প্রেসিডেন্টের অফিসে পৌঁছার জন্য বলা হলো। ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদুল হাসান তাঁর সঙ্গেই এলেন। বক্তৃতা লেখার কাজ সারা হয় বাসায়ই। দু-একবার রিহার্সাল করে চূড়ান্ত ভাষণ রেকর্ডিং করতে ২৫ মিনিটের মতো সময় লাগে। ঢাকায় উপস্থিত সব মন্ত্রী রাত আটটার মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের (আইসিসি) ড্রাফটিং রুমে জড়ো হন। বিরোধী জোটের আন্দোলন সম্পর্কে বিরক্তি এবং সবার প্রতি রাগ প্রদর্শন করে প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীদের সামনে কথা বলতে শুরু করেন। বিরোধী জোটের আন্দোলন প্রতিহত করতে না পারায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতীয় পার্টির নেতাদের দোষারোপ করলেন। বললেন, তাঁদের অযোগ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা ও নিজেদের ভেতরের কোন্দলের কারণেই তাঁর পার্টি শক্তিহীন। তাঁরা নিজেকে নিয়ে শুধু ব্যস্ত ছিলেন, যে জন্য এখন তারা বিরোধী দলগুলোকে মোকাবিলা করতে পারছেন না। এই প্রথম এরশাদকে তাঁর নিজের দলের নেতা ও মন্ত্রীদের এত সরাসরি আক্রমণ করে সমালোচনা করতে দেখলাম। তাঁর একটা মন্তব্য আমি বিশেষভাবে মনে রেখেছি। সেদিন তিনি উপস্থিত সবার সামনে সাফ সাফ বলে ছিলেন, 'আপনারা টনকে টন টাকা কামিয়েছেন, কিন্তু কখনো দলের জন্য কাজ করা প্রয়োজন মনে করেননি।'

সবার মুখে তখন একধরনের অসহায়ত্ব ও অস্বস্তি।

কিছুক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর কিছুটা সাহসী হয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ নেওয়া হলো না কেন! এই প্রথম আমি একজন মন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টের সামনে মন্ত্রীর মতো আচরণ করতে দেখলাম। লক্ষ করলাম, অধিকাংশ মন্ত্রীই বসে আছেন চুপচাপ। কারও মধ্যেই নিজের মতামত প্রকাশের মতো সাহস ছিল বলে মনে হলো না। উপপ্রধানমন্ত্রী এবং দলের মহাসচিব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে লক্ষ করলাম মুখ নিচু করে বসে আছেন। আমার ধারণা ছিল, তিনিও তাঁর অসন্তোষের কথা আরও জোরালোভাবে ব্যক্ত করবেন, কিন্তু চুপ করে থাকলেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কেউই কোনো পয়েন্ট উত্থাপন করে প্রেসিডেন্টের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিলেন না। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট এরশাদকেও কম শঙ্কিত ও বিব্রতকর বলে মনে হচ্ছিল না। কেউ যাতে অসন্তোষ বা ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ না

পান, তাই দ্রুত সভা শেষ করে বেরিয়ে গেলেন। রাগ দেখানো, অধস্তনদের দায়ী করা এবং সুযোগমতো কাউকে স্কেপগোট করা যে ক্ষমতাসীনদের একটা বিশেষ হাতিয়ার এবং এসব কিছু যে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে হয়, প্রেসিডেন্ট এরশাদ সেটা ভালো করেই জানতেন।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা সমগ্র পরিস্থিতিকে আরও বিস্ফোরণোন্মুখ করে তোলে। পরিস্থিতি সরকারের অনুকূলে না গিয়ে পুরোপুরি বিপক্ষে চলে যায়। সম্মিলিত বিরোধী জোট আন্দোলনের পক্ষে বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এরশাদ ভেবেছিলেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণা দিয়ে ফল পাওয়া যাবে। প্রথম দিকে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণার পক্ষে ছিলেন না। আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে শুনেছি, জরুরি আইন যদি লঙ্ঘন করা হয়, তাহলে তাঁর সামনে আর কী বিকল্প থাকবে! কিন্তু পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গেল যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ছাড়া আর কোনো বিকল্পও থাকল না। রাজনৈতিক বিষয়ে সময়মতো দৃষ্টি না দিলে তা আন্দোলনের রূপ নেয়, সময়মতো যা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে না পারলে সহিংস ও অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমার কাছে স্পষ্টতই মনে হচ্ছিল, ঢাকায় রাজনৈতিক আন্দোলন তখন দ্রুতই সহিংসতার দিকে মোড় নিচ্ছিল। জরুরি আইন লঙ্ঘন করে বিরোধী দলগুলো ২৮ নভেম্বর থেকে তাদের আন্দোলন আরও তীব্র করে তোলে। প্রতিদিন হরতাল চলতে থাকে। ঢাকার রাস্তায় বিরোধী দলগুলোর সভা-সমাবেশ, মিছিল-বিক্ষোভ নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়। প্রতিদিনই বাড়তে থাকে হতাহত মানুষ, যানবাহন ও সরকারি-বেসরকারি সহায়সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সংখ্যাও। ২৭ নভেম্বর রাত থেকে কারফিউ জারি করা হলেও বিরোধী জোটের বিক্ষোভকারীরা শুরু থেকেই কারফিউ অগ্রাহ্য করতে থাকে। সরকার জরুরি আইন ও কারফিউ জারি করে তা কার্যকর করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিটকে মোতায়েন করা হলেও তাদের ওপর এই নির্দেশ থাকে যে, তারা যেন বিক্ষোভকারীদের এড়িয়ে চলে, তাদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের কোনো ধরনের সংঘর্ষ যেন না ঘটে। এদিকে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মালিক সমিতি জরুরি আইন জারির প্রতিবাদে সংবাদপত্র প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পদক্ষেপ প্রেসিডেন্ট এরশাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ রেডিও ও টিভি তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনের কোনো সংবাদ পরিবেশন না করে একতরফাভাবে সরকারের গুণগান করে সংবাদ সম্প্রচার করতে থাকে। ফলে বেশির ভাগ

মানুষ, এমনকি সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারাও বিদেশি রেডিওর ওপর নির্ভর করতে থাকেন। অন্যদিকে কোনো সংবাদপত্র না থাকায় সরকারপক্ষের সঠিক তথ্যও জানা সম্ভব হচ্ছিল না।

পয়লা ডিসেম্বরের হেলিকপ্টার-যাত্রা

সম্মিলিত বিরোধী জোটগুলো যখন হরতাল, সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করছিল। কারফিউ ও জরুরি আইন লঙ্ঘনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রচণ্ড আঘাত হানছিল, তখন জাতীয় পার্টির নেতারা রাজনৈতিকভাবে তাঁদের মোকাবিলা করার কোনো পথ পাচ্ছিলেন না। সে সময় ঢাকায় জাতীয় পার্টির পক্ষে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টি ছিল অচিন্তনীয়। কারণ, সারা শহর তখন বিরোধী দলের পুরো নিয়ন্ত্রণে। কোনো সমাবেশ, মিছিল কিংবা জনসভা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া, জরুরি আইনের কারণে সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল নিষিদ্ধ, যা অমান্য করা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। ঢাকায় জাতীয় পার্টির শক্তি ধারণার চেয়েও দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছিল। ২৭ নভেম্বর রাতে জাতীয় পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে এরশাদের তীব্র সমালোচনা কার্যত যথার্থ হলেও, যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর এই সমালোচনা, তাঁদেরকে তা আশ্বস্ত করার পরিবর্তে আরও নিষ্ক্রিয় ও নিরুৎসাহিত করতেই বেশি সাহায্য করে। মুখরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জাতীয় পার্টির কিছু নেতা ঢাকার বাইরে জনসভা করার পরামর্শ দেন। প্রেসিডেন্ট যে ক্ষমতায় আছেন এবং সবকিছুই যে তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, সেটা বোঝাতে হলে তাঁকে কিছু মন্ত্রী-নেতাসহ জনসভায় বক্তৃতারত অবস্থায় টিভির পর্দায় দেখাতে হবে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রেসিডেন্ট মাদারীপুর-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের নবনির্মিত দুটি সেতু উদ্বোধন করবেন এবং সেতু সংলগ্ন এলাকায় জনসভায় ভাষণ দেবেন।

৩০ নভেম্বর সকালে প্রেসিডেন্ট আমাকে সেতু উদ্বোধনের কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানোর জন্য বলেন। কোনো জনসভায় বক্তৃতা দেবেন কি না, জানতে চাইলে তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। জরুরি আইন বলবৎ থাকায় জনসভায় তাঁর বক্তৃতা দেওয়া উচিত হবে না বলে আমি তাকে মনে করিয়ে দিলে তিনি বলেন, ছোটখাটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেতু দুটির উদ্বোধন করা হবে এবং সেখানে কেবল সরকারি কর্মকর্তারাই উপস্থিত থাকবেন। এর আগে ডেপুটি কমিশনারদের কাছ থেকে আমি জেনেছি,

দুটি স্থানেই জনসভা হবে। জরুরি আইন জারি থাকা অবস্থায় জনসভা হবে কি না, আমার কাছ থেকেও তাঁরা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। তাঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন, মন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, রুহুল আমিন হাওলাদার, আনোয়ার হোসেন মঞ্জুসহ জাতীয় পার্টির নেতারা এরই মধ্যে এলাকায় পৌঁছে সেতুর কাছে জনসভার আয়োজনে কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

পয়লা ডিসেম্বর (১৯৯০) ভোরে প্রেসিডেন্ট হেলিকপ্টারযোগে মাদারীপুর জেলার টেকেরহাটের উদ্দেশে রওনা হন। ব্রিটিশ হাইকমিশনার মি. সি এইচ এমেরি আমাদের সঙ্গে এলেন। হাইকমিশনার প্রেসিডেন্টের ডান পাশের আসনে বসেন, আমি প্রেসিডেন্টের ঠিক পেছনের আসনে। কিছুক্ষণ হাইকমিশনারের সঙ্গে কথা বলে প্রেসিডেন্ট আমার দিকে চেয়ারটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে আমার কাছে। হঠাৎ এমন অবস্থায়, অর্থাৎ হেলিকপ্টারে বসে আমাকে আন্দোলন সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় আমি অনেকটা হকচকিত হয়ে গেলাম। এমন ব্যাপার নিয়ে এর আগে তিনি আমার সঙ্গে সরাসরি কোনো আলাপ করেননি। তাঁর প্রশ্ন শুনে খুবই উৎসাহ বোধ করলাম এই ভেবে যে, কথা বলার একটা সুযোগ পেলাম। বললাম, আমার কাছে তো অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না। বিরোধীদের আন্দোলনে ব্যাপক জনসমর্থন প্রতিদিনই জোরালো হচ্ছে। বিশেষ করে, সংবাদপত্র প্রকাশ না হওয়ায় তাঁর সরকারের অবস্থান যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ব্যাখ্যা করে বোঝালাম। জনসাধারণ বিদেশি রেডিও, বিশেষত বিবিসি ও ভোয়া থেকে খবর জানছে। পাচ্ছে আন্দোলন সম্পর্কে সব ধরনের খবরাখবরই। বিদেশি বেতারকে বিশ্বাসও করছে তারা। তিনি এ কথা স্বীকার করে বললেন, এ বিষয়ে কিছুই করতে পারছেন না। হেলিকপ্টার নামতে যাচ্ছে দেখে তিনি বললেন, ঢাকায় ফেরার পর তিনি আমার সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

কয়েক মিনিট পর আমরা টেকেরহাটে পৌঁছাই। প্রেসিডেন্ট প্রথমে ফিতা কেটে সেতুর উদ্বোধন করেন এবং হেঁটে সভাস্থলে যান। নদীর ঠিক ওপারেই ছিল সভাস্থল। সমাবেশটি তেমন উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। মন্ত্রী শেখ শহীদ ও তাঁর কর্মীরা সভার লোক সংগ্রহের জন্য যে কঠিন পরিশ্রম করেছেন, সেটা বোঝা গেল। সভাকে বড় করার চিন্তাই ছিল তাঁদের মাথায়। কেননা, টিভিতে দেশবাসী দেখবে বিরোধীদের আন্দোলন সত্ত্বেও এরশাদ একটি বিরাট জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন। সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তা, সড়ক বিভাগের সচিব ও ব্রিটিশ হাই কমিশনারের প্রথাসিদ্ধ বক্তৃতার পর তাঁদের

সামনেই সভাটি রাজনৈতিক রূপ নেয়। যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও প্রেসিডেন্ট এরশাদ ছিলেন প্রধান বক্তা। উভয়েই বিরোধী জোট দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে দাবি করলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় ধরে মিটিং চলে। আমি ভাবছিলাম, ঢাকা শহরে যখন এরশাদবিরোধী বিক্ষোভের পর বিক্ষোভ চলছে, তখন রাজধানী থেকে বহুদূরে পাড়াগাঁয়ের শান্ত পরিবেশে বক্তৃতায় কি কোনো কাজ হবে! সেই সঙ্গে ভাবছিলাম ব্রিটিশ হাইকমিশনারের কথা। চুপচাপ বসে আছেন তিনি। আমাদের ভাষা বুঝছেন না। তবে বক্তাদের অঙ্গভঙ্গি দেখে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছেন। ব্রিটিশ হাইকমিশনার মি. এমেরি এখানে নতুন। সভার রাজনৈতিক চরিত্র দেখে তাঁকে বেশ বিব্রত বলে মনে হচ্ছিল। এ ধরনের একটা রাজনৈতিক সভায় ওই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা নয়। সেতুটি ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে বলেই এখানে তাঁর আসা।

টেকেরহাট ছেড়ে হেলিকপ্টার আকাশে ওড়ার পর প্রেসিডেন্ট তাঁর আসন ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি হয়ে আবার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এবার আমি আরও উৎসাহী ও আস্থাশীল হয়ে উঠলাম। ২৭ নভেম্বর রাতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর থেকে এ রকম একটা সুযোগই খুঁজছিলাম। আগেও উল্লেখ করেছি, প্রাসঙ্গিক গৌণ বিষয় ছাড়া রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে বড় একটা আলাপ করতেন না। আমি রাজনীতিবিদ নই এবং এ ব্যাপারে কখনো কোনো আগ্রহও দেখাতাম না। তবে সৎ ও আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে পরিস্থিতির বাস্তবতা বুঝে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন প্রায়ই উপলব্ধি করতাম। যতই দিন যাচ্ছিল, ততই মনে হচ্ছিল, তিনি যেন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন এবং তাঁর পতন সম্পর্কে আমার আগের আশঙ্কাও ক্রমে জোরদার হচ্ছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা নিজের মনস্থির করার এরশাদীয় স্টাইল আমার জানা ছিল। তিনি বিচিত্র প্রকৃতির ও বিচিত্র মনোভাবের নারী-পুরুষকে নিয়ে ঘনিষ্ঠ আস্থাশীল একটা বিশেষ গ্রুপ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ তাঁর দুর্বলতা ও একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে অসামান্য প্রভাব বজায় রেখে আসছিলেন। তাঁরা তাঁর মনোভাব গঠনে এবং দেশের জন্য নীতিনির্ধারণে প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাঁদের বাইরে কারও পক্ষে কিছু করা বা বলা শুধু অসম্ভব নয়, ঝুঁকিপূর্ণও। নানা দুর্বলতার কারণে তিনি যে কারও কারও হাতে কিছুটা জিম্মিও হয়ে রয়েছেন, এ রকম সন্দেহও আমার মনে ছিল।

আমি বলতে চাইছিলাম, পদত্যাগ করে রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটানোর এটাই তাঁর জন্য মোক্ষম সঠিক সময়। তিনি যদি সময়মতো তা না করেন, তাহলে পরিস্থিতি তাঁর জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁকে ক্ষমতা ছাড়ার পরামর্শ দেওয়াটাও এক দুঃসাহসের ব্যাপার। অপ্রিয় ও পছন্দ নয়, এমন পরামর্শ যাঁরা তাঁকে দেন, তাঁদের তিনি সহ্য করতে পারেন না। এবং কী তাঁর প্রিয়, সেটা বুঝে যাঁরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন, সাধারণত তাঁরা খুব সহজে তাঁর আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। কেউ তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার সুপারিশ করতে গেলে তাঁর চারপাশের সুবিধাভোগী চাটুকার ধরনের প্রিয়জনেরাই তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, ক্ষমতা হারানোর বিষয়টি এরশাদ ও তাঁর পরিবারের চেয়েও তাদের জন্যই বেশি ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। এখন তিনি যখন নিজে আমার মতামত জানতে চাইছেন, তখন আর ইতস্তত না করে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করব বলে স্থির করে ফেললাম। দেশে যে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল কারণ তিনি। ক্ষমতা থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানোর ফলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। মনে মনে ভাবা ওপরের কথাগুলো তাঁকে বলার জন্য আমি আগ্রহী হয়ে উঠলাম। এবার তিনি প্রথমেই বললেন, 'মনজুর, আমি ছেড়ে দেওয়ার (মানে পদত্যাগ করার) সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তুমি কী বলো?'

কথাটা আমি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আরও বললেন, 'আমি আর এভাবে চালিয়ে যেতে চাই না। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমি আর পেরে উঠছি না।'

প্রেসিডেন্ট এরশাদ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়বেন—এটা ছিল একটা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয় ব্যাপার। অথচ সে কথাই তিনি এখন তাঁর মুখ দিয়েই বলছেন। আরও বললেন, বিরোধী জোট যাঁকেই ক্ষমতা নেওয়ার জন্য ঠিক করবে, তাঁর হাতেই তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন।

আমি জানতে চাইলাম, তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন কি না।

উত্তরে বললেন, তিনিও এটাই চান। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, জনগণ এখন আর তাঁকে পছন্দ করে না এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এমন সব কাজ করা হচ্ছে, যা দেখে তাঁরা রীতিমতো লজ্জিতই হচ্ছেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের এমন সব কথা শুনে তাঁর সম্বন্ধে আমার পুরো ধারণাই পাল্টে গেল। আমার মনে হলো, তিনি রাজনৈতিক বাস্তবতা বুঝতে পেরেছেন। তাঁর কথায় বিচক্ষণতা ও সুচিন্তার প্রকাশ ছিল। যে ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে কথা বললেন, তাতে মনে হলো, তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন।

এখন প্রয়োজন তাঁকে সব দিক থেকে সমর্থন করা ও সাহস জোগানো। আমি বললাম, 'আপনার জন্য পদত্যাগই সম্মানজনক ও নিরাপদ উপায় এবং এ ব্যাপারে আর দেরি করবেন না। এতে করে আপনি যেমন রক্ষা পাবেন, তেমনি দেশও বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি থেকে রক্ষা পাবে।' জবাবে আমাকে বললেন, তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে আগ্রহী। পদত্যাগের প্রশ্নে তিনি পার্টির নেতাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেছেন কি না, জিজ্ঞেস করি। উত্তরে না বললেন। তবে জানালেন, এ নিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁরা দুজনই পদত্যাগের ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন। এ প্রশ্নটা তাঁকে করি এ কারণে যে, জাতীয় পার্টির প্রধান নেতারা কখনোই তাঁকে ক্ষমতা ছাড়ার পরামর্শ দেবেন না বলেই আমার ধারণা। এটা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় হলেও পার্টি ও তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকাটাই আমাদের দেশের রাজনৈতিক ট্র্যাডিশন। আমি প্রেসিডেন্টকে আরও বললাম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন, তাহলে দেশ-বিদেশে তাঁর সুনাম হবে। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি এক বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী হবেন। কেননা, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেননি। এরশাদের স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আমার মতো আরও অনেকের কাছে, বিশেষত যাঁরা প্রভাবশালী বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে নন বরং সরকারি কর্মসূত্রে প্রেসিডেন্টের আশপাশে আছি, তাঁদের কাছে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার মতোই ঘটনা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে এবং যাঁরা ওই সময়ের ক্রম উত্তপ্ত পরিস্থিতি অনুধাবন করছিলেন, তাঁরা স্বীকার করবেন, একটা সমঝোতার ও প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ ছাড়া তখনকার রাজনৈতিক সংকট সমাধানের অন্য আর যেকোনো প্রচেষ্টা দেশের জন্য ধ্বংসাত্মক হতে পারত।

পরবর্তী সেতুর উদ্বোধন এলাকায় পৌঁছার আগ পর্যন্ত প্রায় ২০ মিনিট প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে কথা বললেন। এমনকি তিনি এ কথাও বললেন, বিরোধী জোটগুলো চাইলে তিনি বর্তমান জাতীয় সংসদের মাধ্যমেই পার্লামেন্টারি সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনে সাহায্য করতে পারেন। তাঁর পার্টির দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের মাধ্যমে এ কাজ করা যাবে। তিনি আরও বললেন, বিরোধী দলগুলো যদি সম্মত হয়, তাহলে তিনি নিজেই একটি অবাধ সংসদীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করবেন না। আমি উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ করি, দীর্ঘদিন পর হলেও শেষ পর্যন্ত এরশাদের মধ্যে সত্যিকারের সমঝোতার মনোভাব ফিরে এসেছে। চলমান রাজনৈতিক বাস্তবতা তিনি মেনে নিতে যাচ্ছেন। আগের রাতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মি. মিলান সেনাভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এই প্রেসিডেন্ট আমাকে বললেন, তাঁর সঙ্গে দুই ঘন্টাব্যাপী আলোচনার সময় তাঁকে তিনি তাঁর পদত্যাগের কথা বলেছেন। মিলান তাঁকে তাঁর মনোভাবের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এবং তাঁকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। মিলান পদত্যাগ করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন দিয়েছেন শুনে আমি আরও উৎসাহ বোধ করি। আমি এবার প্রধানত দুটি বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। প্রথমত, তিনি যেন পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করেন এবং দ্বিতীয়ত, দলীয় নেতারা যেহেতু তাঁর পরিকল্পনা সমর্থন করবেন না, সেহেতু পদত্যাগের বিষয়টি তাঁদের কাছে তিনি যেন আগাম প্রকাশ না করেন। আলোচনার সময় কয়েকবার আমি তাঁকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করার অনুরোধ জানাই। কারণ, আমি এরশাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানি। তিনি যখন তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ স্বার্থান্বেষী গ্রুপটির সঙ্গে মিলিত হবেন, ঠিক তখনই এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলবেন। তবে তিনি আমাকে বললেন, এই সিদ্ধান্তে তিনি অনড় এবং আশা করছেন তাঁর স্ত্রী, ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ ও মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ তাঁকে সমর্থন করে যাবেন।

কথা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন কি না এবং তাঁদেরকে তাঁর এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত দিয়েছেন কি না! তিনি আমার এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি। তবে আমার ধারণা হলো, এ ব্যাপারে তিনি যোগাযোগ রাখছেন। আলোচনার শেষ মুহূর্তে তিনি আমাকে তাঁর পদত্যাগের বিষয়টি গোপন রাখতে বললেন। তবে দু-এক দিনের মধ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন বলে আমাকে জানালেন। সবশেষে অল্প সময়ের নোটিশে ভাষণ যাতে রেকর্ডিং করা সম্ভব হয়, সে জন্য রেডিও ও টিভির টিমকে প্রস্তুত রাখার জন্যও বললেন।

একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা দেখে আমি খুবই উৎসাহী হয়ে উঠি। ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত এরশাদ একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছেন। বহুদিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে কারও পক্ষে ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়। কেননা, জনগণ পরিবর্তন চায়। চায় ঘন ঘন পরিবর্তন।

ঢাকায় ফিরে যখন বঙ্গভবনে যাই, তখন মনটা খুবই হালকা লাগছিল।

সন্ধ্যায় বিবিসি ও অন্যান্য সূত্রে ওই দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন জায়গায় আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের খবর পেলাম। তার পরও এ কথা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছিলাম, শিগগিরই উদ্ভূত সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে। দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে কয়েকজন টেলিফোন করে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বর্তমান সংকটের শুভ নিষ্পত্তি হবে বলে তাঁদের আশ্বাস দিলাম।

পরদিন, অর্থাৎ ২ ডিসেম্বর যথারীতি সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে পৌঁছলাম। প্রেসিডেন্টও নয়টার মধ্যে এসে গেলেন। আজ তাঁকে ঘিরে চোখে পড়ার মতো কোনো তৎপরতা ছিল না। কিন্তু সকাল থেকেই ঢাকা শহর এরশাদবিরোধী আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণে। শহর সারা দিন সভা-মিছিল ও অব্যাহত বিক্ষোভে উত্তাল। কিছু কিছু সহিংস ঘটনারও খবর পাওয়া গেল। অফিসে প্রেসিডেন্ট অধিকাংশ সময়ই টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। খুব কম লোকই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। আমি মনে করছিলাম, তিনি হয়তো গত কালের আলোচনার সূত্র ধরে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পদক্ষেপ সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য আমাকে ডাকবেন। কিন্তু ডাকেননি এবং আমি নিজেও যাইনি। আমি ধরে রেখেছি, তিনি তাঁর পার্টির নেতাদের নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার মাধ্যমে ক্ষমতা ছাড়ার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রায় দেড়টায় অফিস থেকে বঙ্গভবনের বাসায় যাই এবং দিনের বাকি সময়টা বাসায় বসে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, টেলিফোন এবং অন্যান্য সূত্র থেকে নানা খবর শুনে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখার চেষ্টা করি। ওদিকে বিভিন্ন জায়গায় অনাকাঙ্ক্ষিত বহু ঘটনার পাশাপাশি সন্ধ্যায় সভা-সমাবেশ ও মিছিলের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। টেলিফোনে বহু বন্ধু ও পরিচিতজন উদ্বিগ্ন হয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে বলে সবাইকেই আশ্বস্ত করি। সবার মনেই দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা। অনেকে নানা গুজব শুনে সম্ভাব্য অরাজকতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত।

এরশাদের শেষ ভাষণ

৩ ডিসেম্বর খুব সকালে এডিসি আমাকে টেলিফোনে জানান, প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কমান্ডের সদর দপ্তরে যাবেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে থাকি। সেখান থেকে প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিসে যাবেন। প্রেসিডেন্টকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য আমি তাড়াহুড়ো করে সেনাভবনে যাই। আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত

গৃহীত হতে যাচ্ছে মনে করে উৎসাহ লাগছিল। অনির্ধারিত এ সভায় বাহিনীর প্রধানেরা (বিমানবাহিনীর প্রধান ছাড়া), এনএসআইয়ের মহাপরিচালক, পিএসও এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সংক্ষেপে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বললেন। সন্ধ্যায় তিনি রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দেবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ঘোষণা করবেন বলে আভাস দিলেন। জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি পদত্যাগের কথা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন ও বর্তমান সংকটের সুন্দর সমাধান হতে যাচ্ছে ভেবে মনটা ভালোই লাগছিল। ওই সময় বোকার মতোই ধারণা করেছিলাম, ১ ডিসেম্বর তিনি আমাকে যেভাবে বলেছিলেন, সবকিছু যেন ঠিক সেভাবেই ঘটতে যাচ্ছে। সুপ্রিম কমান্ডের সদর দপ্তর থেকে চলে আসার সময় আমি সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দীন খানের কানে কানে বলেই ফেললাম, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারি, পদত্যাগ করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট তো সুস্পষ্টভাবে তাঁদের তখনো কিছুই বলেননি।

অফিসে যাওয়ার পথে প্রেসিডেন্ট সন্ধ্যার ভাষণের কথা তুললেন। আমি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য বললাম, বক্তৃতাটা যেন খুবই সতর্কতার সঙ্গে লেখা হয়। তাঁর দু-একটা কারণও উল্লেখ করলাম। বললাম, তাঁর প্রস্তাবে সুস্পষ্ট কোনো প্রস্তাব বা আবেদন এবং আন্তরিকতার ছাপ না থাকলে বিরোধী নেতারা তা গ্রহণ করবেন না। আমি অবশ্য বলতে পারিনি, অতীতে অনেকবার প্রতিজ্ঞা, আশ্বাস ও সমঝোতা ভঙ্গের মাধ্যমে তিনি নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। আর এ কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে হয়তো তাঁর অতি সৎ ও আন্তরিক প্রস্তাবও বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরা বিশ্বাস করবেন না। গত ২৭ নভেম্বরে (১৯৯০) দেওয়া তাঁর ভাষণের একটা বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ওই ভাষণে তিনি দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ভারতকে দায়ী করেন, যার অর্থ এই দাঁড়ায়, বিরোধী জোটগুলো ভারতের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে। এটা বলা যে তাঁর ঠিক হয়নি, সে কথা তিনি স্বীকার করলেন। আমাকে আরও বললেন, জনমত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফরই এ কথাগুলো তার বক্তৃতায় জুড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্য দেশের ভেতরে কোনো সংকট দেখা দিলে যে প্রতিবেশী দেশকে কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়াকে দায়ী করতে হয়, এটা উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নতুন কিছু নয়। দপ্তরে পৌঁছার পর প্রেসিডেন্ট সোজা তাঁর অফিসকক্ষে চলে যান। ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং বক্তৃতা লেখার

সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অফিসে পৌঁছেই প্রেসিডেন্ট তাঁদের নিয়ে বক্তৃতা ড্রাফটিংয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি অফিসকক্ষেই বসে রইলাম। তখন ভাবতেও পারিনি, ওই দিন এত দ্রুত প্রেসিডেন্ট এরশাদের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হতে যাচ্ছে। পদত্যাগ প্রস্তাবের প্রধান দিকগুলো সম্ভবত আগের রাতেই চূড়ান্ত করা হয়েছিল। ১ ডিসেম্বর হেলিকপ্টারে বসে তিনি আমার সঙ্গে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে যেসব সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার থেকে যে তিনি সরে যাচ্ছেন, বুঝতে পরিনি। মনে হলো, মওদুদ আহমদ ও আনিসুল ইসলাম মাহমুদই প্রেসিডেন্টকে ভাষণের বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। চূড়ান্তভাবে রেকর্ডিং না করা পর্যন্ত তাঁরা প্রেসিডেন্টের দপ্তরেই ছিলেন। একপর্যায়ে তথ্যমন্ত্রী মীজানূর রহমান শেলী তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। আমি আমার অফিসের ভেতরেই বসে রইলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় তাঁর অফিসে টিভি ও রেডিও রেকর্ডিংয়ের সব ব্যবস্থা যাতে প্রস্তুত থাকে, সে কথা বলার জন্য তিনি একবার মাত্র আমাকে ডেকে পাঠান। এরই মধ্যে এনএসআইয়ের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফ হোসেন আমার দপ্তরে এসে বসলেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে বেশ আত্মপ্রত্যয়ী মনে হলো। আমার ধারণা ছিল, প্রেসিডেন্ট এরশাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনিই বিশেষভাবে অবগত আছেন, কিন্তু তাঁকে সে ব্যাপারে কোনো কথা জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করিনি। কিছু সময় পরে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা বাহিনীর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার নাসিরুদ্দীনও আমার দপ্তরে আসেন এবং আশরাফের পাশের আসনে বসেন। কিন্তু যখন শোনেন, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় প্রেসিডেন্টের ভাষণ রেকর্ড করা হবে, তখন উভয়েই চলে যান।

ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ, মন্ত্রী আনিসুল ও মীজানূর রহমান শেলী আমার দপ্তরের পার্শ্ববর্তী লেডিস রুমে ভাষণ নিয়ে ব্যস্ত। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ প্রেসিডেন্ট তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং আমার কক্ষ অতিক্রম করে লেডিস কক্ষ পর্যন্ত যান। আমি দ্রুত উঠে গিয়ে তাঁকে সঙ্গ দিই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এখানে কারা আছেন? যখন জানাই যে তিনজন মন্ত্রী ভাষণ চূড়ান্ত করা নিয়ে ব্যস্ত, তখন তিনি আধা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে একটু মুচকি হাসলেন। অবশ্য তাঁরা কিছু বুঝে উঠার আগেই তিনি ঘুরে চলে যান। আমি তাঁর অফিসকক্ষের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফেরত চলে এলাম। তাঁকে বেশ দুশ্চিন্তামুক্ত ও আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। আমি কক্ষে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে এডিসি ইন্টারকমের মাধ্যমে জানালেন, প্রেসিডেন্ট অফিস ছেড়ে

যাচ্ছেন; আমি যেন রুমের ভেতরেই মন্ত্রীদের ব্যস্ত রাখি। এরশাদ মাঝেমধ্যে এ রকম চুপিসারেই বিনোদনের উদ্দেশ্যে অফিসের বাইরে যেতেন। তাঁর অতি বিশ্বস্ত সহযোগীরাই কেবল ওই সব সফরের স্থান ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতেন। এটা সম্ভবত ওই রকমই কোনো বিনোদনযাত্রা অথবা গোপনে কোনো রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি যাচ্ছেন। তবে উদ্দেশ্য যে বিনোদন, সেটাই বেশি করে বোঝা যাচ্ছিল। একটু পরই আমি এডিসি, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের অফিসে রেখে বাসায় চলে গেলাম। অফিস ছাড়ার আগে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় প্রেসিডেন্টের অফিসে টিভি ও রেডিও রেকর্ডিংয়ের লোকদের প্রস্তুত রাখার জন্য তথ্যসচিব তোয়াব খানকে বলে যাই। প্রেসিডেন্টের ভাষণ রাত নয়টায় প্রচারিত হবে, এটা আগে থেকেই স্থির করা ছিল।

সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ প্রেসিডেন্টের অফিসে যখন ফিরে আসি, তখন টিভি ও রেডিওর লোকজন তাঁদের রেকর্ডিংয়ের যন্ত্রপাতি ঠিক করার কাজে ব্যস্ত। মওদুদ আহমদ ও অন্য দুই মন্ত্রী তখনো পাশের কক্ষে বসে আছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করে বক্তৃতা লেখার অগ্রগতি সম্পর্কে কথা বলি। উদ্দেশ্য, বক্তৃতার কপিটা একবার একটু দেখা। তাঁরা বললেন, লেখা শেষ, এখন কম্পিউটারে টাইপ করা হচ্ছে। মন্ত্রী মীজানূর রহমান শেলী তখনো ইংরেজিতে অনুবাদের কাজ করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে অস্বাভাবিক গোপনীয়তা রক্ষার প্রবণতা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। সম্ভবত, সে কারণেই তাঁরা প্রেসিডেন্টের অফিস ছেড়ে যাননি। মওদুদ আহমদ ও আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ছাড়া ওই সময় এরশাদের পাশে জাতীয় পার্টির আর কোনো নেতাকে আমি দেখিনি। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পেছনে পার্টির নেতাদের মধ্যে আর কে কে কাজ করেছেন, আজও আমি সেটা জানতে পারিনি। কিছুক্ষণ পর মেজর জেনারেল আশরাফ এখানে এলেন। আমি তখনো বক্তৃতার কপি দেখার আগ্রহ গোপন রাখতে পারছিলাম না। বক্তৃতার কপি প্রস্তুত কি না, প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সচিব লে. কর্নেল সাইফকে ইন্টারকমে জিজ্ঞেস করতেই জানালেন, কপি রেডি আছে। তিনি একটা ইংরেজি কপি সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। আমি পড়তে শুরু করতেই আশরাফ আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং তিনিও শান্তভাবে পড়তে লাগলেন। আমি দুবার পড়ি, কিন্তু বক্তৃতায় যা লেখা হয়েছে, তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ৫৪ ঘণ্টা আগে হেলিকপ্টারে প্রেসিডেন্ট এরশাদ আমাকে কী বলেছিলেন, তা মনে করার চেষ্টা করি। তাঁর বলা সেসব কথার সঙ্গে কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার মনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো, তাঁর

ভাগ্যে অনেক দুর্ভোগ আছে, অপমানজনক পতনের হাত থেকে তাঁকে কেউ আর বাঁচাতে পারবে না। তিনি আবার তাঁর পুরোনো অভ্যাসমতো প্রতারণা আর ছলচাতুরি শুরু করেছেন। ক্ষমতা ছাড়বেন না। যেভাবেই হোক ক্ষমতা আঁকড়ে থাকবেন। বোঝা গেল, যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সুবিধাভোগী গ্রুপ প্রেসিডেন্টকে ঘিরে থাকে, তাঁদেরকেই তিনি আবার তাঁর কাছে ডেকে নিয়েছেন। তাঁদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে তিনি। সময়মতো সঠিক ও সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মনোবল জেনারেল এরশাদের কখনোই ছিল না। তিনি তাঁর মত পাল্টে ফেলতে পারেন বলে শুরুতে আমি যে আশঙ্কা করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত তিনি তা-ই করলেন। আবার প্রমাণ করলেন, তাঁকে বিশ্বাস করা যায় না। হালকা মেকআপ নিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ যে টেবিল ও চেয়ারে বসে নিত্যদিনের কাজ করতেন, সেখানেই বসলেন জাতির উদ্দেশে ভাষণ রেকর্ডিংয়ের জন্য। ওই অফিসে আমার উপস্থিতিতে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্টের ভাষণ রেকর্ড করা হচ্ছে। এর আগে বঙ্গভবনের রেকর্ডিং রুমে বসে সব ভাষণ রেকর্ড করা হতো। রেকর্ডিংয়ের জন্য ভাষণ পড়া শুরু করলে মনে হলো, প্রেসিডেন্ট যেন অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত। বক্তৃতার কিছু অংশ কয়েকবার নতুনভাবে রেকর্ড করতে হয়। পুরো বক্তৃতার সময়সীমা ছিল ১৩ মিনিট।

রেকর্ডিংয়ের সময় আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার রুমে চলে আসি। বক্তৃতার কপি পড়ার পর মনে হলো, তিনি যে মারাত্মক ভুলটি করলেন, সেই ভুলের খেসারত শুধু যে তাঁকেই দিতে হবে, তা নয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সারা দেশ না হলেও ঢাকা তখন বিস্ফোরণোন্মুখ। তাঁর বক্তৃতায় বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনকে আরও মারমুখী করতেই সাহায্য করবে। জানমালের আরও ক্ষয়ক্ষতি হবে। আমি খুব অসহায় ও দুঃখবোধে পীড়িত হতে থাকি। ১ ডিসেম্বর তিনি আমাকে বলেছিলেন, সম্মিলিত বিরোধী দল মনোনীত যেকোনো ব্যক্তির হাতে পদ ছেড়ে দেবেন এবং কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না; এমনকি রাজনীতিও ছেড়ে দেবেন। অথচ এখন তিনি একই দিনে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা বলছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি জাতীয় পার্টির প্রার্থী হবেন এবং নমিনেশন পেপার জমা দেওয়ার মাত্র ১৫ দিন আগে পদত্যাগ করবেন। আমি এই ভেবে বিস্মিত হলাম, কীভাবে তিনি ভাবতে পারলেন যে, কোনো বিরোধী দল বা জোট আবারও তাঁর এই প্রতারণার ফাঁদে পা দেবে! গত প্রায় নয় বছরে তিনি বহু রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে ছলচাতুরি করেছেন। এ রকম কিছু নেতা তাঁর পার্টিতেও আছেন। আমি

নিশ্চিত ছিলাম, এবার তিনি সফল হবেন না। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বুঝতে বিশেষ রাজনৈতিক বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়। ১ ডিসেম্বরের আলোচনার পর আমি ভেবেছিলাম, তাঁর মধ্যে পরিবর্তন এসেছে এবং তাঁর কথা আমি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম। আশা করেছিলাম, দেশ একটা বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা পাবে, কিছুটা হলেও আশার আলো দেখবে। কিন্তু কী বিপজ্জনকভাবেই না তিনি এখন ঘুরে দাঁড়ালেন! প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সেদিন হেলিকপ্টারে বসে আলোচনার সময় একটা বিষয়ে আমি তাঁকে বিশেষ জোর দিয়েই বলেছিলাম, তাঁর নিঃশর্তভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত তিনি যেন কোনোভাবেই পরিবর্তন না করেন। অথচ বাস্তবে দেখা গেল একান্ত ব্যক্তিস্বার্থ এবং ঘনিষ্ঠ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে প্রধান বিবেচ্য ছিল। কেন তিনি জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে চান এবং নমিনেশন পেপার জমা দেওয়ার মাত্র ১৫ দিন আগে পদত্যাগ করতে চান, সেটা কারও না বোঝার কথা নয়। বিরোধীদের চাপ স্বাভাবিক করার জন্য তিনি কেবল সময়ক্ষেপণ করতে চাইছেন। তিনি কিংবা তাঁর উপদেষ্টারা ভেবেছিলেন, কোনো কোনো বিরোধী দল ও নেতা তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেবেন। এ সময় বিরোধীদলীয় নেতারা তাঁর প্রবঞ্চনামূলক প্রস্তাব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন।

ভাষণ রেকর্ডিংয়ের পর প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আইসিসির ড্রাফটিং রুমে যান। গত ২৭ নভেম্বরের মতো এবারও তিনি সব মন্ত্রীকে আসতে বলেছিলেন। পরিবেশ ছিল খুবই অস্বাভাবিক ধরনের। প্রত্যেকের মুখে আতঙ্ক ও বিষণ্নতা লক্ষ করার মতো। প্রেসিডেন্ট তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ ও বক্তৃতার সারমর্ম ব্যাখ্যা করার পর উপস্থিত কাউকে কোনো ধরনের আলোচনার অবকাশ না দিয়ে সভা দ্রুত শেষ করেন এবং সবাইকে বাসায় গিয়ে রেডিও বা টেলিভিশনে তাঁর ভাষণ শুনতে বলেন। আমিও তখনই অফিস ছেড়ে বাসার পথে রওনা হলাম। প্রেসিডেন্ট দুই-তিনজন মন্ত্রীকে নিয়ে নিজের অফিসে গিয়ে ঢুকলেন। ঢাকা শহরে এরই মধ্যে কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে। পথের বিভিন্ন মোড়ে পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর ছোট ছোট দলকে পাহারারত অবস্থায় দেখলাম। বঙ্গভবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম, সামনের দিনগুলোয় কী হতে যাচ্ছে! প্রেসিডেন্ট এরশাদ আট বছরের বেশি সময় ধরে নানা কৌশলে দেশ চালিয়েছেন। নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি সামরিক ও বেসামরিক

আমলাতন্ত্র, ধর্মীয় অনুভূতি এমনকি বৈদেশিক যোগাযোগগত সূত্রকেও ব্যবহার করেছেন। চমৎকার ব্যবহার, নম্র ও অতিমাত্রায় বিনয়পূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তিনি যে কাউকে মুগ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এখন তিনি সব অশুভ কৌশলের প্রয়োগ শেষ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেরই পাতা জালে আটকা পড়তে চলেছেন।

১৯৮৬-এর সাধারণ নির্বাচনের সময় তিনি আওয়ামী লীগকে অন্তত বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তা ছাড়া তিনি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনেও সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এরশাদকে বিশ্বাস করার ফলে সবচেয়ে খারাপ শিক্ষা লাভ করেছিল। নির্বাচনে কারচুপি হয়েছিল এত ব্যাপকভাবে ও সুপরিকল্পিত উপায়ে যে শেখ হাসিনাকেও জাতীয় পার্টির প্রার্থীর কাছে হেরে যেতে হয়েছিল। মূলত এরশাদের নিজের সরকারি বা বেসরকারি হস্তক্ষেপের কারণেই আওয়ামী লীগের বহু প্রার্থী হেরে গিয়েছিলেন। এরশাদের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং আওয়ামী লীগের প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী। এই শর্তে তিনি সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনে সম্মত হয়েছিলেন। পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, অর্থাৎ পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া এবং ১৯৮৮-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ না করার মতো বিভিন্ন ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রেসিডেন্ট এরশাদের আচরণে তারা কতটুকু বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল। এবার যে কেউই তাঁর সাহায্যে আসবেন না, সেটা প্রায় সুনিশ্চিত।

এদিকে ৩ ডিসেম্বর সভা-সমাবেশ-মিছিল, সংঘর্ষ, গুলি ও হতাহত হওয়ার মতো অনেক ঘটনা ঘটে। এরশাদ হটাও আন্দোলন এখন একেবারেই তুঙ্গে। ৩ ডিসেম্বর সকাল থেকেই সরকারি প্রশাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে কমবেশি অকার্যকর হয়ে পড়ে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিষ্ক্রিয় ও শিথিল ভূমিকা গ্রহণ করে। শহর থেকে সেনাবাহিনীর সব ইউনিট ফিরিয়ে নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, বায়তুল মোকাররম চত্বর ও গুলিস্তান সিনেমা হল ক্রসিংয়ের সামনে বিশাল বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার তথ্য অনুযায়ী, ওই দিন সন্ধ্যায় ঢাকায় জনগণ এরশাদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ছিল ঐক্যবদ্ধ। এ অবস্থায় তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না বলে অভিমত জানানো হয়। ঢাকা পরিণত হয় গুজব ও রটনার শহরে। রেডিও ও টেলিভিশনে আন্দোলন কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলোর কোনো সংবাদ ছিল না। জরুরি আইন ঘোষণার

প্রতিবাদে ২৭ নভেম্বর থেকে ঢাকাসহ সারা দেশের সব পত্রপত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ। রাজধানীতে কী ঘটছে, তার প্রকৃত ছবি কেউই পাচ্ছিল না। দেশবাসী গুজব, রটনা ও অদ্ভুত যুক্তিহীন সব অনুমানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিদেশি রেডিও, বিশেষত বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা জনগণের কাছে সংবাদের প্রধান উৎস হয়ে ওঠে। এসব সংস্থা আন্দোলনের মুখপত্রে পরিণত হয়। জনগণ এসব সংস্থার পরিবেশিত সংবাদ ও ব্যাখ্যার প্রতি যেমন বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করে, তেমনি আন্দোলনের নেতারাও বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার মাধ্যমে তাঁদের নির্দেশ দিতে থাকেন।

পরের দিন, অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় প্রেসিডেন্টের অফিসে যাই। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এর ৩০ মিনিট পরে আসেন এবং সোজা নিজের অফিসে চলে যান। আমি আমার অফিসে ফিরে অনেকটা নিষ্ক্রিয় ও নিরুৎসাহী হয়ে বসে থাকি। এখানে-সেখানে টেলিফোন করে কোথায় কী ঘটছে, জানার চেষ্টা করি। গতকালের মতো আজও সকালের দিকে প্রেসিডেন্টের অফিস ঘিরে কোনো তৎপরতা ছিল না। মন্ত্রী নাজিউর রহমান ছাড়া আর কোনো মন্ত্রী, কোনো সচিব কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। নাজিউর রহমান যেমন চুপিসারে আসেন, তেমনি চুপিসারে দেখা করে তড়িঘড়ি চলে যান। কোথায় কী ঘটছে, তা জানতে না পেরে অস্থির লাগছিল ও অসহনীয় বোধ করছিলাম। সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের এত কাছে থেকেও কিছু জানতে না পেরে, কিছু করতে না পেরে আরও বেশি করে হতাশা বোধ করতে থাকি। প্রেসিডেন্টও আমাকে ডাকেননি, আমিও নিজের থেকেও তাঁর রুমে যাইনি। ভেবেছিলাম, হয়তো রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন। কিন্তু ডাকেননি। কাজেই নিজের অফিসেই আমি বন্দী থাকলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

সেনাবাহিনীর অবস্থান পরিবর্তন

সেদিন সেনা সদর দপ্তরে যা ঘটেছিল

অফিসে একাকী ও কর্মহীন অবস্থা অসহ্য মনে হচ্ছিল। ওদিকে ঢাকার রাস্তায় কী হচ্ছে, তার কিছু চিত্র পাচ্ছিলাম পুলিশের ওয়্যারলেস নেট থেকে। আমার থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে দেশের প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিসে বসে আছেন, আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বাহ্যিক রূপটা স্থির ও অচঞ্চল, যেন কোথাও কোনো কিছুই ঘটছে না, এমন একটা ভাব তাঁর। তিনি খেলার সর্বশেষ কার্ডটি ছেড়ে দিয়েছেন এবং আগ্রহভরে প্রত্যাশা করছেন পরিস্থিতি এবারও তাঁর পক্ষেই মোড় নেবে। কিন্তু আমি ভেতরে ভেতরে হতাশা ও বিরক্তিতে জ্বলছিলাম। হঠাৎ করেই মনে হলো, এসব কিছু নিয়ে এখনো আমি কেন সেনা সদর দপ্তরের কারও সঙ্গে কথা বলছি না! পরক্ষণে ভাবলাম, একবার ঘুরেই আসি। তখন বেলা দুপুর সাড়ে ১২টার মতো। আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহকর্মী, চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) মেজর জেনারেল আবদুস সালামকে টেলিফোন করলাম। মনে হলো, তিনিও আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই যেন বসে ছিলেন। টেলিফোন ধরেই বললেন, 'স্যার, আপনার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনার আছে, প্লিজ, সেনা সদর দপ্তরে এক্ষুনি চলে আসুন।'

তাঁর বলার ভঙ্গিতে বিষয়ের গুরুত্ব ও জরুরি অবস্থার ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম। আমি প্রেসিডেন্টের কাছে অনুমতির জন্য যাই। তিনি তখন কারও সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলেন। আমাকে দেখামাত্র টেলিফোন রেখে তাকালেন। সেনা সদর দপ্তরে যাওয়ার কথা বলতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিয়ে

বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার যাওয়া উচিত। গিয়ে দেখো, সেনাবাহিনীর মধ্যে আমার গত রাতের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে!'

কয়েক মিনিট পরই আমি সিজিএসের অফিসে ঢুকলাম। সেখানে মেডিকেল সার্ভিসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল নুরুল হক বসে ছিলেন। জেনারেল সালাম আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, 'আমরা আপনাকেই খুঁজছি। আপনার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে আলোচনায় আগ্রহী অন্য জেনারেলদেরও ডাকি।' ইন্টারকমের মাধ্যমে তিনি কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (কিউএমজি) মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান ও অর্ডিন্যান্সের মাস্টার জেনারেল (এমজিও) মেজর জেনারেল কে এম আবদুল ওয়াহেদকে আমার কথা বলে তাঁর অফিসে চলে আসতে বললেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁরা এসে গেলেন। সালাম আমাকে বললেন, সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দীন খান সকালে অডিটরিয়ামে সেনা সদর দপ্তরের সব কর্মকর্তার উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং গত রাতে রেডিও ও টেলিভিশনে দেওয়া প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে সেনা অফিসারদের অবহিত করার জন্যই তাঁদের এই সমাবেশের আয়োজন করেন। হয়তো প্রেসিডেন্টের নির্দেশেই তিনি অফিসারদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। দেশের কোনো সংকট বা রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিলে সেনা সদর দপ্তরে অফিসারদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়া এবং সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করার ধারণ করা দৃশ্য দেশবাসীকে সন্ধ্যায় বিটিভি মারফত দেখানো প্রেসিডেন্ট জিয়া ও এরশাদ উভয়েরই নিয়মিত কর্মসূচির অঙ্গীভূত বিষয় ছিল। কিন্তু এই প্রথমবার এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। বর্তমান আন্দোলনের সময় প্রেসিডেন্ট এরশাদ সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সেনা সদর দপ্তরে কোনো বৈঠক বা সম্মেলন করেননি। সালাম আমাকে বলেন, সেনাপ্রধানের বক্তৃতার পর কিছু অফিসার তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি সেনাবাহিনী অব্যাহত সমর্থনের জন্য তাঁকে অপ্রীতিকর প্রশ্ন পর্যন্ত করা হয়। কেউ কেউ বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তাঁর মন্ত্রীদের দুর্নীতি ও অপকর্মের জন্য সারা জাতি আজ সেনাবাহিনীকে দায়ী করছে। সেনাবাহিনীর সমর্থনের জন্যই তাঁরা এখনো ক্ষমতায় টিকে আছেন। প্রশ্ন করা হয়, তাঁর পক্ষ নিয়ে সেনাবাহিনী কেন এসব দুর্নামের দায় নিচ্ছে! এমনকি কেউ কেউ এমন কথাও পর্যন্ত বলেন যে সেনাবাহিনীর অফিসার ও সেনাদের নিয়ে লোকে ব্যঙ্গ করে এবং প্রায়ই

এরশাদের লোক বলে তাঁদের গালাগাল দেয়। তাঁরা বলেন, সেনাবাহিনীকে টেনে না এনে কিংবা তার ওপর ভর না করে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর চলমান রাজনৈতিক বিরোধের মীমাংসা করার জন্য প্রেসিডেন্টকে বলতে হবে। জেনারেলরা আমাকে আরও বললেন, ওই সমাবেশে ক্ষোভের যে ইঙ্গিত দেখা গেল, তা উপেক্ষা করার মতো নয়। দেশজুড়ে যখন প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে, তখন সেনাবাহিনীর অফিসারদের মনোভাব বোঝার জন্য ওই ঘটনাই ছিল যথেষ্ট। অফিসারদের মূল বক্তব্য ছিল, প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে, তাকে মোকাবিলা করা বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যেন সেনাবাহিনীকে আর কোনোভাবেই ব্যবহার করা না হয়।

আমি জানালাম, বেসামরিক প্রশাসনের কেন্দ্র সচিবালয়ের অফিসার ও কর্মচারীরা কাজ করছেন না। পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা অফিসে যাবেন না। অধিকাংশ সরকারি বা আধা সরকারি অফিসে কাজকর্ম চলছে না। প্রেসিডেন্ট সব দিক থেকে সমর্থন হারাচ্ছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সেনাবাহিনী ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর সমর্থন নেই। কিন্তু সেনা সদর দপ্তরের অডিটরিয়ামে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তা-ই এখন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। আমি আমার মনোভাব প্রকাশ করে বললাম, পদত্যাগ ছাড়া প্রেসিডেন্টের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। আরও উল্লেখ করলাম, ১ ডিসেম্বর তিনি পদত্যাগ করবেন বলে আমাকে বলেও ছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ পদক্ষেপ দেখে মনে হয় না, তিনি সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। এখন বোঝাই যাচ্ছে, টিকে থাকতে হলে তিনি সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে দ্বিধা করবেন না। তাতে করে রাজনৈতিক মহলের আক্রোশ আরও বেড়ে যাবে। তা ছাড়া সেনাবাহিনীর ভেতরেও বিশৃঙ্খল ও অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মধ্যবর্তী ও জুনিয়র অফিসারদের মনোভাব বুঝতে পেরে এবং একটি গণ-আন্দোলন দমন করতে সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত করলে তার পরিণতি যে মারাত্মক হতে পারে, তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন শুনে আমি স্বস্তি বোধ করলাম। সকালে অফিসাররা যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন, কেউ তাঁর বিরোধিতা করেননি। এ অবস্থায় কী করা উচিত এবং আমি কিছু করতে পারি কি না, জেনারেল সালাম তা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, অফিসারদের এমন ক্ষোভের বিষয়টি অবিলম্বে প্রেসিডেন্টকে জানানো উচিত। তাঁকে জানাতে হবে, তিনি যেন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার না করেন এবং আলোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধান করতে

উদ্যোগী হন। আরও বললাম, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেনাপ্রধানের উচিত অবিলম্বে প্রেসিডেন্টকে সেটা অবহিত করা। এ-ও বললাম, আমি এখনই এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেব। আরও পরামর্শ দিলাম, সাক্ষাতের সময় সব জেনারেল যেন সেনাপ্রধানের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু সালাম আমাকে বলেন, সম্ভবত সেনাপ্রধান এতে সম্মত হবেন না এবং তাতে করে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আমি তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারি। তিনি সরাসরি বললেন, আমি ছাড়া এ অবস্থায় আর কেউ নেই, যিনি প্রেসিডেন্টের কাছে এসব কথা বলতে পারেন। আমি সম্মত হলাম এবং আশ্বাস দিলাম, প্রেসিডেন্টকে সব বিষয় বুঝিয়ে বলতে আমি একটুও দ্বিধা করব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আন্দোলন দমনে সেনাসদস্যদের নিয়োগ নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যেই যে অসন্তোষ রয়েছে, তা যদি প্রেসিডেন্টকে জানানো যায়, তাহলে তিনি পদত্যাগের পথই বেছে নেবেন।

সেনা অফিসারদের প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সেনাবাহিনীকে জড়িত করার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশের ঘটনা একটা বিরল দৃষ্টান্তই বলা যায়। এর আগে দুই সেনাপ্রধান প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ জেনারেল জিয়া ও বর্তমানে জেনারেল এরশাদের শাসনামলে অফিসারদের তাঁদের সুপ্রিম কমান্ডারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এ ধরনের অসন্তোষ প্রকাশের ঘটনা দেখা যায়নি। ১৯৭৫-এর আগস্টের পর থেকে দুই সেনাবাহিনী প্রধানের ক্ষমতার রাজনীতি আমি লক্ষ করে আসছি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ছিল তাঁদের স্প্রিং বোর্ডস্বরূপ। জেনারেল জিয়াউর রহমানই এ কাজটা প্রথমে শুরু করেন। তিনি সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সামরিক ও বেসামরিক নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনশক্তি ব্যবহার করে বেসামরিক প্রশাসন ও রাজনীতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেনাপ্রধান হিসেবে পুরো সেনাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক আজ্ঞানুবর্তিতা ও আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে প্রথমে ক্ষমতা দখল, তারপর ক্ষমতাকে সুসংহত করা এবং সবশেষে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য উল্লিখিত দুজনই প্রতিরক্ষা বাহিনীকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। উভয়ই নিজেদের ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীকে তুষ্ট রাখতে তাদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে জেনারেল এরশাদই কয়েক ধাপ এগিয়ে। এর ফলে সব বাহিনীর সদস্যই দেশের রাজনীতিসচেতন জনগণের সমালোচনা ও বিদ্বেষের

লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। সামরিক বাহিনীর লোকদের কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। একদিকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত রাখা; অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ও সামরিক বাহিনীকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাখার মাধ্যমে শাসকদের নিজেদের সব সময় স্বস্তিতে রাখা। জেনারেল এরশাদ খুবই সাফল্যের সঙ্গে এই লক্ষ্য হাসিল করতে পেরেছেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীরই অংশ। তাঁরাও রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন, যার ফলে সামরিক বাহিনীতেও এরশাদবিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সিজিএসের অফিসে আলোচনা শেষ করে সেনাপ্রধানের মনোভাব জানার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমি তাঁকে জানালাম, চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারবিরোধী আন্দোলন ব্যাপক শক্তি অর্জন করেছে এবং আগামী দিনগুলোয় আরও বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার সব ধরনের আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো প্রেসিডেন্টের ১০ দফা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা তাঁকে আর বিশ্বাস করে না এবং তাঁর প্রস্তাবিত ১০ দফা প্রস্তাব চলমান আন্দোলনকে আপাতত থামানোর একটা কৌশল হিসেবে দেখছে। আমি আভাস দিই, প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে জড়িত করবেন। সেনাবাহিনীর কোনো অংশকে আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিয়োগ করলে তাঁর পরিণতি খুবই খারাপ হবে। তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন এবং বললেন, ঘটনার প্রতি তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। তবে সকালে সেনা সদর দপ্তরে অফিসারদের সমাবেশে তিনি যে বক্তব্য দেন এবং সেখানে তাঁকে যে কিছু অপ্রীতিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, সে সম্পর্কে একবারও কিছু উল্লেখ করলেন না। আমিও কিছুক্ষণ আগে সিজিএসের অফিসে জেনারেলদের সঙ্গে ওই ঘটনা নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, সে প্রসঙ্গ আর তুলিনি।

সেনাবাহিনী এরশাদের পক্ষে নেই

আমি প্রেসিডেন্টের অফিসে যখন ফিরে আসি, তখন প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর প্রধান অফিস রুমের লাগোয়া ছোট কনফারেন্স রুমে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। আমি ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলেন, সদর দপ্তরের কী খবর? আমি চট করেই বলে ফেললাম, খবর ভালো নয়।

কয়েক মুহূর্ত আগেও আমি কথাগুলো কীভাবে বলব, বিশেষত শুরুটা কীভাবে করব, তা নিয়ে দ্বিধায় ছিলাম। যা শুনেছি এবং বলতে যাচ্ছি, তা যে

মোটেই সুখকর নয় এবং তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা নিয়ে ভাবনায় ছিলাম। কিন্তু তাঁর প্রশ্নের উত্তরে 'খবর ভালো নয়' কথাটা মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়ায় বাকি কথা বলার পথ সুগম হলো। তাঁর সরকার ও চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অফিসাররা সেনা সদর দপ্তরের অডিটরিয়ামে সকালে সেনাপ্রধানের কাছে যে তিক্ততা প্রকাশ করেছেন, সে কথা তাঁকে সরাসরি বললাম। রাজনৈতিক সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা নিয়ে বিশেষভাবে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বললাম, এ পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীকে জড়ানোর বিপক্ষে অনেকেই তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন।

কথাগুলো শুনে তিনি যে একটা ঝাঁকুনি খেলেন, পরক্ষণেই সেটা বুঝতে পারলাম। তবে প্রেসিডেন্ট প্রথমে নরম সুরে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন, 'সেনাবাহিনীর অফিসাররা এখন এমন কথা বলছে কেন? আমি সেনাবাহিনীর জন্য যা করেছি, তা তোমরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ?' কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি কী কী করেছেন, তার কিছু ফিরিস্তি তুলে ধরলেন। আমি নিশ্চিত, তিনি সমগ্র ঘটনার সারাংশটি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল। একজন পরিচারক খাবার পরিবেশন করছিলেন। তাঁর পেছনের দেয়ালঘড়িতে তখন বেলা একটা পঞ্চাশ মিনিট। তিনি ধীরে ধীরে খাচ্ছিলেন, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, খাবারের প্রতি তাঁর মন ছিল না। আমার মুখ থেকে তিনি যা শুনলেন, ভেতরে ভেতরে যে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সেটা টের পাচ্ছিলাম। সেনাবাহিনী তাঁর পেছনে থাকবে না, এমন কথা তাঁকে কোনো দিন শুনতে হবে বলে তিনি ভাবতেও পারেননি। ধরেই নিয়েছিলেন, সেনাবাহিনীকে সব সময়ই তিনি তাঁর পাশে রাখতে পারবেন। আমার সঙ্গে আলোচনায় আর উৎসাহ নেই বুঝতে পেরে অনুমতি নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করি এবং সোজা বাসার দিকে রওনা হই।

বঙ্গভবনে যাওয়ার পথে মনটা খুবই হালকা লাগছিল। এমন নাজুক সময়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে কতগুলো অপ্রিয় সত্য বলতে পেরেছি, যা তাঁকে শোনানো আমার অতি আবশ্যিক কর্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব বলেই মনে করছিলাম। যে ধরনের কথা শোনার প্রত্যাশা তিনি কমই করেছেন, তা-ই আমি তাঁকে শোনাতে সক্ষম হয়েছি। সেনাবাহিনী ছিল তাঁর ক্ষমতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তিনি নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু তাঁকে শুনতে হলো, এখন তাঁর অনুকূলে সেনাবাহিনীর সমর্থন আর নিশ্চিত নয়। এটা তাঁর জন্য একটা বড় ধরনের আঘাতস্বরূপ ঘটনা হলেও দৃশ্যত

তিনি এ ব্যাপারে তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। এমন অপ্রিয় সত্য বলার মধ্যে বিরাট ঝুঁকি থাকলেও আমি তাঁকে সেটা সাহস করে বলেছি। কিন্তু তিনি কি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন? আমি এরশাদের মানসিকতা জানি, তাঁর এই শান্ত ভাবমূর্তির পেছনে অন্য কিছু থাকা অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং, কী হবে তার পরবর্তী পদক্ষেপ? মুখ বুজে তিনি কি সব সহ্য করবেন? প্রায় নয় বছর ধরে দেশ শাসন করছেন, ছয় বছর সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন, বহু অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। তিনি কি সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন এবং অতীত দুষ্কর্মের জন্য মারাত্মক পরিণতির মোকাবিলা করবেন? আমি তাঁকে যা বলেছি, সেটাকে কি তিনি সেনাবাহিনীর অধিকাংশের মতামত বা অনুভূতি হিসেবে মেনে নেবেন? তা যদি হয়ও, তিনি কি এ ধরনের উদ্যোগ প্রতিহত করবেন না? সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ঘনিষ্ঠ ও অনুগতরা কি এত সহজে হাল ছেড়ে দেবেন? এরশাদের পতনের পর তাঁদের বেলায় যা ঘটবে, সে সম্পর্কে কি তাঁরা সতর্ক নন? তাঁরা কি এ পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করবেন না? বঙ্গভবনের দিকে আমি যতই এগোচ্ছিলাম, ততই এসব প্রশ্ন আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এসব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলো আমার মনকে কেবলই চিন্তা-ভারাক্রান্ত করছিল। অপ্রিয় সত্য কথা বলার মধ্য দিয়ে আমার মনের ভার নেমে গেলেও অনিশ্চয়তা ও সম্ভাব্য বিপদ থেকেই গেল।

বাসায় ফিরে তাড়াতাড়ি খাবার সেরে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য টেলিফোন ও পুলিশ কন্ট্রোলের ওয়্যারলেস সেট সামনে নিয়ে বসি। বঙ্গভবনে আমার বাসা থেকে গুলিস্তান ও বায়তুল মোকাররম স্কয়ারে অনুষ্ঠিত জনসভার বক্তাদের উচ্চকণ্ঠের বক্তৃতা শুনতে পাচ্ছিলাম। স্লোগান, চিৎকার, হইচই ও বিস্ফোরণের শব্দ প্রায়ই শোনা যাচ্ছিল। পুলিশের ওয়্যারলেস সেটগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং তিনটি প্রধান জোটের সভাস্থল থেকে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলোর বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল সর্বক্ষণ। সভা শেষে বহু মিছিল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের রিপোর্ট থেকে বোঝা যায়, সভা ও মিছিলে বিপুলসংখ্যক লোকের সমাগম ঘটেছে। সন্ধ্যা ছয়টায় প্রেসিডেন্ট লাল টেলিফোনে আমাকে ডাকলেন। অত্যন্ত নম্র ও স্বাভাবিক কণ্ঠে সেনা সদর দপ্তরে আমি যা শুনেছি, সেসবই আবার শুনতে চান এবং জিজ্ঞেস করেন, সেনাবাহিনী প্রধানের ব্রিফিংয়ের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম কি না। জানালাম, ব্রিফিংয়ের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না, তাঁকে যা বলেছি, তা পরে সিজিএস ও অন্য সিনিয়র অফিসাররা আমাকে বলেছেন। তখন তিনি জানতে চান সেনা সদর দপ্তরের অডিটরিয়ামে কী ঘটেছিল, সে

সম্পর্কে কে বিস্তারিত বলতে পারবে। আমি এ ব্যাপারে সেনাবাহিনী প্রধানকে জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দিলে তিনি বললেন, 'না, নূরউদ্দীন আমাকে তো কিছু বলল না।' আমি সিজিএস জেনারেল আবদুস সালামের সঙ্গে কথা বলতে অনুরোধ করলাম। তিনি আর কিছু না বলেই টেলিফোন রেখে দিলেন।

প্রেসিডেন্ট টেলিফোন রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমি জেনারেল সালামকে টেলিফোন করি। তাঁকে সহজেই পাওয়া গেল। তিনি আমার কাছ থেকে দুপুরে প্রেসিডেন্টকে কী কী বলেছি, তা শোনার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করছিলেন বলে জানান। সেনা সদর দপ্তর থেকে ফিরে প্রেসিডেন্টকে কী বলেছি এবং এক মিনিট আগে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে, খুলে বলি। আমি তাঁকে আভাস দিলাম, মনে হচ্ছে, বরফ গলতে শুরু হয়েছে এবং প্রেসিডেন্টকে উদ্বিগ্ন মনে হলো। আরও বললাম, প্রেসিডেন্ট তাঁকে যেকোনো সময় টেলিফোন করতে পারেন এবং তিনি যেন অফিসারদের তিক্ত মনোভাবের কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন।

সালাম জোর দিয়ে বললেন, তিনি যা দেখেছেন ও বুঝেছেন, প্রেসিডেন্টের কাছে তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না। মনে হয়, দুপুরের খাবারের সময় সেনা সদর দপ্তরে অফিসারদের অসন্তোষ প্রদর্শনের বিষয়াদির বিষয়ে তাঁকে অবহিত করার পর তিনি বিষয়টা যতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছিলেন, চার ঘণ্টা পর বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন পরিস্থিতি তার চেয়ে আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সম্ভবত, সে কারণেই সেনা সদর দপ্তরের ঘটনা বিস্তারিত জানার জন্য আবার আমাকে টেলিফোন করেছেন। এমনও হতে পারে, তিনি গোয়েন্দা সূত্র থেকেও সবকিছু শুনেছেন। তবে এখন যে তিনি আরও শঙ্কিত, সেটা বুঝতে পারলাম। সালামের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর আমি আবার সভা-সমাবেশ ও অন্যান্য ঘটনা-দুর্ঘটনাসংক্রান্ত সংবাদ জানার কাজে মনোযোগী হই। আন্দোলন হিংস্রতার দিকে মোড় নেয় কি না, সেদিকেই লক্ষ রাখছিলাম বেশি। বিবিসির বাংলা সংবাদ প্রচারের সময় ঘনিয়ে এলে রেডিও নিয়ে বসি। সম্ভবত, পুরো বাংলাদেশই তখন বিবিসির সংবাদ শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এরশাদবিরোধী আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

একই দিনে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান, শর্তযুক্ত পদত্যাগ, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার এবং আরও কিছু সাধারণ ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির এতটুকুও পরিবর্তন করতে পারল না। বরং আন্দোলনের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। বিরোধী সব রাজনৈতিক দল ও নেতা

প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁদের বুঝতে একটুও বিলম্ব হলো না যে তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। আর একটু চাপ পড়লেই এরশাদ চূড়ান্তভাবে ধরাশায়ী হবেন।

৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিবিসির বাংলা প্রোগ্রামের পুরো এক ঘণ্টাই ছিল বাংলাদেশের চলমান ঘটনা নিয়ে। তখন পর্যন্ত ভেতরের যেসব খবর আমি জানতাম, তার সঙ্গে বিভিন্ন সহিংস ঘটনা, বিবিসির প্রতিনিধির ভাষ্য এবং বিশ্লেষকদের অনুমান ইত্যাদি মিলিয়ে যা-কিছু দাঁড়াল, তাতে একটা ভয়ানক অবস্থার ছবিই চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতন যে সময়ের ব্যাপার মাত্র, সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। বিবিসির প্রতিনিধি সিরাজুর রহমান বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার কাহিনি এবং রাজনৈতিক নেতাদের বিবৃতি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের একটি দীর্ঘ চিত্র তুলে ধরলেন। এ সময় বিবিসি কমবেশি বিরোধী দলগুলোর মুখপত্রে পরিণত হয়। তাদের প্রতিবেদনগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে একদর্শী ও পক্ষপাতমূলক ছিল। প্রতিবেদনের কিছু ঘটনা সঠিক ছিল না। দুপুরে যখন প্রেসিডেন্টের অফিস ছেড়ে বের হচ্ছিলাম, গাড়ি-বারান্দায় প্রেসিডেন্ট এরশাদের অন্যতম বিশ্বস্ত মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হলো। প্রেসিডেন্ট তাঁকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য নিয়োগ করেছিলেন বলে জানতাম। কোনো সুসংবাদ বয়ে এনেছেন কি না, জিজ্ঞেস করতেই আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে কোনো কথা না বলে তিনি দ্রুত প্রেসিডেন্টের অফিসের ভেতরে ঢুকে যান। তাঁকে দেখে বেশ আত্মপ্রত্যয়ী মনে হলো। পরে শুনেছি, শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ কোনো একটা প্রধান বিরোধী দলের সঙ্গে সমঝোতায় আসার জন্য খুব মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে, তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটা সমঝোতার আশা করছিলেন। ১৯৮৬ সালে শেষ মুহূর্তে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগ তাঁকে রক্ষা করেছিল। কিন্তু পরে তাঁরা এরশাদের প্রতারণার শিকার হয়েছিল। এবার সে আশা করা বৃথাই বলে মনে হলো।

চতুর্থ অধ্যায়

এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা

পদত্যাগ ঘোষণা-পরবর্তী অবস্থা

রাত তখন ১০টার বেশি। আমি ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা সংবাদ শুনছিলাম। হঠাৎ লাল টেলিফোন বেজে উঠল। প্রেসিডেন্টের মুখ্য সচিব সাদেকের টেলিফোন। টেলিফোন ধরলেন আমার স্ত্রী। আমি তাঁর সঙ্গে পরে কথা বলব বলে তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। একটু পরে অন্য টেলিফোন বেজে উঠল। এবার আমিই টেলিফোন ধরি। সেনা সদর দপ্তরের মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানের টেলিফোন। তাঁর কণ্ঠে উত্তেজনা। ফোনে তিনি যা বললেন, আমাকে তা রীতিমত হতবাক করে দেয়। আমি টেলিভিশন দেখছি কি না জিজ্ঞেস করেই বললেন, 'টিভিতে বলছে প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করেছেন—এটা কি সত্যি?'

এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, অথচ আমি তার কিছুই জানি না! এ ব্যাপারে আমি আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কথা বললাম। তাঁর টেলিফোন রেখেই লাল টেলিফোনে প্রেসিডেন্টের বাসার অফিসের নম্বরে রিং করলাম। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে কোনো জবাব নেই। বাসার ভেতরের অন্য নম্বরে রিং করলাম, কিন্তু সেটা ব্যস্ত থাকার সংকেত পেলাম। এবার এডিসি ক্যাপ্টেন কামালকে টেলিফোন করলাম। কামাল জানালেন, প্রেসিডেন্ট সত্যিই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরও বললেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরেই আছেন। প্রথমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ আসেন, পরে

ভাইস প্রেসিডেন্ট টিভি স্টেশন থেকে সোজা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমি জানতাম, ওই সন্ধ্যায়ই ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ টিভিতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সর্বশেষ প্রস্তাবের পক্ষে সাফাই গেয়ে বক্তব্য দেবেন। এডিসি আরও জানালেন, একপর্যায়ে মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর রুমের টেলিফোন থেকে সরাসরি বিটিভির সংবাদকক্ষ থেকে তাঁর পদত্যাগের খবরটি প্রচারের কথা বলেন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই বললে এডিসি আমাকে জানালেন, প্রেসিডেন্ট ভেতরের ঘরে চলে গেছেন। তবে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী তখনো ড্রয়িংরুমে বসে আছেন।

আমি এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে সেনাভবনে যাওয়ার জন্য গাড়ি আনতে বলে তৈরি হলাম। এ সময় প্রেসিডেন্টের কাছে থাকার প্রয়োজন অনুভব করলাম। সহকারী সামরিক সচিব (এএমএসপি) লে. কর্নেল আতিকুর রহমান মুন্সিকে টেলিফোনে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের কথা এবং তখনই কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিই। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সেনাভবনের পথে রওনা হলাম। বঙ্গভবনের প্রধান ফটক পার হতেই আতিক ওয়্যারলেসে বেশ আতঙ্ক মেশানো স্বরে আমাকে বঙ্গভবনের বাইরে যেতে নিষেধ করলেন। পুলিশ কন্ট্রোল তাঁকে জানিয়েছে, শহরের বিভিন্ন জায়গায় গোলযোগ শুরু হয়ে গেছে। ক্যান্টনমেন্টে পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তায় চলাচল করা খুবই বিপজ্জনক। এ অবস্থায় আমি যেন কিছুতেই পথে বের না হই। বহু লোক রাস্তায় জমায়েত হচ্ছে এবং ভাঙচুর শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু আমি যেভাবেই হোক যাব—এই একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে চলতে থাকি। আতিক ওয়্যারলেস সেটে বারবার বলছিলেন, 'যাবেন না।' ততক্ষণে আমি শিল্পব্যাংক ভবন পার হয়ে গেছি। সামনে দেখি, রাস্তায় লোকজন ভর্তি। দৈনিক বাংলা ক্রসিংয়ের অবস্থা আরও ভয়াবহ। শত শত লোক রাস্তায়, কারও হাতে ইট, কারও হাতে লাঠি। ইট ও পাথরের টুকরোয় রাস্তা ভরে আছে। ১০-১২ বছরের এক ছেলে বাঁশ হাতে দাঁড়িয়ে আছে, যেটা তার থেকে দ্বিগুণ লম্বা। জনতার মনোভাব উৎসবমুখর কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ। আর এগোবার সাহস পেলাম না। বঙ্গভবনেই ফিরে গেলাম।

আমি বঙ্গভবন চত্বরে ঢুকে সোজা অফিসে চলে আসি। লে. কর্নেল আতিক গাড়ি-বারান্দায় আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এরই মধ্যে তিনি প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) দল ও পুলিশকে সতর্ক করে

দিয়েছেন এবং সম্ভাব্য সব ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন। পিজিআর বাহিনী এরই মধ্যে বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে তাদের অবস্থান নিতে শুরু করে দিয়েছে। আমি নিজে ব্রিফিংয়ের জন্য পিজিআরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ও পুলিশ দলের অধিনায়ককে ডেকে নিলাম। তখন রাত প্রায় ১১টা। বঙ্গভবনের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারদিকে চিৎকার ও স্লোগান শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার মনে হলো, বঙ্গভবন আক্রান্ত হতে পারে। যদিও সবাই জানে, প্রেসিডেন্ট বঙ্গভবনে থাকেন না। তবু এ ধরনের পরিস্থিতির সুযোগ দুর্বৃত্ত শ্রেণী নিতে পারে। লুট করা এবং হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা দখল করাই তাদের লক্ষ্য। অফিসে বসতেই পুলিশ কন্ট্রোল ওয়্যারলেস মারফত নানা জায়গায় সংঘটিত সহিংস ঘটনার খবর পেতে থাকি। ঢাকার অধিবাসীরা যেন সব রাস্তায় নেমে এসেছে। এরই মধ্যে শুনলাম, মন্ত্রী আবুল হাসনাতের শ্বশুরের বাসা, মন্ত্রী রুহুল আমিন হাওলাদার, নাজিউর রহমান মঞ্জু ও অন্য কয়েকজনের বাসায় হামলা হয়েছে। এসব খবরে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের খবরে আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি ভেঙে পড়তে যাচ্ছে এবং দ্রুত সামলানোর ব্যবস্থা করতে না পারলে হয়তো সহায়সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রথমেই সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দীন খানকে টেলিফোন করি। আমি শহরের পরিস্থিতি ও আমার আশঙ্কার কথা তাঁকে বললাম। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ পুলিশ ও বিডিআর বাহিনীর সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। উত্তেজিত জনতা কয়েক জায়গায় লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করতে শুরু করেছে। আমার ধারণা, নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে পরিস্থিতির আরও দ্রুত অবনতি ঘটবে। আমি তাঁকে আরও বললাম, এমন পরিস্থিতি সামলাতে তাঁকেই কিছু বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়া জনতাকে শান্ত করা সম্ভব নয়। তিনি যদি সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা দিতে পারেন, তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা তাঁর কথা শুনবেন ও সহযোগিতা করবেন। আমি তাঁকে পুনরায় সেনা মোতায়েনের জন্য অনুরোধ করি। তিনি সম্মত হয়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সাহায্যের জন্য পুনরায় সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন। ঘটনাক্রমে, ওই দিন বিকেলের দিকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর মোতায়েন করা দলগুলোকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। সেনাপ্রধান পুলিশ ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য

তখনই সিজিএস মেজর জেনারেল আবদুস সালামকে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে পাঠাবেন বলে আমাকে জানালেন।

পুলিশ কন্ট্রোলের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে আমি মিনিটে মিনিটে পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পাচ্ছিলাম। সামগ্রিক চিত্রটা ছিল ভয়াবহ রকমের অরাজক ও বিশৃঙ্খলাময়। হাজার হাজার লোক রাস্তায়। কিছু ঘরবাড়ি, দোকানপাট হামলা ও ভাঙচুরের শিকার হয়। ট্রাক ও মোটরসাইকেলে করে রাজনৈতিক কর্মীরা ঘুরতে থাকেন এবং খুঁজতে থাকেন মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির নেতাদের। পুলিশের এক রিপোর্ট থেকে আভাস পাওয়া গেল, প্রেসিডেন্ট ও তাঁর মন্ত্রীরা যাতে বিমানে পালাতে না পারেন, তা নিশ্চিত করার জন্য রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ডিএমপির পুলিশ কমিশনার শাহজাহানকে টেলিফোন করি। তিনিও ভয়াবহ সব খবরই জানিয়ে আমাকে আরও বললেন, সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়া কিছুই করা যাবে না। পরিস্থিতি দ্রুত মারাত্মক অবস্থার দিকে মোড় নিচ্ছে। তিনিও আমাকে সেনাবাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। সেনাবাহিনী আবারও মোতায়েন করা হচ্ছে এবং শিগগিরই তারা অবস্থান নিতে যাচ্ছে বলে আমি তাঁকে আশ্বস্ত করি। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ই সিজিএস জেনারেল সালাম পুলিশ কন্ট্রোল রুমে গিয়ে পৌছান। আমি পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সঙ্গেও কথা বললাম। স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য সম্ভাব্য কী কী করা যায়, তা নিয়েও কতক্ষণ আলোচনা করলাম। জানালেন, ক্যান্টনমেন্ট থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত আসার পথে তিনি যা দেখেছেন, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। আমি বললাম, যেভাবেই হোক জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য আমাদের কিছু একটা করতে হবে। তিনি আমার সঙ্গে একমত হন এবং ভোর হওয়ার আগেই দ্রুত কিছু একটা করার ওপর জোর দেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে আমাকে বললেন, দিনের আলোয় রাজপথে জনতার সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি তাদের উত্তেজনাও বাড়বে এবং বাড়বে তাদের ধ্বংসাত্মক প্রবণতাও। আমাকে অনুরোধের সুরে তিনি বললেন, 'এসব বন্ধ করতে সত্বর কিছু একটা করুন।'

লক্ষ করছিলাম, যতই সময় যাচ্ছে, উৎসবমুখর জনতা ততই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছে। আমি আরও চিন্তিত হয়ে পড়লাম এ কথা ভেবে যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রাজনৈতিক নেতাদের হাত থেকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজে প্ররোচনাদাতা শ্রেণীর হাতে চলে যায়। রাজনৈতিক কর্মীরা দুষ্কৃতকারীদের হাতের পুতুল হয়ে যায়। সুযোগসন্ধানী, দাঙ্গা সৃষ্টিকারী ও লুটেরাদের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। বিশৃঙ্খলা

ও নৈরাজ্য শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। জেনারেল সালামের কথা 'সকাল হওয়ার আগেই কিছু একটা করতে হবে' আমার বারবার মনে হচ্ছিল। দিনের বেলায় যে আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। এদিকে উচ্চস্তরের বেসামরিক কর্মকর্তা থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের কাছ থেকে আমি একের পর এক টেলিফোন পেতে শুরু করি। বহু ঘটনার কথা তাঁরা আমাকে জানান এবং সাহায্য কামনা করেন। এক সচিব আমার কাছে জানতে চান, সরকারি প্রশাসন কাদের নিয়ন্ত্রণে এবং কারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে আছেন? তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেননি। কেউ কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রসচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রমুখের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আতঙ্কগ্রস্ত ও চরমভাবে ভীতসন্ত্রস্ত। সম্ভবত, কেউই বাসায় ছিলেন না। কেউ কেউ এমনও প্রশ্ন করেন, প্রেসিডেন্ট এরই মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন কি না এবং কে ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন! রাত ১০টার টিভি সংবাদের মাঝখানে হঠাৎ প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর নেতা-কর্মী উচ্ছৃঙ্খল ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। সম্মিলিত বিরোধী জোটগুলোর জন্য এটা ছিল একটা শুভ সংবাদ বা বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা। কেউ সম্ভবত ভাবতেও পারেননি, প্রেসিডেন্ট এরশাদ এত তাড়াতাড়ি পদত্যাগ করবেন। তাঁর তরফ থেকে আরও কঠোর পদক্ষেপ তাঁরা আশা করছিলেন। কিন্তু তেমন কিছু হলো না। তবে এ-ও ঠিক, কারও হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ইঙ্গিত ছাড়া তাঁর পদত্যাগের ঘোষণায় নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা ও আশঙ্কার জন্ম দেয়। সবাই উৎসবমুখর হয় ঠিকই, কিন্তু প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হতে পারে না। টিভির খবরে কেবল বলা হয়, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করেছেন। খবরে বলা হয়নি যে তিনি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অনেকে ধরে নেয়, প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করে সম্ভবত দেশ ত্যাগ করেছেন এবং অন্য কেউ ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। বিরোধী নেতাদের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। সুতরাং, তাঁদের কাছে যখন এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি পৌঁছাল, তখন এমনটা ভাবা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না যে এটাও এরশাদের আরেকটা চাল কিংবা অন্য কেউ ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছেন। ওই সময় এ ধরনের আশঙ্কা বাতিল করারও সুযোগ ছিল না।

সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করার ৯০ দিনের মধ্যে একজন নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর দায়িত্ব

পালন করবেন। অতএব ধরেই নেওয়া হলো, ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদই প্রেসিডেন্ট হবেন। কিন্তু সম্মিলিত বিরোধী জোটগুলো তাঁকে বা তাঁর দলের কাউকে যে গ্রহণ করবে না, সেটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং, আনন্দ প্রকাশের পাশাপাশি সহিংসতার মাধ্যমে শক্তি প্রদর্শন করে এরশাদ বা জাতীয় পার্টির সম্ভাব্য ক্ষমতা গ্রহণকারীদের সংযত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছিল। হঠাৎ করেই এ ধরনের একটা ঘোষণা দেশে ক্ষমতার লড়াই, অন্তর্কলহ এবং সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজক অবস্থা যে সৃষ্টি করতে পারে, তা বিবেচনা না করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তাঁর পরামর্শদাতারা নিঃসন্দেহে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন।

শান্তিশৃঙ্খলাগত পরিস্থিতির অবনতি রোধের চেষ্টা

বলা বাহুল্য, রাস্তার উৎফুল্ল জনতাকে শান্ত করা এক অসম্ভব কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় শক্তি প্রয়োগের যেকোনো উদ্যোগ আরও মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করবে বলেই আমার মনে হলো। এ-ও মনে হলো, এ সময় দুই প্রধান জোটের দুই নেত্রী, অর্থাৎ শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন বলে বিবৃতি প্রচার করেন, উৎফুল্ল জনতা ও রাজনৈতিক কর্মীরা তা হলে আশ্বস্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন, তাঁদের জমা হওয়া ক্রোধ প্রশমিত হবে। তাঁদের আবেদন টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারলে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হবে এবং অবধারিতভাবে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এসব কিছু ভেবেই আমি প্রথমে প্রেসিডেন্টের তথ্যসচিব তোয়াব খানকে টেলিফোন করি এবং ভাগ্যক্রমে একবারের চেষ্টায়ই তাঁকে পেয়ে যাই। আমি আমার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে তাঁকে রেডিও ও টিভি স্টেশন চালু করার অনুকূলে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করি। তিনি আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। তবে এ কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মাঝরাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সংগ্রহ করা সহজ বা নিরাপদ হবে না। আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তাঁদের আনা-নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর গাড়ি ও পাহারার ব্যবস্থা করে দেব। তিনি জানালেন, এক্ষুনি তিনি টেলিফোন করে রেডিও ও টিভি কর্মকর্তাদের এ কথা জানাবেন। এবার আমি সেনাবাহিনী প্রধানকে টেলিফোন করি। পরিস্থিতি সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে আমার সঙ্গে সিজিএস ও পুলিশ কমিশনারের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে, সে কথা তাঁকে জানাই। রাস্তার বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য দুই

নেত্রীর রেডিও ও টিভিতে আবেদন প্রচার করার কথা বললাম। তাঁকে দুই জোটের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগ যে তাঁরা গ্রহণ করেছেন, সে কথা জানিয়ে সবাইকে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন প্রচারের অনুকূলে ব্যবস্থা গ্রহণ করারও অনুরোধ করলাম। আরও বললাম, এমন পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনীকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাঁকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও সম্মিলিত বিরোধী দলের নেতাদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে একজন মধ্যস্থতাকারী বা সমন্বয়কারীর ভূমিকা গ্রহণ করার অনুরোধ জানাই। আমি তাঁকে এ-ও জানাই, রেডিও ও টিভি কর্তৃপক্ষকে এরই মধ্যে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। আবেদনমূলক ভাষণ প্রচারের জন্য তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেও বললেন, এর জন্য প্রেসিডেন্টের সম্মতি নেওয়া দরকার। আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তখনই কথা বলে অনুমতি নেওয়ার আশ্বাস দিলাম এবং অনুরোধ করলাম, তিনি এরই মধ্যে যেন তাঁর পক্ষ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কাজ শুরু করে দেন। তিনি আমার কথায় সম্মত হন এবং আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন, আমি যেন তাড়াতাড়ি এসব কিছু নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলি।

সেনা প্রধানের সঙ্গে আলোচনা শেষ করেই লাল টেলিফোনে সেনাভবনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁর বাসভবনের দুটি টেলিফোনের কোনোটি থেকেই কোনো উত্তর না পেয়ে এডিসিকে টেলিফোন করলে তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট ভেতরের রুমে বসে আছেন। কোনো টেলিফোন ধরছেন না। তবে ভাইস প্রেসিডেন্ট পাশের ড্রয়িংরুমে আছেন, আমি চাইলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি।

এডিসি এবার মওদুদ আহমদকে টেলিফোন সংযোগ দিলে আমি শহরের পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে রেডিও-টেলিভিশনে দুই নেত্রীর বক্তৃতা প্রচারের ব্যাপারে তাঁর কাছে প্রস্তাব রাখি। আমি জোর দিয়ে তাঁকে বলি, সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। জনগণকে শান্ত থাকার ব্যাপারে বিরোধী দুই নেত্রীর আবেদন প্রচার করা ছাড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সহিংসতা রোধ করার কোনো বিকল্প নেই। যত তাড়াতাড়ি এর আয়োজন করা যায়, ততই মঙ্গল। আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে তাঁর সম্মতি নেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাই। তিনি আমার উদ্যোগকে সমর্থন করে এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। আমি আগ্রহের সঙ্গে টেলিফোনে তাঁর উত্তরের অপেক্ষায় থাকি। এরই মধ্যে তোয়াব খান আমাকে জানান, তিনি রেডিও টেলিভিশনের ক্যামেরা ক্রুসহ কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং কয়েক

ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে যাবেন। তবে তাঁদের কয়েকজনকে বাসা থেকে আনার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। কেননা, তাঁরা বেশ দূরে থাকেন। তাঁদের ব্যক্তিগত কোনো যানবাহন নেই। তা ছাড়া এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা যাতায়াত করতেও ভয় পাচ্ছেন। আমি আবার তাঁকে আশ্বাস দিই, তাঁরা এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর যানবাহনের সুযোগ পাবেন। আমি মওদুদ আহমদের টেলিফোনের জন্য প্রায় ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর আবার তাঁকে টেলিফোন করি। তিনি জানালেন, প্রেসিডেন্টের কাছে তিনি আমার দেওয়া প্রস্তাব ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে হ্যাঁ-না কিছুই বলেননি। কথাটা শোনার পর আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। প্রেসিডেন্টের সম্মতি ছাড়া সেনা প্রধান এক পা-ও ফেলতে পারবেন না। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আবার কথা বলার জন্য আমি ভাইস প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করি। তিনি এবার আমাকে জানান, প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিসকক্ষে ফিরে এসেছেন। আমি যেন নিজেই এবার তাঁর সঙ্গে সরাসরি এ ব্যাপারে কথা বলি। এডিসি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাকে টেলিফোন সংযোগ করিয়ে দেন। তিনি আমার সঙ্গে স্বাভাবিক শান্তস্বরে কথা বলতে শুরু করেন। পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁর সঙ্গে এটাই আমার প্রথম টেলিফোন আলাপ। কীভাবে কথা শুরু করব, তা নিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থা আমার না বোঝার কথা নয়। তবে সময় নষ্ট না করে আমি সোজা মূল বিষয় নিয়েই কথা শুরু করি। বলি, তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। তবে যেভাবে তা টিভিতে ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে করে লোকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা শহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে গেছে। চলে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং সকাল বেলা আরও মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আমি ব্যাখ্যা করে বলি, সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা ভেবেছেন, তিনি পদত্যাগ করেছেন এবং কারও কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। কোনো উত্তরাধিকারের নাম না বলায় নানা ধরনের গুজব রটছে, হাজার হাজার লোক রাস্তায় নেমে এসেছে এবং বহু জায়গায় সহিংস ঘটনাও ঘটছে। সময় যত যাচ্ছে, ততই সহিংসতা বাড়ছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে কিছু না বলা হলে পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে যাবে। আমি আরও বললাম, জোটের নেতাদের মুখ থেকে মানুষ যদি শোনে যে তাঁরা পদত্যাগ মেনে নিয়েছেন এবং সবাইকে তারা শান্ত থাকার আহ্বান জানান, তাহলে পরিস্থিতি সহজেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমি এ কথার ভেতর দিয়ে কী বোঝাতে চাই, সে কথা তিনি জানতে চান। তখন

রেডিও ও টিভিতে দুই নেত্রীর ভাষণ প্রচারের কথা বলি। তাঁকে এ-ও বলি, এ ব্যবস্থা ছাড়া রাস্তার বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

প্রেসিডেন্ট বেশ ধৈর্যসহকারে আমার কথা শুনলেন। আমি তখন কয়েকজন মন্ত্রী, এমপি ও জাতীয় পার্টির নেতাদের বাড়ির ওপর হামলাসংক্রান্ত কিছু ঘটনার বিবরণ দিই। এত কিছু শোনার পরও তিনি মূল বিষয় অর্থাৎ দুই নেত্রীর ভাষণ প্রচারে সম্মত হতে দ্বিধা করছিলেন। তাঁকে বললাম, আপনার সঙ্গে কথা বলার আগে আমি সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তিনি আপনার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি সম্মতি দিলেই সেনাপ্রধান জোটের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করবেন। রেডিও ও টিভি স্টেশনকে সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে তারা নির্দেশ পাওয়ামাত্র কাজে নেমে যেতে প্রস্তুত আছে।

শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মত হলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে সম্মত করাতে প্রায় ১০ মিনিট সময় লেগে যায়। সেনাপ্রধানকে তিনি নিজেই নির্দেশ দেবেন কি না জানতে চাইলাম। বললেন, তাঁর সঙ্গে তিনি নিজেই কথা বলবেন। আমি তখনই টেলিফোনে সেনাপ্রধানকে প্রেসিডেন্টের সম্মতির কথা বলি।

এদিকে সহিংস সমাবেশসহ ঢাকার রাস্তায় বিক্ষুব্ধ জনতার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী, রাস্তায় জনতার সংখ্যা কিংবা তাদের বিক্ষোভের মাত্রা হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। এখন আমার প্রধান লক্ষ্য হলো, কীভাবে সেনাভবনে পৌঁছাব। মনে হয়েছিল, ওই সময়ে সেনাভবনে শারীরিকভাবে আমার উপস্থিত থাকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে আমার মনে প্রবলভাবে এই সন্দেহও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল যে, এরশাদ শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত আবার পাল্টে ফেলতে পারেন! এ রকম সন্দেহ থেকে আমি ভেবেছি, আমার উপস্থিতি হয়তো তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টানো থেকে বিরত করবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাঁরা জানেন, তাঁরা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে তাঁর চারপাশে যখন যাঁরা থাকেন, বিশেষ কোনো মুহূর্তে তাঁরাই নীতিনির্ধারণে তাঁকে প্রভাবিত করে ফেলেন। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের অসৎ প্রভাবে এরশাদ যে জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও পরিবর্তন করেছেন, এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে।

১ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে করা আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো আমার মনে তখনো ভাসছিল। সুনির্দিষ্টভাবেই তখন বলেছিলেন, তিনি পদত্যাগ করবেন এবং কোনো নির্বাচনে অংশ নেবেন না। অথচ সেই তিনি ৩

ডিসেম্বরে তাঁর মত পরিবর্তন করে ফেললেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন, তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অটল থাকবেন। এখন আবার হঠাৎ করেই ক্ষমতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত যে তিনি পাল্টাবেন না, তার কী নিশ্চয়তা আছে! তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরদের কেউ কেউ অত্যন্ত কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত কীভাবে বদল করতে হয়, তার উপায় ও কৌশল তাঁরা জানেন। তাঁরা যদি দ্রুত তাঁর চারপাশে জমায়েত হতে পারেন, তাহলে তাঁর গ্রহণ করা এই সর্বশেষ সিদ্ধান্তের পরিবর্তনও অনিবার্য। তিনি টিভি-রেডিও মারফত দুই নেত্রীর বক্তব্য প্রচার করার ব্যাপারটাও বন্ধ করে দিতে পারেন। এসব চিন্তাই ওই সময় আমার মনে তোলপাড় করে চলেছিল। ফলে প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঘনিষ্ঠজনেরা তাঁর ওপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার আগেই আমি সেনাভবনে পৌঁছাতে চাইছিলাম। সহকারী সামরিক সচিবকে প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের একটি জিপ ও সেনাবাহিনীর একটি সহযাত্রী রক্ষীদলের ব্যবস্থা করতে বলি। তিনি পরিস্থিতির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখছিলেন এবং সর্বক্ষণ পুলিশের সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি জানান, বঙ্গভবন থেকে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত যাওয়ার পথটি এখন পর্যন্ত নিরাপদ নয়। কিন্তু তার পরও সেনাভবনে যাওয়ার জন্য আমার অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে বঙ্গভবনের অফিস ছেড়ে আমি অফিসের কাছাকাছি আমার বাসায় গেলাম। দ্রুত রাতের খাবার সেরে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরে নিলাম। আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা জেগেই ছিল। তারা রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত। বঙ্গভবনের চারদিকে তখনো জনতার চিৎকারধ্বনি ও পটকা ইত্যাদি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বহু বন্ধু, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী টেলিফোনের মাধ্যমে নানা ধরনের গুজব ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা বলে আমার স্ত্রীকে ইতিমধ্যে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলেছিল। কেউ কেউ আমার পরিবারকে বঙ্গভবন ছেড়ে চলে যাওয়ারও পরামর্শ দেয়। এ পরিস্থিতিতে সেনাভবনে আমার উপস্থিতির গুরুত্বটা আরও গভীরভাবে অনুভব করছিলাম। নিম্ন ও মধ্যম স্তরের অফিসাররা এখনো সেখানে আছেন। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর একটি কোম্পানি এবং প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বাহিনীর (পিএসএফ) শক্তিশালী দলও রয়েছে। ফলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে সেখানে আমার উপস্থিতির রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব। আগের সেই আশঙ্কাটা আমাকে তখনো পর্যন্ত স্থির থাকতে দিচ্ছিল না যে, প্রেসিডেন্ট এরশাদ আবারও তাঁর মত পাল্টাতে পারেন। আমার আর দেরি করা উচিত নয় ভেবে আমি দ্রুত রওনা হয়ে গেলাম।

সেনাভবনে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হলাম

রাত তখন ১টা ৩৫ মিনিট (৫ ডিসেম্বর)। আমি সেনাভবনের উদ্দেশে রওনা হলাম। আমার স্ত্রী গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। বুঝতে পারছিলাম, তিনি ভীতি ও আতঙ্কের মধ্যে আছেন। বুঝতে পারছিলাম, আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ। তবু রওনা হলাম এই ভাবনা থেকে যে, দেশকে আরও গভীর কোনো সংকটে ফেলতে পারে এমন বিপজ্জনক পদক্ষেপ কেউ নিলে যেন তাতে বাধা দেওয়া যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গিই আমার মনে প্রচুর সাহস ও শক্তি এনে দেয়। আমি জিপে করে রওনা হই, অন্য একটা পিকআপ জিপে পিজিআর বাহিনীর একটি সশস্ত্র দল আমাকে অনুসরণ করে। দৈনিক বাংলা অফিসের সামনে ক্রসিংয়ে পৌঁছে আরও ছোটখাটো সমাবেশের সামনাসামনি হতে শুরু করি। কোনো কোনো জায়গায় জনসমাবেশ ছিল হালকা ধরনের, আবার কোথাও বড় ধরনের। কিছু কিছু জায়গায় আমাদের থামতে হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর যানবাহন দেখে তারা ছেড়ে দেয়। কিন্তু শেরাটন হোটেল পার হতেই দেখি রাস্তাজুড়েই মানুষ। তাদের বেশ উচ্ছৃঙ্খল বলে মনে হলো। রাস্তায় ইট ও ভাঙা কাচের টুকরো দেখতে পেলাম।

ফার্মগেট ওভার ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছে জনসমাবেশের আকার আর হাবভাব দেখে সহিংস হামলার আশঙ্কা করলাম। আরও স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলাম; যেসব স্থানে বাধা ছিল কিংবা থামার সংকেত ছিল, কেবল সেখানেই থামছিলাম। ড্রাইভার ছাড়া আমার জিপে দুজন সশস্ত্র পিজিআর সেপাই এবং একজন ওয়্যারলেস অপারেটর। ওভার ব্রিজের কাছে এসে দেখি, একটা বাঁশ ফেলে রেখে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে মাঝ বরাবর সামান্য একটুখানি ফাঁকা ছিল, যা দিয়ে একটা জিপ সহজেই চলে যেতে পারে। আমি কিছু বলার আগেই ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে বাঁশের বাধা স্পর্শ না করে জায়গাটি পার হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ করে জোরে একটা আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কাচ ভাঙার শব্দ শুনতে পাই। তাকিয়ে দেখি, উইন্ডো স্ক্রিন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। একটা বড়সড় আকারের ইটের টুকরো গাড়িটির পেছনে বসা সেপাইকে আঘাত করেছে। তবে সে তেমনভাবে আহত হয়নি। ব্যাপারটা বিস্ময়করই ঠেকল। কেননা, ইটটা আমার ও ড্রাইভারের মাঝখান দিয়ে আমাদের স্পর্শ না করেই চলে গেছে। নার্ভাস হয়ে ড্রাইভার গাড়ির গতি বাড়িয়ে এই বিপদ ডেকে এনেছে। ইটটা যদি আমাকে বা ড্রাইভাকে আঘাত করত, তাহলে মারাত্মক ধরনের বিপদ ঘটতে পারত।

ওই রকম বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে সামরিক পোশাক পরা ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো দুর্ঘটনা, সংঘাত কিংবা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে আরও বেশি সহিংস প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারত। বাস্তবতা হলো, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সামান্য উসকানি কিংবা অনিচ্ছাকৃত কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনাও সাধারণত মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। আমি আন্দোলনের এদিকটা সম্পর্কে সব সময়ই সজাগ ছিলাম এবং যেকোনো ধরনের উসকানিমূলক ঘটনা পরিহার করার ব্যাপারে সতর্কতা রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছি। আমার জিপ আক্রমণের ঘটনা আমাকে একটুও বিচলিত করেনি। একটা বড় ধরনের বিপদ থেকে আল্লাহর মেহেরবানিতেই রক্ষা পেয়ে গেলাম।

সেনাভবনে পৌঁছে আমার আরও আশ্বস্ত হওয়ার মতো কারণ ঘটে। গিয়ে দেখি, সেনাভবনের প্রধান প্রবেশপথে পিজিআর বাহিনী কড়া পাহারায় নিয়োজিত। ভেতর থেকে গেট বন্ধ, কর্তব্যরত অফিসার এগিয়ে এসে আমার প্রবেশের ব্যবস্থা করলেন। মূল ভবনের কাছে যেতেই প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বাহিনীর (পিএসএফ) কর্তব্যরত অফিসাররা ছুটে আসেন। ওয়্যারলেসের মাধ্যমে এরই মধ্যে তাঁরা আমার ওপর আক্রমণের কথা জেনে গেছেন। কয়েকজন এসে আমাকে পিএসএফ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে বসান এবং আমার শরীর ও কমব্যাট জ্যাকেট থেকে কাচের টুকরো অপসারণে সাহায্য করেন। সে সময় প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পিএসএফের উপপরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল বাসার ও এডিসি ক্যাপ্টেন কামাল মূল ভবনে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। সেনাপ্রধান ও সিজিএস মাত্র আধা ঘণ্টা আগে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। ক্যাপ্টেন কামাল আমাকে জানান, শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য রেডিও-টিভিতে প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য প্রেসিডেন্ট সেনাপ্রধানকে নির্দেশ দিয়েছেন। এটা ছিল আমার জন্য একটা উৎসাহব্যঞ্জক খবর। প্রেসিডেন্ট তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেননি এবং ভাষণ প্রচারের ব্যবস্থা চলছে—এ কথা শুনে আমি খুবই আশ্বস্ত হই। ঘণ্টা খানেক আগে টেলিফোনে যখন আমি প্রথম এই প্রস্তাবটি তাঁর সামনে উত্থাপন করি, তখনো আমার কাছে অচিন্ত্যনীয় ছিল যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথা তাঁর দুই চরম বিরোধী নেত্রীর মুখ থেকে রেডিও ও টিভির মাধ্যমে প্রচার করতে রাজি হবেন।

অন্যদিকে তখন সেনাভবনের মূল ভবনের বাইরে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের চোখমুখ ও মনজুড়ে

সতর্কতার পাশাপাশি এক ভুতুড়ে আতঙ্কের গভীর ছাপ। পিএসএফ ও পিজিআরের কর্মকর্তাদের বাইরে থেকে দেখে স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁরা যে একধরনের অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন, সেটা তাঁদের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তাঁরা প্রেসিডেন্টের খুব কাছে অবস্থান করলেও কী ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে কমই জানতেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কথা বলি এবং উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য কী করা হচ্ছে, সে কথা ব্যাখ্যা করি। তাঁরা চাইছিলেন, কেউ তাঁদের আশ্বস্ত করুক এবং তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব, কর্মকাণ্ড ও অবদানের বিষয়টি অনুভব করুক। আমি তাঁদের এই বলে আশ্বস্ত করি, সমগ্র জাতি ও জনগণের স্বার্থে যা মঙ্গলজনক, তেমন কিছু করার জন্যই পুরো সেনাবাহিনী ঐক্যবদ্ধ। তাঁদের সবাইকেই তাই শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড বজায় রাখতে হবে এবং কোনো ধরনের হঠকারী ও মাথা গরম করা তৎপরতা পরিহার করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময় প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পিএসএফ ও পিজিআরের কর্মকর্তারা কিছুটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের শিকার হয়ে পড়েন। ওই সময় প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার জন্য সেনাভবনের বাইরে আলাদা আরেকটি সেনাদল মোতায়েন করা হলে এ রকমের একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, পিজিআর ও পিএসএফকে মোকাবিলা করার জন্যই যেন তাদের মোতায়েন করা হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য ভাবেন, তাঁরা প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুগত থাকবেন। এমন পরিস্থিতিতে কে কার প্রতি অনুগত কিংবা কে কার পক্ষে বা বিপক্ষে, সেটা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। সবার মধ্যেই অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রবণতা ও সুযোগসন্ধানী মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। আমার উপস্থিতিতে সব সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হয়ে যায় এবং সবার মনে আস্থা ফিরে এল বলে মনে হলো।

প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের মুখোমুখি

এডিসি ক্যাপ্টেন কামাল আমাকে জানান, বঙ্গভবন থেকে আমার যাত্রা শুরু করা থেকে পথে আমার ওপর আক্রমণের সব ঘটনাই তিনি প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ডাইনিং হলে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি যখন সেখানে প্রবেশ করি, তখন আমার জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। মন্ত্রিসভার প্রায় অর্ধেক সদস্য টেবিল ঘিরে সব কটি আসন দখল করে বসে আছেন। তখন রাত প্রায় দুটো। প্রেসিডেন্ট টেবিলের একেবারে উত্তর পাশে প্রধান চেয়ারে বসা, তাঁর বাঁয়ে বসে ছিলেন বেগম রওশন এরশাদ,

উপপ্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও নাজিউর রহমান মঞ্জুর, বেগম এরশাদের ভগ্নিপতি মোস্তাফিজুর রহমান এবং এক তরুণ, সম্ভবত মোস্তাফিজের ছেলে। ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ, প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বসে ছিলেন টেবিলের অন্য পাশে। পশ্চিম পাশ থেকে আমি প্রেসিডেন্টের কাছে যেতেই সেখানে নেমে এল পিনপতন নীরবতা। আমি আহত কি না এবং চলমান সামগ্রিক পরিস্থিতি কেমন, সবাই এ কথা জানতে চান। ফার্মগেটে জনতার যে বেশ বড় সমাবেশ এবং পুরো রাস্তা তাদের দখলে থাকার কথা তাঁদের জানালাম। আমি এ কথাও জানালাম, বিমানবন্দর-সংশ্লিষ্ট মূল রাস্তায় ট্রাক ও মোটরসাইকেলে করে রাজনৈতিক কর্মীরা পাহারা দিচ্ছেন। তাঁরা মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির নেতাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি যে চিত্র তুলে ধরলাম, তা অতিরঞ্জিত ছিল না কিংবা পরিস্থিতির গুরুত্বকে খাটো করে উপস্থাপনেরও প্রয়াস তাতে ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল, প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তাঁর মন্ত্রীরা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা পাল্টানোর কোনো চেষ্টা যেন কেউ না করেন। তাঁরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, কেউ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন না কিংবা আলোচনায় কোনো আগ্রহও দেখালেন না। বুঝতে অসুবিধা হলো না, তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত।

আমার কথা শোনার পর প্রেসিডেন্ট উঠে ভেতরে চলে গেলেন। তাঁর পেছন পেছন রওশন এরশাদও গেলেন। বাদবাকি সবাই ডাইনিং হলেই বসে থাকলেন। আমিও এডিসির কক্ষে গিয়ে টেলিফোন করতে বসলাম। মিনিট কয়েক পর প্রেসিডেন্ট আমাকে ডাকলেন। গিয়ে দেখি, তিনি স্ত্রীকে নিয়ে করিডোরে দাঁড়িয়ে। মন্ত্রীদের নিয়ে কী করবেন এবং তখন তাঁদের সেনাভবন ত্যাগ করা উচিত কি না, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, তাঁদের চলে যাওয়াই উচিত। আরও বললাম, ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যাওয়া তাঁদের জন্য নিরাপদ নয়, তবে কাছাকাছি কোথাও যেতে চাইলে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। তিনি এতে সম্মত হলেন। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁদের সবাই বিদায় নিতে শুরু করলেন। নিজেদের ইচ্ছামাফিক কেউ ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে, কেউ বা সংলগ্ন এলাকায় আর কেউ কেউ বনানী বা গুলশান এলাকায় সেনাবাহিনীর গাড়িতে চেপে চলে গেলেন। আমি এরপর রেডিও ও টেলিভিশনে জোটের নেত্রীদের ভাষণ প্রচারের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য এডিসির অফিসে গিয়ে বসলাম। সেনা

প্রধানের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করলাম। আমি সেনাভবনে পৌঁছেছি এবং সেখানেই থেকে যাচ্ছি শুনে তিনি খুশি হলেন। ফার্মগেটের কাছে আমার ওপর আক্রমণের খবর তিনি শুনেছেন। যতক্ষণ আমি সেনাভবনে আছি, ততক্ষণ কোনো অঘটন ঘটবে না বলে তিনি আস্থা প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহ দিলেন। আমাকে জানালেন, সবকিছুই ভালোভাবে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি উভয় দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দুই নেত্রীই রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিতে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার আবেদন জানাতে সম্মত হয়েছেন। তাঁরা সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়েছেন। শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণ রেকর্ড করার জন্য ইতিমধ্যে সেনা অফিসারদের পাঠানো হয়েছে।

আমাদের আলোচনা শেষ করার আগে সেনাপ্রধান আমাকে সেনা গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক (ডিএমআই) ব্রিগেডিয়ার আহসান উল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ করলেন। তাঁকেই রেডিও ও টিভির জন্য শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আহসান উল্লাহ আমাকে জানান, আওয়ামী লীগের প্রধান ভাষণ রেকর্ড করতে সম্মত হয়েছেন; কিন্তু বিএনপির প্রধানের সঙ্গে তখনো যোগাযোগ করা যায়নি। তাঁকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকায় যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে সকাল ছয়টা নাগাদ তাঁর ভাষণ পাওয়া যাবে বলে বিএনপির নেতারা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন। বোঝা গেল, তাঁরা তখনো সন্দেহমুক্ত নন। বক্তৃতা সংগ্রহ করতে গিয়ে আহসান উল্লাহকে বাস্তব কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আওয়ামী লীগ প্রধানের ভাষণ রেকর্ড করার জন্য যে কর্মকর্তা যান, তাঁকে প্রথমে ফিরে আসতে হয়। ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনে যেখানে শেখ হাসিনা অবস্থান করছিলেন, সেখানে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এই কর্মকর্তাকে ভেতরে ঢুকতে দেননি। রেকর্ড করা ভাষণ পাওয়ার জন্য ওই কর্মকর্তাকে আবারও পাঠানো হয়। এটা স্বাভাবিক, অতীতের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কারণে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভিশন ছাড়া বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলো, বিশেষত বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক মাধ্যম। এ দুই রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত খবর জনতা শুনে থাকে এবং তাদের বক্তব্য বিশ্বাস করে। উভয় নেত্রীর রেকর্ড করা ভাষণ সরাসরি আইএসডি টেলিফোনের মাধ্যমে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার প্রচারকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য আহসান

উল্লাহকে পরামর্শ দিলাম। ভাষণগুলো যদি প্রথমে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার স্থানীয় প্রতিনিধিদের দেওয়া হয় এবং পরে তাঁরা যদি সংশ্লিষ্ট বিদেশি দপ্তরে পাঠান, তাহলে অযথা সময় নষ্ট হবে না। আমাদের জন্য সময় তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যত দ্রুত জনগণ তাঁদের ভাষণ শুনতে পাবে, ততই সুফল পাওয়া যাবে, রাস্তায় লোক কম নামবে।

এদিকে তখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদের অনুগত কোনো মহল থেকেই রেডিও ও টেলিভিশনে দুই নেত্রীর ভাষণ প্রচারের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের প্রচেষ্টা বা বাধার আভাস পাওয়া যায়নি। এর ভেতর দিয়েই ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে প্রথম শুভ লক্ষণ এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদের সুমতির পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওই সময় সেনাভবনে দেশের দুই সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদের নিষ্ক্রিয়তা ও অপ্রত্যাশিত অনুপস্থিতি আমাকে বিস্মিত করে। তাঁরাই ছিলেন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সব বিষয়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ার মূল স্তম্ভ। উভয়েই ছিলেন প্রেসিডেন্টের একান্ত বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন। কিন্তু এমন একটা কঠিন পরিস্থিতিতে যখন সরকারের পতন হতে যাচ্ছে, তখন তাঁদেরকে তাঁর পাশে দেখতে না পাওয়াটা অবিশ্বাস্য ও সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের কোনো পরিকল্পনা করছিলেন, এমন কোনো আভাসও পাওয়া যায়নি। এরশাদের শাসনামলে সরকারের কর্তৃত্বমূলক অবস্থানে থেকে তাঁরা সবচেয়ে শক্তিধর ও প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। এরশাদের পারিবারিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষাই মূলত তাঁদের প্রধান দায়িত্ব ছিল। অবশ্য এ সময় সেনাভবনে তাঁদের অনুপস্থিতি আমার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারটিকে সহজতর করতে সাহায্য করে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আরও ভরসা পাই। ঘটনাক্রমে ওই দিন সেনা সদর দপ্তরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোয় প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঘনিষ্ঠতম অফিসারদের সংখ্যাও কম ছিল। তা ছাড়া যাবতীয় ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল যে এরশাদের পক্ষের শক্তিগুলোর পক্ষে তৎক্ষণাৎ কোনো পরিকল্পনা কার্যকর করাও সম্ভব ছিল না।

ওই সময় সেনাভবনে থাকতেই ক্যান্টনমেন্টের অফিসার শ্রেণীর মধ্যে একধরনের সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তার লক্ষণ টের পাচ্ছিলাম। জল্পনা-কল্পনা, আন্দাজ-অনুমানের ওপর ভিত্তি করে পারস্পরিক দোষারোপমূলক কথা ও নানা ধরনের গুজব শোনা যাচ্ছিল। তখন সেনাবাহিনীর সব ইউনিটকেই সতর্ক রাখা এবং ক্যান্টনমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোয় সেনাদল মোতায়েন

করা হয়েছিল। অবশ্য সেনা প্রধানের আদেশে সেনা সদর দপ্তরের অপারেশন ডিরেক্টরেট সব ধরনের কাজের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছিল, তবু কোনো কোনো কমান্ডারের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ করার অবকাশ ছিল। ফলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস বেড়ে যায় এবং ১৯৭৫-এর নভেম্বরের মতো একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছিল। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের অঘটন ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিন্তু ছিল না। তবে এমন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতিও যথেষ্ট ছিল। সেনাভবনের অভ্যন্তরে সবকিছুই ছিল স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণাধীন। পিএসএফ ও পিজিআরের অফিসাররা কেমন আচরণ করবেন এবং কীভাবে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে, তা নিয়ে আমার মনে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। তাঁরা সবাই তরুণ, বুদ্ধিমান এবং যুদ্ধের বিষয়ে, বিশেষত স্বল্পপরিসরের যুদ্ধে সুপ্রশিক্ষিত। বিশেষ করে, পিএসএফ অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, যা সাধারণ ইউনিটের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি শক্তিশালী ও দক্ষ।

প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কগত একটা ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁদের আনুগত্য গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। কাজেই ওই রকম একটা পরিস্থিতিতে তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে কিংবা আবেগের বশবর্তী হয়েও কেউ কোনো ধরনের দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেন এবং সেই সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফদের খুশি ও সন্তুষ্ট রাখতে সব সময়ই চেষ্টা করতেন। পিএসএফ ও পিজিআরের অফিসাররা সুনির্দিষ্টভাবে অতিরিক্ত কিছু সুযোগ-সুবিধাও পেতেন। কাজেই পেশাগত আনুগত্যের পাশাপাশি প্রেসিডেন্টের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক। তা ছাড়া কোনো বিশেষ মহল প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে দেশের বাইরে পাঠানোর চেষ্টায় পিএসএফ ও পিজিআর বাহিনীর কারও সহায়তা নেওয়ার আশঙ্কাও ছিল। একই সময় অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের চেষ্টাও হতে পারে। কাজেই ওই সময় এ ধরনের বিষয় বিবেচনার মধ্যে আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পিএসএফ ও পিজিআরের অফিসাররা কোনো ধ্বংসাত্মক হঠকারী প্রচেষ্টায় কখনো লিপ্ত হবেন না। উভয় সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন এবং তাঁরা কোনো ব্যক্তি বা মহলের কোনো ধরনের বেআইনি তৎপরতা সমর্থন করবেন না। এরই মধ্যে পিএসএফ ও পিজিআরের কর্মকর্তারা আমার নির্দেশ

মেনে চলছিলেন। তাঁরা কমান্ড চেইন রক্ষা করেছেন এবং সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

রাত সাড়ে তিনটার দিকে আমি একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের খবর শোনার পর থেকে আমার বিশ্রাম বা ঘুম কোনোটাই হয়নি। এডিসি ক্যাপ্টেন কামাল পিএসএফ কন্ট্রোল রুমে আমার শোবার ব্যবস্থা করেন। আমি ড্রয়িংরুমে থাকতে আগ্রহী হই এবং একটা সোফায় ঘুমানোর চেষ্টা করি। ক্যাপ্টেন কামাল বালিশ ও চাদর এনে দিতেই শুয়ে পড়লাম। একটু ঘুম ঘুম ভাব যেই এসেছে, অমনি সামনের দরজায় ডাকাডাকির শব্দ শুনে উঠে পড়ি। বাইরে পা ফেলতেই দেখি, বেগম রওশন এরশাদ বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তিনি উত্তরা থেকে তাঁর বোন মিসেস মমতা ওহাবকে ক্যান্টনমেন্টে আনার জন্য যানবাহন ও রক্ষীদলের ব্যবস্থা করতে আমাকে অনুরোধ জানান। তাঁর বাড়িতে হামলা হওয়ার এবং বিপদের আশঙ্কা করছিলেন। আমি বেগম রওশন এরশাদকে বোঝানোর চেষ্টা করি, যতক্ষণ তিনি বড় ধরনের কোনো সমস্যায় না পড়ছেন, ততক্ষণ তাঁকে সেনাভবনে আনা ঠিক হবে না। তিনি আমার যুক্তি মেনে নেন। আমি আবারও ঘুমাতে চেষ্টা করি, কিন্তু ওই ভবনের বর্তমান প্রভুদের কথাই বারবার আমার মনে আসছিল। একটু দূরে কয়েক রুম পরই দেশের সবচেয়ে শক্তিধর মানুষটি এবং তাঁর স্ত্রী আজ এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। এখানে তাঁরা ১২ বছর কাটিয়েছেন। তাঁরা কি ভেবেছিলেন এমন অবস্থা একদিন মোকাবিলা করতে হবে!

সেনা সদর দপ্তরে কিছুক্ষণ

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুমানোর পর জেগেই সেনাপ্রধানের একটা বার্তা পাই। তিনি তাঁর অফিসে একটা মিটিং ডেকেছেন, আমাকে তাতে যোগ দিতে হবে। দ্রুত নাশতা সেরে সেনাপ্রধানের কক্ষে পৌঁছলাম। নৌবাহিনীর প্রধান রিয়াল অ্যাডমিরাল মুস্তফা, বিমানবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার কমোডর আরেফিন এবং সেনা সদর দপ্তরের সব জেনারেল সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সেনাপ্রধান পুরো ঘটনা সম্পর্কে একটা বক্তব্য দেন, মাঝেমধ্যে অবশ্য আমাকে কিছু কিছু বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে বলেন। উপস্থিত সবাই শান্তিপূর্ণভাবে সংকট সমাধান হতে যাচ্ছে দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। অনেকে বললেন, পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করা হয়েছে। সম্মেলনের মাঝামাঝি সময়ে খবর পেলাম, প্রেসিডেন্ট পুরোনো বিমানবন্দরের

নিকটবর্তী প্রেসিডেন্টের অফিসে যাচ্ছেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি পাশের রুম থেকে এডিসিকে ফোন করি। এডিসি মেজর রাজীব বলেন, প্রেসিডেন্টকে নিরুৎসাহিত করা সত্ত্বেও তিনি অফিসে যাচ্ছেন। এমনকি বেগম রওশন এরশাদসহ পিএসএফের অফিসাররাও এ সময় তাঁর অফিসে যাওয়া যে নিরাপদ নয়, সে কথা বললেও তিনি তা শোনেননি। তাঁরা চাইছিলেন, আমি যেন দ্রুত তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি।

বহুদিন ধরে যে অফিসটি ছিল প্রেসিডেন্ট এরশাদের সব ধরনের কাজের কেন্দ্রবিন্দু ও অতি প্রিয়, সেই জমকালো মহা গুরুত্বপূর্ণ অফিসটিতে শেষবারের মতো যাওয়া যে কতটা গুরুত্ববহ, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। এটাই হবে তাঁর শেষ যাওয়া। বহু মূল্যবান ও সংবেদনশীল কাগজপত্র, দলিল ও সামগ্রী সেখানে রয়েছে। অন্য কেউ ক্ষমতায় বসার আগেই তিনি ওগুলো নিয়ে আসতে চান। সেনাপ্রধান যখন বিষয়টি জানলেন, তিনিও প্রেসিডেন্টকে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে না যেতে অনুরোধ করার জন্য আমাকে পরামর্শ দিলেন। আমি দ্রুত রওনা হই, কিন্তু সেনাভবনের কাছে পৌঁছে প্রেসিডেন্টের অফিসমুখী গাড়িবহরের শেষাংশ দেখতে পাই। আমি তাঁকে অনুসরণ করে পেছনে পেছনে তাঁর অফিসেই ঢুকে পড়ি। তিনি তখন বিভিন্ন ব্যক্তিগত দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত; এডিসি ও কয়েকজন অর্ডারলি তাঁকে সাহায্য করছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আমি আমার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিতে এসেছি। তুমি তো জানো, বহু বছর ধরে এই অফিসে কাজ করেছি, আমার ব্যক্তিগত বহু জিনিস অফিসের জিনিসপত্রের সঙ্গে মিশে গেছে।'

আমি বললাম, আমরা তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাই তাঁর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যান্টনমেন্টের বাসায় চলে যাওয়া উচিত। তাঁকে আশ্বাস দিলাম, সব ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তাঁর কাছে পৌঁছে দেব। প্রায় ৩০ মিনিট পর তিনি বাসায় ফিরে যান। ব্যক্তিগত কাগজপত্র, দলিলাদি সংগ্রহ করা ছাড়াও ওই সময় তাঁর অফিসে যাওয়ার পেছনে অন্য যে বিশেষ কারণ ছিল, আমি সেটা পরের দিন জানতে পারি। ওই সময়ই তাঁর ব্যক্তিগত সচিব চার কোটি আট লাখ ৬৫ হাজার টাকা প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। (অন্য অধ্যায়ে এ-সংক্রান্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে)।

প্রেসিডেন্ট সেনাভবনে ফিরে যাওয়ার পর আমি আবার সেনা সদর দপ্তরে ফিরে যাই। তখনো সেখানে সভা চলছিল। আসলে গল্পগুজব, বিভিন্ন ঘটনার বারবার উল্লেখ এবং কথাবার্তার দীর্ঘসূত্রতা ছাড়া ফলপ্রসূ আলোচনার কিছুই ছিল না, দিনের মধ্যভাগ পর্যন্ত সভা চলে। আগেই আমি চলে যেতে চাই, কিন্তু

সেনা প্রধানের অনুরোধে থাকতে হলো। এর আগে রেডিও ও টেলিভিশনে বিরোধী দুই নেত্রীর বক্তৃতা রেকর্ডিংয়ের জন্য টিভি ও রেডিও ক্রুদের পেয়ে যাই। সকাল থেকেই রেডিও ও টেলিভিশনে সম্প্রচারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং দুই নেত্রী যে ভাষণ দেবেন, সে কথা প্রচার করা হচ্ছিল। দুই নেত্রীর ভাষণ সম্প্রচারের কথা বারবার ঘোষণা হলে যে ঢাকার বাসিন্দারা রাস্তায় না নেমে ঘরে রেডিও বা টিভির সামনে থাকাটাকেই পছন্দ করবে, এ রকম প্রত্যাশা থেকেই এ ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কার্যত আরও যা আশা করেছিলাম, ব্যাপারটা তার চেয়েও বেশি ফলপ্রসূ হয়। বিটিভির পুরোনো জনপ্রিয় অনুষ্ঠানমালা ও সিনেমা প্রচারও বেশ কাজে লাগে। এ ব্যবস্থা রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ সাহায্য করে।

নেত্রীদের ভাষণ শোনার জন্য সারা দেশ যখন আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে, তখন প্রেসিডেন্ট এরশাদের জায়গায় কে আসছেন, তা নিয়ে জোরালো জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। অন্যদিকে সম্মিলিত বিরোধী জোটের নেতারা কাকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করবেন, তা স্থির করতে সমস্যায় পড়ে যান। সেনা সদর দপ্তরে বসে আরও আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম, ব্যাপারটার সুরাহা কীভাবে হয়, সেটা দেখার জন্য। প্রেসিডেন্ট এরশাদকে হটানোর ইস্যু ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই যাঁদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি, সেই রাজনীতিবিদদের জন্য এটা নিঃসন্দেহে একটা কঠিন কাজ। আমি বেলা আড়াইটা নাগাদ সেনাভবনে ফিরে যাই। প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিসকক্ষেই ছিলেন। এডিসি জানালেন, প্রেসিডেন্ট আমাকে কয়েকবার খুঁজেছেন এবং এক্ষুনি আমার তাঁর সঙ্গে দেখা করা উচিত। আমি ঢুকতেই বললেন, ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরের দিন, অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) বিকেল চারটায় প্রেসিডেন্টের দপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে। তখনো আমি জানি না, কে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, বিরোধী দলগুলো শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে মনোনয়ন দিতে সম্মত হয়েছে। তখন প্রধান বিচারপতি ছিলেন সাহাবুদ্দীন আহমদ। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর অবসর গ্রহণের পর, কয়েক মাস আগে তিনি প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এবং পরবর্তী সময়ে বঙ্গভবনে তাঁর স্বল্প যাতায়াতের কথা আমার মনে পড়ল।

প্রেসিডেন্ট যখন পরের দিন বিকেল চারটায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের কথা আমাকে বললেন, তখন আমার মনে বেশ খটকা লাগে, ওই দিনই বিকেলে

বা রাতেই শপথ অনুষ্ঠানটি হচ্ছে না কেন কিংবা পরের দিন সকালেও তো তা হতে পারত! একদম বিকেল চারটায়, অর্থাৎ তখন থেকে ২৪ ঘণ্টারও পরে। এ রকম পরিস্থিতিতে যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে হয়। তা না হলে ক্যু ও কাউন্টার ক্যুর সুযোগ থেকে যায়। যাঁরা এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁরা হয়তো এ দিকটি ধর্তব্যে নেননি। তবে আমি তখন প্রেসিডেন্টকে বললাম, তিনি যখন পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেনই, তখন আর দেরি না করে ওই সন্ধ্যাতেই তো তা হতে পারত। আমি বলেই ফেললাম, বিলম্ব সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং ওই সময়ের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সময়ের গুরুত্ব অনেক। মনে হলো, আমার কথায় তিনি অসন্তুষ্টই হলেন এবং কিছুটা বিরক্তিও দেখালেন। তিনি পরের দিনই শপথ অনুষ্ঠান করতে চান, তবে আমার কথায় অনুষ্ঠানের সময় বিকেল চারটা থেকে বেলা দুটোয় এগিয়ে আনতে সম্মত হলেন। এমন পরামর্শের পেছনে আমার অন্য একটা ভাবনা কাজ করছিল—ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তাঁর অনুসারীদের পুনর্ভাবনা, পুনঃসংগঠিত হওয়া এবং যেকোনো কুপরিকল্পনার সুযোগ করে দিতে পারে। তখনো তিনি প্রেসিডেন্ট এবং সমুদয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। ওই মুহূর্তে তিনি হতাশাগ্রস্ত হলেও বেপরোয়া কর্তৃত্ব খাটানোর সুযোগ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে সময় দেওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আমি নিশ্চিত, বিরোধী জোটগুলোর নেতারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বের এই দিকটি কখনো বিবেচনায় নেননি। আমার এই দুশ্চিন্তা প্রকাশ করার মতো ধারেকাছে কাউকে না পেয়ে আরও অস্থির লাগছিল। আমার আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরশাদের শেষ কয়েক ঘণ্টা

ক্ষমতায় থাকার শেষ চেষ্টা

নতুন ভাইস প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সময় সম্পর্কে আলোচনা শেষ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা শুরু করলেন। তাঁকে দারুণভাবে শঙ্কিত, পরিশ্রান্ত ও বিপর্যস্ত মনে হচ্ছিল। তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছিলাম। বাহ্যিকভাবে তিনি শান্তভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলেও তাঁর মনের অবস্থা বোঝা যাচ্ছিল। শিগগিরই তাঁকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর পর্বে প্রবেশ করতে হচ্ছে। তাঁর জন্য ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে, তা তিনি জানতেন। আর মাত্র ২৪ ঘণ্টা বাকি (এর মধ্যে আমি আবার দুই ঘণ্টা সময় কমিয়ে দিয়েছি)। এই সময় পরিসরে তাঁর কথাবার্তা ও আচার-আচরণে উদ্বেগ, সন্দেহ ও অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিল। সে রকম পরিস্থিতিতে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে তাঁর সময় অতিবাহিত হচ্ছিল এবং আমি নিশ্চিত যে পূর্ববর্তী ২৪ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময়ের মধ্যে তাঁর ঘুম বা বিশ্রাম নেওয়া হয়নি। হঠাৎ প্রেসিডেন্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মনজুর, আর্মি কি আমাকে রক্ষা করবে? তারা কি আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে?'

তাঁকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে আমি বললাম, অবশ্যই আর্মি তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

এমন বহু বিষয়ে এখন তিনি কথা বলতে শুরু করেন। একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করেন, 'সামরিক শাসন জারি করা ছাড়া বা সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়া কারও পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে কি তুমি মনে করো?'

প্রশ্নটি আমাকে বিস্মিত করে। তিনি কী বোঝাতে চান এবং তাঁর মনে কী আছে, তা আঁচ করতে পারছিলাম। তিনি যে এখনো ক্ষমতায় থাকতে চাইছেন, এর অনুকূলে একটা অজুহাত ও সুযোগ খুঁজছেন, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। আরও বুঝতে পারি, তিনি আমার মন পরীক্ষা করছেন এবং একটি অনুকূল প্রতিক্রিয়া আশা করছেন। তিনি এখনো দেশের আইনানুগ প্রেসিডেন্ট এবং যথেষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম, তবু সমর্থক খুঁজছেন। কিন্তু আগামীকাল দুপুরের পর থেকে তিনি এক পতিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে প্রতিপক্ষের দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন।

আমার সঙ্গে আলোচনায় প্রেসিডেন্ট কয়েকবারই দেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ ও সামরিক শাসনের প্রসঙ্গ তুললেন। প্রেসিডেন্টের সামনে আমি নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত ও সুস্থির থাকার চেষ্টা করছিলাম। তিনি যতই কথা বলে চলেছেন, আমার কাছে ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে কোনো দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা তাঁর মনে কাজ করছে। কৌশলে তিনি আমার মনোভাব জেনে নিচ্ছেন। আমার আশঙ্কা আরও দৃঢ় হলো, তিনি একটা শেষ চেষ্টা করবেনই। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। এরই মধ্যে কিছু একটা করতে হবে। তিনি এখন তাঁর সমর্থকের খোঁজ করছেন। তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী শেষরক্ষা করার জন্য তাঁকে চাপ দিয়ে চলেছে। এমন অবস্থায় তাঁর অনুকূলে কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হতে পারে, এমন একটা আশঙ্কা-সন্দেহ আমার মনে আরও একটু দৃঢ় হলো। মানসিকভাবে আমিও আরও প্রস্তুত হলাম। তিনি সফল হলে তা জাতিকে এক মারাত্মক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। গত ১২ ঘণ্টায় জনতাকে শান্ত করতে এবং রাস্তা থেকে ড্রয়িংরুমে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশের জনগণ জেনারেল এরশাদের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে একটা পরিবর্তনের আশা করছিল। কিন্তু সেই জনগণই যদি আবারও আসন্ন পরিকল্পনার পরিবর্তন দেখে, তাহলে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। তখন সেনাবাহিনীই হয়ে উঠবে তাদের ক্ষোভের মূল লক্ষ্য। দেশে চরম নৈরাজ্য ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত রাখার ব্যাপারে বেশি মনোযোগী হলাম। তিনি ঘুরেফিরে সামরিক আইন জারির

প্রয়োজনের কথাই উল্লেখ করতে থাকেন। আমিও তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি, সামরিক শাসন কেবল আগুনে আরও তেল ঢালার মতো একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে এবং দেশকে মারাত্মক সহিংসতার দিকে নিয়ে যাবে। তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ জনতাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। আরও বললাম, এমন অবস্থায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যদের বিক্ষুব্ধ জনতাকে মোকাবিলা করার আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করার আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি তারা জনতার পক্ষাবলম্বন পর্যন্ত করে ফেলতে পারে। দেখলাম, এ কথাগুলো তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। গতকাল তাঁকে বলেছি, সেনাবাহিনী তাঁকে সমর্থন করবে না। কাজেই এ দিকটি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। মনে হয় এতে করে কাজ হলো। আমি এই সঙ্গে তাঁকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখন পাকিস্তানিরা তাঁদের সেনাবাহিনীকে সহজে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু তারও পরিণতি হয়েছিল খুবই মারাত্মক। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন এবং তখনকার চেয়ে এখনকার পরিণতি হবে আরও ধ্বংসাত্মক।

আমার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'তুমি কি মনে করো, এর চেয়ে ভালো হয় যদি আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাই?'

উত্তরে আমি বললাম, 'কেন আপনি দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। তাহলে সবাই মনে করবে, আপনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন? আরও বললাম, এতে করে জনগণ আপনাকে ভীরু বলবে।

এ মন্তব্যের পর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমাদের আলোচনা চলার একপর্যায়ে বেগম এরশাদ রুমে ঢুকলেন এবং জানালার পাশে রাখা সোফায় এসে বসলেন। তাঁকেও খুব বিপর্যস্ত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি আলোচনায় যোগ দিয়ে স্বামীর মতোই একই প্রশ্ন করলেন, তাঁরা নিরাপদ থাকবেন কি না?

আমাকে আবারও তাঁদের আশ্বস্ত করতে হলো। নিরাপত্তার ব্যাপারটাই ছিল তাঁদের মূল চিন্তা এবং এ জন্য তাঁরা স্পষ্টতই সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করছেন। যদিও আমি এমন কোনো অবস্থানে ছিলাম না, যার ওপর নির্ভর করে তাঁদের আমি নিশ্চিত কোনো আশ্বাস দিতে পারি। আসলে এ সময় তাঁদের প্রয়োজন ছিল সান্ত্বনা। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখতে এবং তাঁর সাহায্য কামনা করতে বলি। আমি কথাবার্তা চালিয়ে যাই এবং উভয়কে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করতে থাকি। তবে আমার মূল প্রচেষ্টা ছিল, তিনি যাতে তাঁর ক্ষমতায় থাকার ব্যাপারটি আর প্রলম্বিত করার

সুযোগ না পান। একপর্যায়ে আমি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম, এরশাদের মন সামরিক আইন প্রয়োগের ব্যাপারে স্থির হয়ে আছে। কোনো অজুহাতে বা সুযোগে সেটা জারি করতে চান এবং তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও সহায়তাকারীর অনুসন্ধানে আছেন।

হঠাৎ পদত্যাগের ঘোষণা দিলেও শুরু থেকেই আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, একসময় প্রেসিডেন্ট এরশাদ সামরিক শাসন জারি করে বা অন্য কোনোভাবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে চাইবেন। দেরি হলেও নিজেকে বাঁচানোর একটা পথ খুঁজবেন। এখন তাঁর একজন বিশ্বস্ত জেনারেল চাই, যাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রধান সামরিক শাসক নিয়োগ করে তাঁর হাতে দায়িত্ব দিয়ে প্রথম সুযোগেই তিনি সরে পড়বেন। তাঁর জন্য এখন এই একটা পথই খোলা আছে। বিরোধী রাজনৈতিক কোনো পক্ষের সঙ্গে আঁতাতের আর সুযোগ নেই। আমার এমন ধারণা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠল। হঠাৎ বেগম এরশাদ, কয়েক মিনিট আগে প্রেসিডেন্ট এরশাদ যা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেই একই কথা জিজ্ঞেস করলেন, 'তার চেয়ে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া কি ভালো নয়?' আমি কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই এরশাদ বললেন, 'না, আমি অন্য কোনো দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হতে চাই না। আমি কোথাও যাব না।'

বেগম এরশাদ একের পর এক বহু প্রশ্ন করতে থাকেন। তাঁরা যদি দেশে থাকেন, তাহলে কী ঘটতে পারে, সেনাবাহিনী কি তাঁদের রক্ষা করবে, তাঁরা কি সেনাভবনে থাকার অনুমতি পাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়াটা আমার জন্য বেশ কঠিন ছিল এবং এ অবস্থায় তাঁদের দুশ্চিন্তামুক্ত করার চেষ্টাও ছিল অর্থহীন। তার পরও তাঁদের প্রতি আমি আমার সহানুভূতি প্রদর্শন অব্যাহত রাখি, কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও তাঁদের বুঝিয়ে বলি, তাঁদের অনেক সমস্যা হবে, কিছু কঠিন অবস্থারও মোকাবিলা করতে হতে পারে, এমনকি অপমানজনক অবস্থার মধ্যেও পড়তে হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে এটাই প্রকৃত বাস্তবতা। ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি এ-ও বলি, রাজনীতিতে এসবই জীবনের অংশ। ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর উদাহরণও তুলে ধরলাম। মনে হলো, আমার কথায় উভয়ই কিছুটা আশ্বস্ত।

দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আমাদের কথাবার্তা চলে। আমি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ করছিলাম। কিন্তু তাঁরা আলোচনা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী। হঠাৎ প্রেসিডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নবম পদাতিক ডিভিশনের

জিওসি কোথায়? সে কি ঢাকায়? তাঁর সঙ্গে কি যোগাযোগ করা যাবে?' আমি বললাম, তিনি ঢাকাতেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে টেলিফোনে কথা বলার ব্যবস্থা করতে এডিসিকে বললেন। তার পরই স্ত্রীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'Rafique is a great fighter, he will give life for me. I will talk to him.' ('রফিক একজন মহান যোদ্ধা, সে আমার জন্য জীবন দেবে, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব')। প্রেসিডেন্ট যা বললেন, আমাকে তা বিস্ময়ের শেষ সীমায় নিয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে আমি আতঙ্ক বোধ করতে থাকি। তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলোর অর্থ কী এবং তিনি কী করতে চাইছেন, এবার সেটা আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝে ফেললাম। তিনি এই জেনারেলকেই খুঁজছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমার আশঙ্কাই ঠিক হতে যাচ্ছে। এবার আরও নিশ্চিত হলাম, তিনি সামরিক আইন জারির ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেলেছেন এবং মেজর জেনারেল রফিকুল ইসলামকেই এ কাজে লাগাবেন। আমার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তিনি কেবল আমাকে একটুখানি যাচাই করে নিলেন।

মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি জেনারেল রফিককে বগুড়া থেকে সাভারে নিয়ে আসেন নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি পদে নিয়োগ দিয়ে। এটা ছিল তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পরিকল্পনারই অংশ। জেনারেল রফিক প্রেসিডেন্ট এরশাদের কতটা ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন, সেটা সেনাবাহিনীর অনেকেরই জানা ছিল। ঢাকা ও ঢাকার কাছে অবস্থিত নবম পদাতিক ডিভিশন ও ৪৬তম স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টদের নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার পরপরই ৪৬তম স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলের প্রথম দিকে নবম পদাতিক ডিভিশন গঠন করা হয়। প্রেসিডেন্টের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারদেরই কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করা হতো।

জেনারেল এরশাদ যখন প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন, তখন এরশাদের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু মেজর জেনারেল আবদুর রহমান ছিলেন নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি, আর ব্রিগেডিয়ার রফিক তখন ছিলেন ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার। সামরিক শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় এরশাদের একনায়কতান্ত্রিক ভূমিকা কার্যকরভাবে প্রয়োগের ব্যাপারে ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে এ দুই অফিসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করেন। মেজর জেনারেল রফিকের জন্য এখন সেই প্রতিদানমূলক আনুগত্য প্রদর্শনের সময় উপস্থিত। আমি আরও নিশ্চিত হলাম,

প্রেসিডেন্ট তাঁকে উদ্ধারের জন্য নবম পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডারকেই নিয়োগ করবেন। এডিসি কয়েকবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। এটা ছিল আমার জন্য একটা বিরাট স্বস্তিদায়ক ব্যাপার। আমি আসলে এ অবস্থায় প্রেসিডেন্টের সামনে থেকে চলে যাওয়ার ছুতো খুঁজছিলাম। প্রতিটি মুহূর্ত আমার জন্য মূল্যবান। জেনারেল রফিকের সন্ধান পাওয়ার আগেই আমাকে সেনাভবন ছেড়ে যেতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সময়কেই অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হয়। প্রেসিডেন্ট যে জেনারেল রফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, তা ছিল খুবই তাৎপর্যবহ। এই তথ্য সেনাপ্রধান বা সিজিএসকে জানানো ছিল আমার জন্য একটা খুবই জরুরি কর্তব্যেরই অংশ। তবে আমি এরই মধ্যে জেনেছি, রফিককে দিয়ে কোনো অপতৎপরতা চালাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ যাতে সক্ষম না হন, সে ব্যবস্থা আগেই গ্রহণ করা হয়েছে। রফিককে খোঁজার অজুহাত দেখিয়ে আমি সেনাভবন থেকে বের হয়ে বঙ্গভবনের পথে রওনা হলাম।

বঙ্গভবনের বাসায় যখন পৌঁছি, তখন বিকেল সোয়া চারটা। ওই সময় পর্যন্ত আমার স্ত্রী বা পরিবারের অন্য কারও সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমাকে ঘরে ফিরতে দেখে তাঁদের মনে স্বস্তি ফিরে আসে। এখন আমার সর্বপ্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় সেনাপ্রধান জেনারেল নূরউদ্দীন বা সিজিএস মেজর জেনারেল আবদুস সালামের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সতর্ক করা। জেনারেল নূরউদ্দীনকে সহজেই টেলিফোনে পেয়ে গেলাম। তাঁকে জানালাম, প্রেসিডেন্ট জেনারেল রফিককে খুঁজছেন এবং রফিকের প্রতি তিনি যে কতটা আস্থাশীল সে কথাও তাঁকে বললাম। এরশাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে যা কিছু জেনেছি, তা-ও খুলে বললাম তাঁকে। আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম, প্রেসিডেন্ট এরশাদের মতলব সম্পর্কে সেনা প্রধানের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। একটা পুরো রাত এবং দিনের অর্ধেক সময় ধরে তিনি ক্ষমতায় আছেন। এ সময়টায় সামরিক শাসন জারি করাই তাঁর শেষ ভরসা। এ সুযোগ কাজে লাগানোর ব্যাপারে তিনি বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারেন। সেনাপ্রধান সম্মত না হলে তাঁকে অপসারণ করে নবম ডিভিশনের জিওসিকে যে সেনাপ্রধান নিয়োগ করবেন, এখন সেটা নিশ্চিত। এমন সব গুরুত্বপূর্ণ খবর জানানোর জন্য সেনাপ্রধান আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, তাঁরও এমনটাই আশঙ্কা ছিল। তবে ব্যাপারটা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। পূর্বসতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগের রাতেই তিনি জেনারেল রফিকের

অধীন পুরো বাহিনীকেই সাভারে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে নবম পদাতিক ডিভিশনের অধিকাংশ সেনাই ওই সময় শেরেবাংলা নগরে অবস্থান করছিলেন। জেনারেল রফিক নিজেও সেখানে সাময়িকভাবে উপস্থিত ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের প্যারেডের জন্য তাঁদের আনা হয়েছিল, কিন্তু পরে এরশাদবিরোধী আন্দোলন শুরু হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তাঁদের প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

ক্রোধান্বিত বিদায়ী প্রেসিডেন্ট

৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি সময় কর্তব্যরত এডিসি মেজর শাব্বির আমাকে ফোন করেন। ভয়মিশ্রিত স্বরে আমাকে বলেন, 'স্যার, প্রেসিডেন্ট সেনাপ্রধান ও সিজিএসের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু আমি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে টেলিফোন করে যাচ্ছি, কিন্তু কেউ টেলিফোন ধরছেন না। প্রেসিডেন্ট ভীষণ রেগে গেছেন। আমি এখন কী করব, বুঝতে পারছি না।'

আমি তাঁকে বললাম, ভয়ের কিছু নেই, তবে যেন টেলিফোনে তাঁদের খুঁজতে থাকেন। আরও বললাম, প্রেসিডেন্ট যদি বেশি রেগে যান কিংবা তাঁকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে তাঁকে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে অনুরোধ করবেন।

সেনা প্রধানের সঙ্গে আমার সর্বশেষ টেলিফোন আলাপের পর থেকেই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে অনেক তৎপরতা চলতে থাকে। কোনো সম্ভাবনাকেই (ক্যু বা অন্য কোনো তৎপরতা) বাদ না দিয়ে নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়। ক্যান্টনমেন্টের সব ইউনিটকে তাদের নিজ নিজ এলাকা ঘিরে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি পুরো যুদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়। জেনারেল রফিকসহ যে জনা কয়েক অফিসারকে প্রেসিডেন্টের প্রতি অতিমাত্রায় অনুগত হিসেবে সন্দেহ করা হতো, তাঁদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখা হয়। এ পর্যায়ে আমি আশঙ্কা করছিলাম, ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রেসিডেন্ট সেনাপ্রধানকেই অনুরোধ করবেন। কাজেই তিনি যাতে সেনাপ্রধান বা সিজিএসের সঙ্গে টেলিফোন বা ওয়্যারলেসে কথা বলতে না পারেন, তেমন ব্যবস্থা করতে হলো। দুজনকেই দূরে সরে থাকার পরামর্শ দিলাম। অন্যদিকে রফিকসহ অন্য কোনো উর্ধ্বতন কমান্ডারের সঙ্গেও প্রেসিডেন্ট এরশাদ যেন যোগাযোগ করতে না পারেন, সেটাও নিশ্চিত করা হয়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ তখনো ক্ষমতায় আছেন; তিনি যদি মার্শাল ল জারি

করে সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেন, তাহলে তাঁদের পক্ষে তা অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ত।

রাত পৌনে নয়টায় লাল টেলিফোনে প্রেসিডেন্ট আমাকে রিং করেন। আমি তাঁর টেলিফোন আশা করছিলাম এবং তাঁর জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতেও প্রস্তুত ছিলাম। কোনো ধরনের বিরক্তি প্রকাশের চিহ্ন ছাড়া স্বাভাবিক গলায় কথা শুরু করেন তিনি। সরাসরি তিনি প্রশ্ন করেন, 'মনজুর, সেনাবাহিনীতে কী হচ্ছে? আমি কি এখনো প্রেসিডেন্ট নই? নূরউদ্দীন কেন আমার সঙ্গে কথা বলছে না? কেন সালাম আমার সঙ্গে দেখা করছে না? আমি একটার পর একটা খবর পাঠাচ্ছি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য, অথচ তারা আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছে না? তাদের সমস্যাটা কী?' এক নিঃশ্বাসে আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন। তিনি যে বেশ ভেঙে পড়েছেন এবং রেগে গেছেন, সেটা এখন বোঝা যাচ্ছিল। কোনো বাধা না দিয়ে আমি কথাগুলো শান্তভাবে শুনি। তাঁকে যেভাবে হোক, শান্ত রাখতে হবে। আমি নম্রভাবে সেনাপ্রধান ও সিজিএসকে কেন পাওয়া যাচ্ছে না, তার কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তবু কিছু বলে তো তাঁকে শান্ত করতে হবে! আমি বললাম, অপ্রত্যাশিত কোনো সংকট মোকাবিলার জন্য সেনাবাহিনীর অপারেশনমূলক প্রস্তুতির কাজে তাঁরা দারুণ ব্যস্ত। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিই, এ ধরনের পরিস্থিতিতে কমান্ড ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে সেনাবাহিনীর অপারেশনমূলক কার্যপ্রণালির সঙ্গে কত ধরনের কর্মকাণ্ড যে জড়িত, সেটা তাঁর ভালোভাবেই জানার কথা। এ কথা শোনার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আছে কি না। যখন আমি এই প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক জবাব দিই, তিনি তখন অভিযোগের সুরে বলেন, 'তাহলে তারা আমার সঙ্গে কেন কথা বলছে না?' মনে হলো, তিনি কিছুটা সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমাকে তাদের উপেক্ষা (ইগনোর) করার কারণ কী?'

কোনো দ্বিধা না করে এবার আমি বলে ফেললাম, স্যার, এর পেছনে কিছু কৌশলগত (ট্যাকটিক্যাল) কারণ আছে। আপনাকে পরিস্থিতি বুঝতে হবে। নিশ্চয় যত দ্রুত সম্ভব তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আমার এই উত্তর মনে হলো অলৌকিক ওষুধের মতো কাজ করল। আর কোনো আলোচনা না করে তিনি টেলিফোন রেখে দিলেন। আমি নিশ্চিত যে আমি যা বোঝাতে চেয়েছি, তার চেয়েও তিনি বেশি বুঝে নিয়েছেন।

সেনাবাহিনী তাঁর সঙ্গে নেই, এ কথা তিনি দুবার আমার মুখ থেকে শুনেছেন। এবার ব্যাপারটার আরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেলেন। সম্মিলিত বিরোধী

দল তাঁর পদত্যাগ মেনে নিয়েছে, প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং শপথ নেবেন ৬ ডিসেম্বর বেলা দুটোয়। এসব কিছুই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ঘোষণা হয়ে গেছে। তিনি এখনো প্রেসিডেন্ট বলে দাবি করলেও অবস্থা যে পুরো পাল্টে গেছে, তা বুঝেও নিজেকে উদ্ধারের অপচেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি সেনাবাহিনীতে তাঁর অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত কোনো কমান্ডারকে এখনো খুঁজে চলেছেন। এ ছাড়া বর্তমান অবস্থা থেকে পার পাওয়ার কোনো পথ নেই। সকাল হওয়ার আগেই যা করার তাঁকে সেটা করতে হবে। নবম ডিভিশনের জিওসিকে পাননি, এখন তাঁর শেষ ভরসার স্থল হলো সেনাপ্রধান। আমি জানতাম, সেনাপ্রধান ও সিজিএসসহ কেউই সেই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের পক্ষে কোনো পদক্ষেপ বা অবস্থান নেবেন না। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেনাবাহিনীর অপারেশনের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের কেউ যে তাঁর পক্ষে নেই, সে ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত ছিলাম। এদিকে আমি সেনাপ্রধান ও সিজিএসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললেও এবং ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা ভণ্ডুল করার যেকোনো প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত থাকলেও আমার ভয় হচ্ছিল, 'যদি' তিনি কিছু করে ফেলেন! প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে আমার টেলিফোন আলাপের কিছুক্ষণ পরই আমি জানতে পারি, কয়েকজন মন্ত্রী সেনাভবনে আছেন, সম্ভবত আরও কয়েকজন তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছেন। একজন অফিসার আমাকে জানান, তাঁর কাছে পরিস্থিতি সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

বড়জোর এক ঘণ্টা পার হয়েছে, এমন সময় সিজিএস জেনারেল সালাম আমাকে ফোন করেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর দেন। তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট তাঁকে ও সেনাপ্রধানকে অবিলম্বে দেখা করতে পিএসএফের একজন অফিসারকে পাঠিয়েছেন। সালাম আমাকে আরও বললেন, কোনো গুরুতর বিষয়ে প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু তাঁদের কেউই যেতে আগ্রহী নন। তিনি আরও বললেন, সেনাপ্রধান বিশেষভাবে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন এবং আমার মনোভাব জানার জন্য অপেক্ষা করছেন। এটা যে একটা ষড়যন্ত্রমূলক ফাঁদ, তাতে আর আমার সন্দেহ রইল না। সুতরাং, কোনো পরিস্থিতিতেই তাঁদের সেনাভবনে যাওয়া উচিত নয় বলে জানালাম। আমার সামনে সম্ভাব্য কৌশলগত যে ছবিটা মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল, সেটা হলো, তাঁরা সেনাভবনে উপস্থিত হলে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার অজুহাত দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট দেশে মার্শাল ল জারির কথা এবং সম্ভবত সেনাপ্রধানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগের কথা বলে বেসামরিক

প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার কথা বলতেন। মন্ত্রিপরিষদের অনেকে তখন সেনাভবনে উপস্থিত। সেই পরিস্থিতিতে সেনা প্রধানের পক্ষে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা সম্ভব হতো না। তিনি হয়তো বাধ্য হয়ে সেনাভবন থেকেই ফিল্ড কমান্ডারদের মৌখিক নির্দেশ দিতেন। প্রেসিডেন্ট নিজেও টেলিফোনে কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বলতেন। সেই নির্দেশ অমান্য করা কারও পক্ষে সম্ভব হতো না, বিশেষত যখন তাঁরা বুঝতে পারতেন যে নির্দেশটি আসছে সেনাভবন থেকে। তা ছাড়া যখন জানবেন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (সিজিএস), যিনি সেনা সদর দপ্তরে অপারেশন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত, তিনিও সেনা প্রধানের সঙ্গে আছেন, তখন নির্দেশ পালনে কারও কোনো রকমের দ্বিধা থাকত না। প্রেসিডেন্ট এরশাদের ক্ষমতায় বহাল থাকার সুকৌশলী প্রচেষ্টার অংশস্বরূপ এসব সম্ভাবনাকে তখন নাকচ করা নিরেট নির্বোধের কাজ হতো।

জেনারেল সালামের সঙ্গে কথা বলা শেষ করেই সেনাভবনের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য আমি টেলিফোন করলে এডিসি আমাকে জানান, প্রেসিডেন্ট সেনাপ্রধান ও সিজিএসের জন্য অপেক্ষা করছেন। দুজনের কেউই তখন পর্যন্ত সেনাভবনে পৌঁছাননি, তবে কয়েকজন মন্ত্রী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডাইনিং হলে বসে আলোচনা করছেন। কে কে উপস্থিত, সেটা জানতে চাইলে তিনি সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল আতিকুর রহমানসহ সাত বা আটজনের নাম বললেন। অবশ্য সাবেক সেনা প্রধানের উপস্থিতি নিতান্তই কাকতালীয় ছিল। তিনি গিয়েছিলেন সেনাবাহিনী থেকে নিজের অবসর গ্রহণের বিদায়ী সাক্ষাৎকারের জন্য। এ পরিস্থিতিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ, প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ ও মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্যের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সেনাভবনে সেনাপ্রধান ও সিজিএসকে অতি জরুরি তলব করার নেপথ্যের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। আমার সঙ্গে বিকেলে সামরিক আইন নিয়ে প্রেসিডেন্টের আলোচনা, নিজের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা, দেশত্যাগের কথা বলা, নবম ডিভিশনের জিওসিকে ডাকার চেষ্টা ও তাঁর ওপর ব্যক্তিগত আস্থা প্রকাশ করা, বিগত কয়েক ঘণ্টার তৎপরতা প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহ মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছিল, যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেভাবে তিনি প্রধান বিচারপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে যাচ্ছেন না। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত সেনাপ্রধান ও সিজিএস প্রেসিডেন্টের আবাসস্থল সেনাভবনে যাননি বলেই প্রেসিডেন্ট এরশাদের ক্ষমতায় থাকার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্য কোনো কমান্ডারের কারও সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করতে পারেননি।

ফলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কৃপায় দেশ আরেকটি সামরিক শাসনের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দীন খান সেই রাতে তাঁকে ও জেনারেল সালামকে সেনাভবনে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, তখন তাঁরা প্রেসিডেন্টের সামনে উপস্থিত হলে পুরো পরিস্থিতিই অন্য রকম হয়ে যেত। পরে তিনি আমাকে আরও বলেন, সেনাভবনে যাওয়ার উদ্দেশে শেষবার সামরিক পোশাক পরেও তিনি আমার বার্তা পেয়ে তা খুলে ফেলেন। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার রেডিও-টিভি ভাষণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য ৪ ডিসেম্বর রাতে প্রথমবার যখন সেনাপ্রধান সেনাভবনে যান, তখন প্রেসিডেন্ট এরশাদের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী সামরিক আইন জারি করার ব্যাপারে তাঁকে সম্মত হতে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের শেষ দিনটি

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর সকালে লাল টেলিফোন বাজার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন সময় সকাল সাড়ে ছয়টা। টেলিফোনে প্রেসিডেন্ট এরশাদ। তিনি অস্বাভাবিক নরম সুরে কথা বলতে শুরু করলেন। দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর ক্ষমতা ছাড়ার আর মাত্র আট ঘণ্টা বাকি। তাঁর গলার স্বর থেকে আমি তাঁর মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছিলাম। এত ভোরে আমাকে ঘুম থেকে ওঠানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'মনজুর, তুমি কি এখনো মনে করো আমি নিরাপদে থাকব এবং আমার পদত্যাগ করা উচিত? সেনাবাহিনী কি আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, আমাদের দেখাশোনা করবে?'

ওই সময় তাঁর কথাগুলো আমাকে যথেষ্ট বিচলিত ও বিব্রত করে তোলে। কীভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। বললাম, 'স্যার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখুন এবং তাঁর ওপর সবকিছু ছেড়ে দিন। নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে নিরাপদে রাখবেন।'

আলোচনা আর প্রলম্বিত না করে এবার তিনি অন্য প্রসঙ্গ তোলেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের শপথগ্রহণের সময় ও ব্যবস্থা নিয়ে কথা বললেন। আমি সময়ের ব্যাপারটি নিশ্চিত করে বললাম, সব প্রস্তুতি ঠিকঠাকমতো চলছে। তিনি যাতে যথাযথ মর্যাদা ও একটা শোভন পরিবেশে অফিস ত্যাগ করতে পারেন, সে ব্যাপারে আমার প্রয়াসে আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না। আমি মনে করতাম, অতীতের অন্যায় আচরণ ও নানা অপকর্মের জন্য তিনি

যত কলঙ্কই অর্জন করে থাকুন না কেন, এখন যদি পদত্যাগ করে কোনো ঝামেলা বা হুমকির সৃষ্টি না করে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ করেন এবং সদাচরণ শুরু করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে সৃষ্ট তিক্ততা অনেক কমে যাবে।

ডিসেম্বরের ওই রাতটি (৫ ডিসেম্বর) ছিল আমাদের ও প্রেসিডেন্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত তিনি আশা করেছিলেন, ওই রাতের মধ্যে নিজেকে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। কিন্তু ৬ ডিসেম্বর সকাল তাঁর জন্য বয়ে নিয়ে এল চরম হতাশা ও অসহায়ত্বে ভরা একটি দিন। আমার কাছে টেলিফোন করে তিনি যাচাই করে নিলেন কোনো দিকে কোনো রকম আশার আলো আছে কি না! গেল রাতটা এমন ঘটনাহীনভাবে পার হবে, সে কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি এবং কিছু কিছু বন্ধু ও সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনাও করেছি। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট তখন কমবেশি একটা দুর্গে পরিণত হয়েছে। পদত্যাগী প্রেসিডেন্টের অনুকূলে পরিচালিত যেকোনো উদ্যোগ যাতে ব্যর্থ করা যায়, সে জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ওই রাতে কেউ কোনো ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানমূলক কিছু করার চেষ্টা করলে তার পরিণতি খুবই মারাত্মক হয়ে দাঁড়াত। আল্লাহর অশেষ কৃপায় রাতটা কেটে গেল কোনো ধরনের অঘটন ছাড়াই। ফলে আরও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আশা করতে থাকি। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের ক্ষমতা গ্রহণের ক্ষেত্রে এখন আর কোনো ধরনের বিলম্বের ব্যাপার, হুমকি বা বাধা নেই।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত ও অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন, সে কথা সম্ভবত দেশে-বিদেশে তাঁর কোনো বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ীও ভাবতে পারেননি। আমার নিজেরও এ রকমের একটা প্রায় দৃঢ়বদ্ধ ধারণা ছিল যে, এই চরম সংকট বা বিপর্যয়ের আগ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সপরিবারে বিদেশে সরে পড়ার লক্ষ্যে গোপন কোনো পরিকল্পনা নিশ্চয়ই তৈরি করে রেখেছেন। এ ধরনের পূর্বপ্রস্তুতি সচরাচর সব একনায়কেরই থাকে। ক্ষমতায় যে আর বেশি দিন টিকে থাকা যাবে না, সে কথা তিনি নিজেই সময়ে সময়ে বলতেন। অনেক সময়ই তিনি দেশ পরিচালনা ও রাজনীতির ব্যাপারে হতাশা ও নৈরাশ্য প্রকাশ করতেন। প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'মনজুর, বুঝতে পারছ, এই দেশ চালানো কী কঠিন এবং কতটা সমস্যাবহুল?' আরও বলতেন, কারও পক্ষেই দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মতো

একটি গরিব ও অনুন্নত দেশ শাসন করা সম্ভব নয়। এখানকার জনগণ সরকারের দ্রুত পরিবর্তন দেখতে বেশি আগ্রহী এবং সব সময় সরকারবিরোধী ভূমিকা পছন্দ করে। ১ ডিসেম্বর (১৯৯০) হেলিকপ্টারে বসে যখন বলেছিলেন, তিনি পদত্যাগের পরিকল্পনা করেছেন, তখন আমি খুবই আশান্বিত হয়েছিলাম। তার পর থেকে আন্তরিকভাবে তাঁকে সিদ্ধান্তে অটল থাকা এবং সসম্মানে ক্ষমতা ছাড়ার ব্যাপারে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, প্রেসিডেন্ট এরশাদের ওপর সার্বিক প্রভাব ফেলার মতো অবস্থা বা অবস্থান আমার ছিল না। কারণ, অর্ধবিশ্বস্ত সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর ঘনিষ্ঠ চক্রটির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না। তাঁর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধুদের সামনে আমি কোনো মূল্য বহন করতাম না, তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি ছিল অন্য রকম। আমি লক্ষ করেছি, ১ ডিসেম্বরের পর থেকে তিনি আমার সামনে পদত্যাগের ইস্যু-সম্পর্কিত কোনো আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। ব্যক্তিগত স্টাফ হিসেবে তাঁর চারপাশে আরও যারা ছিলাম, তাদের অধিকাংশই সংকটের একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা চেয়েছি। কিন্তু চাইলে কী হবে, আমার ধারণা, প্রেসিডেন্টের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিছু আত্মীয়স্বজন ও অতি অন্তরঙ্গজন ওই সময় তাঁর ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনড় অনিচ্ছুক বলে কিংবা তাঁর পদত্যাগ তাঁদের জন্য অসুবিধা ডেকে আনবে বলে তাঁর পদত্যাগের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করে চলেছিলেন। আমি সব সময়ই মনে করতাম, তাঁর দলের রাজনৈতিক নেতারা তাঁর পদত্যাগের বিরোধিতা করবেন। কার্যত, তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ ও মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ছাড়া দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। চাপের মুখে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকার মতো দৃঢ়তা প্রেসিডেন্ট এরশাদের ছিল না। তাঁর মধ্যে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি, দূরদর্শিতা এবং যা করছেন, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলেও পাশাপাশি তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে প্রতারণা, ভণ্ডামি ও অনৈতিক আচরণ। নৈতিক দুর্বলতার কারণে তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেন। তা ছাড়া এমন কিছু ঘনিষ্ঠজন ছিলেন, যাঁদের চাপ অগ্রাহ্য করতে না পেরে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পাল্টে ফেলতেন। বিলম্বে হলেও প্রবল আন্দোলনের মুখে ৪ ডিসেম্বর রাতে পদত্যাগের ঘোষণা ছাড়া তাঁর সামনে অন্য আর কোনো বিকল্প ছিল না। তবে হঠাৎ করে পদত্যাগের কথা এমনভাবে ঘোষণা করে বসলেন, যার ফলে সেই ঘোষণা শুধু ঢাকা নগরেই মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল না, সৃষ্টি করল একটা সাংবিধানিক

সংকটও। একই সঙ্গে তিনি নিজের ভবিষ্যৎ অবস্থানগত দিকটিকে আরও নাজুক করে তোলেন। আমি এখনো জানি না, এমন স্টাইলে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করতে কোন বিষয়টি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং আসলে তাঁর মনে কী ছিল! তবে একদিক থেকে এ ঘোষণা আমাদের কাজ সহজ করে দেয়। আরও দ্রুত ও ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর পদত্যাগের অনুকূলে কাজ করতে সক্ষম হই। একবার যখন তিনি পদত্যাগের কথা ঘোষণা করে বসেছেন, তখন সেনাবাহিনীতে কেউ আর তাঁর পক্ষে রাতারাতি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন বলে মনে হয় না। ঘটনার দ্রুততায় তাঁরা বিস্ময়ের ঘোরের মধ্যেই থাকেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা পুরোপুরি আগেই হারিয়ে ফেলেছিলেন, বিরোধী শিবিরের কেউ তাঁকে বিশ্বাস করত না। ফলে রাজনৈতিকভাবে তিনি একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। তিনি মনে করতেন, জাতীয় পার্টির নেতারা যথেষ্ট শক্তিশালী। বাস্তবে তা ছিল না। ফলে একটা সম্মানজনক রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তিনি ব্যর্থ হলেন। অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল, প্রশাসনকে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার, ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজনৈতিক দল গঠন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় শঠতার আশ্রয়, ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার, নির্বাচনে কারচুপি, দুর্নীতি, অশোভন ব্যক্তিগত জীবনের মতো নানা ঘটনার জন্য তিনি খুবই নিন্দিত হয়ে পড়েন। তা ছাড়া বিরোধীদলীয় বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে তাঁর সময় বহুভাবে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। কাজেই তিনি যে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাছ থেকে প্রতিহিংসার আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক। এ রকম দুশ্চিন্তা ও শঙ্কার চিন্তা তাঁকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এসব কারণে ও অশুভ চক্রের প্রভাবে পড়ে পদত্যাগের বিষয়ে সময়মতো সঠিক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অপারগ হন এবং পদত্যাগের মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা লাভেও চরমভাবে ব্যর্থ হন।

চতুর্থ পর্ব

সাহাবুদ্দীন আহমদের অস্থায়ী শাসন

প্রথম অধ্যায়

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

শপথ গ্রহণের দিনটি

৫ ডিসেম্বরের (১৯৯০) দিবাগত রাতটি নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। ৬ ডিসেম্বর খুব সকালে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে ফোনালাপ শেষ করার পর থেকে আমার মনে পুরোপুরি স্বস্তি ফিরে আসে। এর পর থেকেই আমি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের অফিসে নতুন প্রেসিডেন্টের প্রবেশের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বঙ্গভবনে ৬ ডিসেম্বরের প্রথম প্রহরটি ছিল আমাদের জন্য বেশ উত্তেজনায় ভরা। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সঙ্গে আগের রাতেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান-পরবর্তী সম্ভাব্য কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করি। তিনি প্রস্তাবিত কর্মসূচির ব্যাপারে তাঁর সম্মতি দেন। ক্যাবিনেট সচিব এম কে আনোয়ারও এ নিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। প্রেসিডেন্টের দপ্তরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরপরই নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানে একটি সংবর্ধনা ও চা-চক্রের ব্যবস্থা রাখা হয়। বঙ্গভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিকেলের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দ্রুত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কতজন অতিথির সমাগম হবে, তা না জেনেই আসন ও চায়ের ব্যবস্থা করার বিষয়টি তাঁদের জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। বঙ্গভবনে কোনো অনুষ্ঠান করতে হলে ব্যাপক তৎপরতা ও বিস্তৃত কর্মসূচির এবং বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সাধারণত সুষ্ঠু সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়ে। এর পাশাপাশি আরও প্রয়োজন হয়

সর্বক্ষেত্রে সতর্ক তদারকির। পারসোন্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রধান ও প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব হিসেবে এসব দেখার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গভবনে ওই সব কাজে নিয়োজিত স্টাফরা খুবই দক্ষ ও দায়িত্বশীল। নির্দেশ পাওয়ামাত্রই তাঁরা কাজে নেমে পড়েন।

বেলা একটা নাগাদ বঙ্গভবনে দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর-পরবর্তী অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। প্রেসিডেন্টের গাড়িবহরের একটি দল পদত্যাগী প্রেসিডেন্টকে আনার জন্য এবং অপর একটি দল নতুন প্রেসিডেন্টকে আনার জন্য যথাস্থানে এরই মধ্যে চলে গেছে। পিজিআর ও পিএসএফের অফিসারসহ একজন এডিসিকে আগেই প্রধান বিচারপতির বাসভবনে পাঠানো হয়েছিল। বেলা একটা ৪৫ মিনিটে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্টের দপ্তরে পৌঁছান। প্রেসিডেন্টের মুখ্য সচিব সাদেক ও আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রেসিডেন্টের অফিসকক্ষে নিয়ে যাই। এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ এসে পৌঁছান। হঠাৎ আরও বুঝলাম, এই নাটকের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তখনো এসে পৌঁছাননি। তিনি হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ। প্রথমে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র প্রেসিডেন্ট এরশাদের হাতে তুলে দিলে প্রেসিডেন্ট তা গ্রহণ করবেন এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন। এরপর তিনি শপথ নেবেন। এটাই এরশাদের বিদায়ের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। মওদুদ আহমদ এসে পৌঁছান আধা ঘণ্টা পর। তাঁর পদত্যাগের বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি না এলে বা পদত্যাগে অসম্মত হলে একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো।

বেলা ২টা ৪০ মিনিটে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এরপর তিনি নিজের পদত্যাগপত্র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের হাতে তুলে দেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেন। পদত্যাগী প্রেসিডেন্টের এটাই ছিল সর্বশেষ দাপ্তরিক কাজ। এখন থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ হলেন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট। ওই অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করছিল। এই মহতী অনুষ্ঠানের আমিও একজন সাক্ষী হয়ে রইলাম। ঘটনার মূল তিন চরিত্র ও আমি ছাড়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্টের মুখ্য সচিব সাদেক, মন্ত্রিপরিষদের সচিব এম কে আনোয়ার, সশস্ত্র বাহিনীর দিক থেকে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল

নূরউদ্দীন খান, নৌবাহিনীর প্রধান রিয়াল অ্যাডমিরাল মোস্তফা এবং বিমানবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার কমোডর আরেফিন (এয়ার ভাইস মার্শাল মমতাজ উদ্দিন তখন সরকারি সফরে পাকিস্তানে ছিলেন)। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে মাত্র ২০ মিনিট সময় লাগে। স্বাভাবিক শান্ত ভাব ও ধীরস্থিরতা বজায় রেখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য, বিরক্তি বা অসন্তুষ্টি লক্ষ করা যায়নি। এ ধরনের অনুষ্ঠানে তিনি সচরাচর যে বিশেষ পোশাক পরতেন, অর্থাৎ গাঢ় রঙের প্রিন্সকোর্ট ও ট্রাউজার, সেদিনও তা-ই পরেন। অনুষ্ঠান শেষে পদত্যাগী প্রেসিডেন্ট কিছু সময় অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একান্ত আলাপ করতে চান। আমরাও তাঁদের রেখে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসি। প্রায় ১০ মিনিট পর প্রেসিডেন্ট এরশাদ রুম ছেড়ে বের হয়ে আসেন। অপেক্ষমাণ গাড়ি পর্যন্ত আমরাও তাঁকে এগিয়ে দিতে যাই। তিনি উপস্থিত সবার সঙ্গে করমর্দন করে গাড়িতে উঠে বসেন। গাড়ি-বারান্দার বাইরে কিছু লোক জমায়েত হন। নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁদের নিরাপদ দূরত্বে রাখেন। তাঁরা প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের কর্মচারী, বিদায়দৃশ্য দেখতে এসেছেন। সাবেক প্রেসিডেন্টের চলে যাওয়ার সময় তাঁরা নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম, জাতীয় পতাকা ও প্রেসিডেন্টের পতাকাবিহীন কালো অ্যাম্বাসেডর গাড়িটি প্রেসিডেন্ট অফিসের মূল ফটক পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাঁর প্রায় নয় বছরের ঘটনাবহুল ও বিতর্কিত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এভাবেই বিদায় নিলেন।

বঙ্গভবনে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মিলনমেলা

প্রেসিডেন্টের দপ্তরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে নিয়ে বঙ্গভবনের পথে রওনা হলাম। রাস্তায় হাজার হাজার লোক হাত নেড়ে ও করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করতে থাকে। অনেকেই প্রেসিডেন্টের লিমোজিনে বসা নতুন প্রেসিডেন্টকে দারুণ ঔৎসুক্য নিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করতে থাকে। এদিকে তখন বঙ্গভবনের মূল ফটকের কাছে জমায়েত হয়েছে শত শত লোক। সন্ধ্যায় সংবর্ধনার জন্য আমন্ত্রিত অতিথিদের বহনকারী গাড়িগুলো লাইন ধরে ভেতরে ঢুকছিল। সবকিছু মিলে হঠাৎ করে এক উৎসবমুখর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যায়। দুই ঘণ্টা আগে আমি যখন বঙ্গভবন ছেড়ে যাই, তখনো ছিল একটা স্বাভাবিক জনশূন্য চেহারা। মূল ফটকে প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের সেনাসদস্যরা নতুন প্রেসিডেন্টকে

অভিবাদন জানান। আরও সোজা বঙ্গভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণের সবচেয়ে সুন্দর সবুজ চত্বরে চলে যাই। সেখানে মঞ্চ পর্যন্ত লাল কার্পেট বিছানো হয়েছে। তিন বাহিনীর প্রধান সেখানে প্রেসিডেন্টকে অভিবাদন জানান। একটি ব্যান্ডদলসহ প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের চৌকস একটা দল সেখানে প্রেসিডেন্টের জন্য অপেক্ষা করছিল। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ মঞ্চে আরোহণ করলে প্যারেড কমান্ডার আনুষ্ঠানিক অভিবাদন জানান এবং সে সময় ব্যান্ডদল বাজায় জাতীয় সংগীত। অভিবাদন গ্রহণ শেষে প্রেসিডেন্ট গার্ড পরিদর্শন করেন। সাধারণ এই অনুষ্ঠানটি শেষ হতে সাত মিনিট সময় লাগে। এরপর তিনি মূল ভবনে প্রেসিডেন্টের অফিসকক্ষে গিয়ে বসেন।

বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ অধিকাংশ অতিথি পৌঁছে যান। অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টি ছাড়া সব রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের প্রথম সারির নেতারা আমন্ত্রিত ছিলেন। বিভিন্ন নেতার সঙ্গী হিসেবে অনামন্ত্রিতও অনেকে চলে আসেন। রাজনৈতিক নেতা ছাড়াও আমন্ত্রিত ছিলেন বেসামরিক প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, প্রতিটি কূটনৈতিক মিশন ও বিভিন্ন করপোরেশনের প্রধান, নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তি, পত্রিকার সম্পাদক, খ্যাতিমান সাংবাদিক এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা। মূল হলঘর, করিডর এবং উত্তরের বারান্দা ভরে যায়। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া নিজ নিজ দলের প্রথম সারির নেতাদের নিয়ে উপস্থিত হন। আমি গাড়ি-বারান্দায় তাঁদের অভ্যর্থনা জানাই। সাফল্যের গর্বভরা অভিব্যক্তি নিয়ে তাঁরা বঙ্গভবনে প্রবেশ করলেন। হলঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা তাঁদের ঘিরে ধরলেন। একটু পরই অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ হলঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পক্ষে ভেতরে প্রবেশ করা একটু কঠিনই হয়ে পড়ল। সব ধরনের প্রটোকল, নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। প্রধান দুই বিরোধী নেত্রী ব্যবধান রক্ষা করে বসে ছিলেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ঘুরে ঘুরে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলেন। জাতির জীবনে এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান।

সরকারের সর্বোচ্চ অবস্থানে রাতারাতি ঘটে গেল এক অভাবিত পরিবর্তন। আজ যেসব রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তাঁদের কাউকে আগে কখনো বঙ্গভবনে দেখিনি। আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন গুটি কতক রাজনীতিবিদ ছাড়া অন্য সব বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে সরকারি দলের এক তিক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বঙ্গভবনের সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করলেও অনেকে আসতেন না। প্রতিপক্ষের সঙ্গে কখনো চোখাচোখি হয়নি,

এমন বহু রাজনীতিবিদের জন্য এটা হয়ে দাঁড়াল একটা গেট টুগেদার অনুষ্ঠান। এখন থেকে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে সদিচ্ছা, সমঝোতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার সূচনা হলো বলে আমার খুব ভালো লাগছিল। উপস্থিত সবার মুখে আনন্দ ও স্বস্তির ভাব। জাতীয় পর্যায়ের অনেক নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ আমারও হলো। অনেককেই সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে সমর্থন করে প্রশংসা করতে দেখলাম। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের বিদায়ের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হয়। কিছু কিছু অতিথি আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। সব অতিথি চলে যাওয়ার পর আমি বঙ্গভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুন্দরভাবে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

ডিসেম্বরের সেই শীতের সন্ধ্যায় আমি মূল ভবন থেকে আমার বাসার দিকে হেঁটেই রওনা হলাম। পাঁচ মিনিটের এই পথের দুইপাশে নানা ধরনের গাছের সারি। তারপর সোনালি লতায় ছাওয়া টানেল। তার ভেতর দিয়ে হেঁটে বাসায় পৌঁছলাম। বঙ্গভবনে রাত্রিকালীন অনুষ্ঠানের পর এটুকু পথ হেঁটে যেতে আমার খুবই ভালো লাগত। যতই ক্লান্তি থাক, ভুলে যেতাম। সহকারী সামরিক সচিব লে. কর্নেল আতিকুর রহমান মুন্সী আমার সঙ্গে থাকতেন। অনেক রাতে সাবেক প্রেসিডেন্টের বঙ্গভবন ছেড়ে যাওয়ার পর ফুটপাত ধরে হেঁটে যাওয়ার কিছু কিছু কথা এখনো মনে পড়ে। আতিক আজকের এই সন্ধ্যায়ও আমার সঙ্গেই আছেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা হতো। মাঝেমধ্যে আমি সাবেক প্রেসিডেন্টের কিছু কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমার তিক্ততা প্রকাশ না করে পারতাম না। আজ এই ফুটপাত ধরে হাঁটার সময়ও আমার বলা কিছু ঘটনার কথা তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। ডিসেম্বর-জানুয়ারির প্রবল শীতের রাতেও সাবেক প্রেসিডেন্টকে কখনো কখনো রাত দেড়টায়ও বঙ্গভবন ছেড়ে যেতে দেখেছি। রাত ১১টার দিকে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষ করার পর তিনি গভীর রাত পর্যন্ত অফিসে থেকে দেশ-বিদেশে টেলিফোনে আলাপ করতেন। এ সময়টা যে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যয় হতো না, তা অজানা ছিল না। সবাই বসে অপেক্ষা করতেন, কখন তিনি অফিস ছাড়বেন! এখন থেকে তেমন পরিস্থিতির অবসান হলো।

বাসায় পৌঁছে একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করলাম। খুব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলাম। তার পরও মনে উৎসাহ, স্বস্তি ও আনন্দের অন্ত নেই। একটু আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করি। কিন্তু কৌতূহলী বন্ধু ও পরিচিতজনদের টেলিফোনের পর টেলিফোন তা ব্যর্থ করে দেয়। এবার অতীতের বহু ঘটনা

ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষ করে সেই দিনটির কথা মনে পড়ে যায়, যেদিন সামরিক সচিবের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রথম বঙ্গভবনে ঢুকেছিলাম। সাবেক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছোট-বড় নানা ঘটনা ও কর্মকাণ্ডের কথা একের পর এক মনে পড়তে থাকে। ফলে ঘুম আর আসে না। অথচ এখন আমি ওই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। এখন আর কোনো ভীতি নেই, কোনো টেনশন নেই, হতাশা বা মনোগত পীড়াবোধ নেই। সহিংস উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হতে পারে, এমন আশঙ্কা মনে ছিল, কিন্তু তা এড়ানো গেছে। একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েও দেশ তার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এর জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকি। আর আন্তরিকভাবে কামনা করতে থাকি, যেন এখন থেকে যোগ্য নেতৃত্ব ও উৎকৃষ্ট গুণাগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সরকার পরিচালনার হাল ধরবেন এবং দেশকে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

একজন বিচারপতির দেশ শাসনের সূচনা

অপদস্থ হওয়ার এক কাহিনি

১৯৮২ সালের ৬ এপ্রিল সন্ধ্যা, দেশে লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদের সামরিক শাসনের চতুর্দশ দিবস। বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সোসাইটির একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন সেরে অফিস থেকে কেবল তাঁর বাসায় ফিরেছেন। সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের (সিএমএলএ) দপ্তর থেকে টেলিফোনে একটা অতি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পেয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে তাঁর বাসায় উপস্থিত হলেন। বার্তাটি হলো, তিনি আর বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান নেই এবং নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে একজন মেজর জেনারেলকে নিযুক্ত করা হয়েছে। রেডিও বাংলাদেশ রাত সাড়ে নয়টার ইংরেজি খবরে ঘোষণা করে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদ রেডক্রস সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে মেজর জেনারেল আবদুল জব্বারকে (অবসরপ্রাপ্ত) নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে 'অবসর' দেওয়া হয়েছে। পরদিন সকালে সিএমএলের জারি করা নির্দেশের একটি ফটোকপি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ হাতে পেলেন। তাতে বলা হয়, 'এতদ্বারা মেজর জেনারেল আবদুল জব্বারকে (অবসরপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির (তখন রেড ক্রিসেন্ট নাম হয়নি) চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে

অবসর দেওয়া হলো।' নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী জেনারেল এরশাদ কেবল আইন, দাপ্তরিক প্রক্রিয়া ও নিয়মকেই অবজ্ঞা করেননি, উচ্চতর সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তির প্রতি শোভন ও মানবিক আচরণগত রীতিকেও উপেক্ষা করলেন। এই ত্রুটিযুক্ত নির্দেশটি যে বিচারপতির জন্য একই সঙ্গে অপমান ও মানসিক যাতনার কারণ হতে পারে, তা বিবেচনায় নেননি তিনি। নির্দেশ অনুযায়ী বিচার বিভাগের চাকরি থেকেও তাঁকে অবসর দেওয়া হলো, অর্থাৎ তিনি আর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও থাকলেন না। অবশ্য পরে সিএমএলের সঙ্গে আলোচনা করে আইনসচিব এ ব্যাপারে এই ব্যাখ্যা দেন যে, রেডক্রস সোসাইটি থেকে তাঁকে অবসর দেওয়া হয়েছে, বিচার বিভাগের পদ থেকে নয়।

তাঁকে অপসারণের নির্দেশের দুই সপ্তাহের মধ্যে জেনেভায় লিগ অব রেডক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির (এলআইসিআরওএস) একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সংগঠনের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের যোগ দেওয়ার কথা ছিল। উল্লেখ্য, তিনি এর আগেই এই অঞ্চলের এলআইসিআরওএসের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। অঞ্চল-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকায় এলআইসিআরওএসের মহাসচিব ব্যক্তিগতভাবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। তাঁর চার বছরের মেয়াদ ১৯৮১ সালের আগস্টে শেষ হলেও তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার তাঁকে পুনর্নিয়োগ করলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে থাকতে সম্মত হয়েছিলেন। জেনারেল এরশাদ কেন এমন অমার্জিত ও অসৌজন্যমূলকভাবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে এই পদ থেকে অপসারণ করেছিলেন, তা কখনো জানা যায়নি। তবে এ ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল। এটা ছিল তাঁর মেধা ও পেশাগত সততার প্রতি একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতস্বরূপ ঘটনা। সাত বছর নয় মাস পর প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ এই সম্মানিত ব্যক্তিকেই বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ পড়ান। এর ১১ মাস পর প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই বিচারপতিকেই দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দিয়ে শপথবাক্য পাঠ করান এবং এর অল্প কয়েক মুহূর্ত পরে তাঁর হাতেই নিজের পদত্যাগপত্র পেশ করতে হয়।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং একজন নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করেন। পরে তিনি যোগ দেন বিচার বিভাগের চাকরিতে। ছোটখাটো গড়নের অনাকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী এই বিচারপতির আধুনিক যুগের কোনো সেলিব্রিটির বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক পদমর্যাদার উপযুক্ত চমক দেখানোর মতো বিশেষ গুণাবলির অভাব থাকা সত্ত্বেও সব রাজনৈতিক দলের মতৈক্যের ভিত্তিতেই তিনি দেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন। অনেকের কাছেই এটা অপ্রত্যাশিত হলেও এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সব গ্রুপের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন। তবে নিত্যদিনের প্রশাসন পরিচালনা এবং সত্যিকার অর্থে একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সফল হবেন কি না, সে ব্যাপারে রাজনৈতিক মহলের ভেতর ও বাইরের অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমি তাঁকে প্রথম দেখি বঙ্গভবনে ১৯৯০ সালের ১৪ জানুয়ারির সন্ধ্যায়, যখন প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। তবে ওই সময়ের একটা ঘটনা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। প্রধান বিচারপতি মোনেম যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন নতুন প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং তাঁকে শপথ করানোর ব্যবস্থাটা যথেষ্ট তাড়াহুড়োর মধ্যে করা হয়েছিল। ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বিদায়ী প্রধান বিচারপতির অবসর গ্রহণের পরদিনই নতুন প্রধান বিচারপতিকে শপথ নিতে হয়। কিন্তু যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই পরের দিনের অপেক্ষা না করে রাতেই বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে শপথ করানো হয়েছিল। অথচ এক মাস পর, অর্থাৎ ১৯৮৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে যখন বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী অবসর নেন, তখন নতুন বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে কোনো তাড়াহুড়ো ছিল না। যদিও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্যে পরবর্তী সিনিয়র ছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। কিন্তু প্রধান বিচারপতি কে হবেন, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দুই সপ্তাহ পার হয়ে যায়। বোঝা যায়, প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে নিয়োগের ব্যাপারে ইচ্ছুক ছিলেন না। সম্ভবত, তাঁর দলের বিজ্ঞতর অংশ বিচার বিভাগের প্রচলিত ধারা ব্যাহত না করে তাঁকেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগের পরামর্শ দেন। তাদের যুক্তি ছিল, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের পদোন্নতি না হলে বিরূপ

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এরশাদ সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হবে।

কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক বিকেলে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে জেনারেল এরশাদের পদত্যাগ এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের ক্ষমতা গ্রহণের চূড়ান্ত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে বড়জোর ২০ মিনিট সময় লেগেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে উভয়েই ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের জীবনের অত্যন্ত কঠিন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করেছিলেন। সারা দেশের দৃষ্টি তখন এই দুজনের দিকে। একজনকে তীব্র ক্ষোভ ও কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখছিলেন সবাই। অন্যজনকে দেখছিলেন তাঁরা তাঁদের উচ্চাশা ও আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের প্রতীক হিসেবে। আমার সৌভাগ্য যে একেবারে কাছে থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের পরবর্তী আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দেখার সুযোগ পেলাম। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের সংকটময় মুহূর্তে এক গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না, ইচ্ছুকও ছিলেন না। তবে আমি অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, এই ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে সাহস, নিজের ওপর সুদৃঢ় আস্থা এবং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের উপযোগী যথেষ্ট প্রশাসনিক বিচক্ষণতা। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনার প্রস্তাবে যখন তিনি সম্মতি দেন, তখন এ দায়িত্ব পালনের জটিলতা সম্পর্কে তিনি অসচেতন ছিলেন না। আমার প্রায়ই মনে হয়, রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের সুবিধার্থে দায়িত্ব চাপানোর জন্য তাঁকে একজন সহজ লোক হিসেবে পেয়েছিলেন, অথচ ওই নেতাদের অনেকেই এ দায়িত্ব পালনে অসমর্থ ছিলেন। সরল প্রকৃতির বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের উচ্চ কর্তব্যবোধ ও দেশপ্রেম তাঁকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দায়িত্ব গ্রহণে প্রেরণা জোগায়। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর সুযোগ্যতার প্রমাণ রাখলেও এ জন্য তাঁকে যথেষ্ট ব্যক্তিগত অস্বাচ্ছন্দ্যের শিকার হতে হয়েছে। আত্মাভিমানে আঘাত লাগার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। নৈতিক গুণাবলির অধিকারী একজন বিচারপতি হিসেবে তাঁর প্রশ্নাতীত সততা ও নিরপেক্ষতা তখন পরীক্ষার সম্মুখীন। দুর্ভাগ্যবশত প্রায়ই তাঁকে ভুল বোঝা হতো এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সমালোচনা ও অশোভন ব্যবহারও সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর প্রতি একশ্রেণীর সংবাদপত্র এবং কিছু রাজনৈতিক নেতার আচরণ শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে

গিয়েছিল। তাঁদের ক্ষোভের কারণ ছিল এই যে, তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত তাঁদের দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থসম্মত হয়নি।

এদিকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই আমি মনে করলাম, আমার উচিত সেনাবাহিনীতে ফিরে যাওয়া। প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনের মেয়াদ তখন প্রায় দুই বছর হতে চলেছে। আগেও উল্লেখ করেছি, সামরিক সচিব পদে নিয়োগে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না। আমি বরাবর অনাবশ্যক, অসংগত ও অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করি। এ ধরনের পদে থাকার পরিণতি সম্পর্কেও আমি সচেতন ছিলাম। কারণ, এখানে প্রায়ই ভুল-বোঝাবুঝি, ঈর্ষা ও তিক্ততা সৃষ্টির যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ যখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর দায়িত্বে অনেকটা স্থিতিশীল হলেন বলে মনে করলাম, তখন আমি সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দীন খানকে অনুরোধ করি তিনি যেন আমাকে সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের সম্মতি নেন। আমার বারবার অনুরোধের পর একদিন আমার উপস্থিতিতেই তিনি বিষয়টি উত্থাপন করেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এতে রাজি না হয়ে তাঁর স্টাফ হিসেবে আমাকে আমার কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। এরপর সামরিক সচিব পদে থেকে যাই। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের অধীনে আমি ১০ মাস কাজ করেছি। ঘনিষ্ঠ সহকারী হিসেবে তাঁর সংস্পর্শে থাকাটা ছিল আমার জন্য আনন্দ ও গর্বের বিষয়। তিনি আমার সর্বাধিক শ্রদ্ধা, পূর্ণ আনুগত্য এবং আস্থা আদায় করে নিতে পেরেছেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ও আশাবাদী মানুষ। তিনি এমনই একজন মানুষ, যাঁকে বিশ্বাস করা যায়, যিনি একটা জাতিকে সাহস জোগাতে পারেন এবং সবার মনে আস্থার সঞ্চার করতে পারেন। তাঁর সমালোচকেরা, যাঁরা নিজেরাই ছিলেন স্বার্থপর. সংকীর্ণমনা ও লোভী প্রকৃতির, তাঁকে তাঁরা দেখেছেন অতি সংকীর্ণ দৃষ্টিতে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি। খ্যাতি, ক্ষমতা কিংবা নিজের প্রচারের ব্যাপারে কোনো বাসনা ছিল না তাঁর। একজন বিচারকের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি তাঁকে দেখেছি; তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন, জাঁকজমক বা ঠাটবাট পরিহার করে চলতেন এবং নিজের যে গুণ নেই, তা নিয়ে কখনো নিজেকে জাহির করতে চাইতেন না। এমনকি তিনি নিজেকে ও নিজের পরিবারের সদস্যদেরও

সামাজিকভাবে গুটিয়ে রেখেছিলেন। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে কম যেতেন। নিজে দৃশ্যমান হতে পারেন, এমন সব অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলতেন। এককালে বিচারকদের জন্য এ ধরনের জীবনাচরণই ছিল পেশাগত রীতির অঙ্গীভূত, যা আজকাল কমই দেখা যায়। অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন খোলা মনের মানুষ, যা বলার সামনাসামনি বলতেন এবং সময় সময় কৌতুক করতেও ভুল করতেন না। বিচারক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতির কথা শুনেছি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। এখন খুব কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁকে কাজ করতে দেখতে পেলাম। দুজন প্রেসিডেন্টের অধীনে কাজ করার যে বিরল সুযোগ আমি পেয়েছি, তাতে করে তাঁদের মধ্যকার পার্থক্যগুলো আমার অবলোকন করার সুযোগ হয়েছিল। একজন জোর করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, আর অন্যজন জাতির প্রয়োজনে গণদাবির ভিত্তিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বহু ক্ষেত্রেই দুজনের মধ্যে পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। তাঁদের অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়ে সরকারের সর্বোচ্চ স্তর থেকে দেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও সামগ্রিক আর্থসামাজিক অবস্থা চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

শপথ গ্রহণের পরপরই বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দ্রুত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে মনোযোগ দেন। বঙ্গভবনের অনুষ্ঠান শেষ করেই প্রধান দুই জোটের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দলীয় দপ্তরে যান। প্রথমে যান ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনে আওয়ামী লীগের অফিসে এবং পরে যান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) অফিসে। ১৯৯০ সালের ৭ ডিসেম্বর সকালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সাভারে যান। ফেরার পথে তিনি মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যায় রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এটাই ছিল তাঁর প্রথম ভাষণ। জাতিকে আশ্বাস দেন, দেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। পরের দিন টুঙ্গিপাড়ায় যান এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও তাঁর সমাধিস্থানে ফাতেহা পাঠ করেন। ওই দিনই ঢাকায় পৌঁছে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থানে যান এবং সেখানেও ফাতেহা পাঠ করেন। এই উভয় স্থানে সেটাই ছিল আমার প্রথম সফর। চেনা-অচেনা বহু জায়গায় আমি সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে গিয়েছি, কিন্তু এ দুই জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। উভয় রাষ্ট্রপতির জীবনাবসান ঘটে চরম

ট্র্যাজিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। কিছুদিন পর একইভাবে তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর সন্তোষের সমাধিস্থানে যান। বাংলাদেশে সমাধিস্থান জিয়ারত এবং সাবেক নেতাদের নাম ও খ্যাতিকে ব্যবহার করাটা রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটা অংশ। যদিও বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাজনীতিবিদ নন এবং কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্যও নন, কিন্তু বিতর্কের উর্ধ্বে থাকার জন্য সম্ভবত তিনি এই রীতি অনুসরণ করেন।

৮ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন সরকারের সচিবদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। নতুন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এটা ছিল তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজ। ২৭ নভেম্বর (১৯৯০) জরুরি অবস্থা জারির পর থেকে সরকারি ও বেসরকারি অফিসগুলোয় কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে, অর্থাৎ ৩ ডিসেম্বর (১৯৯০) থেকে সরকারি, আধা সরকারি অফিস, ব্যাংক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কাজকর্মে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা এবং দ্বিধাগ্রস্ত কর্মকর্তাদের আশ্বস্ত করার জন্য নতুন প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে একটা নীতিনির্দেশক ভাষণদান খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এটা এ জন্যও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যে, বেশ কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তার নামে দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁরা জনরোষের শিকার হন। ক্যাবিনেট সচিব এম কে আনোয়ার অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রায় ৪০ মিনিট ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে তিনি একটা বিষয় পরিষ্কার করতে চান যে, সম্মিলিত বিরোধী জোটগুলোর অনুরোধে তিনি মাত্র অন্তর্বর্তীকালের জন্য প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দেশে একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। নির্বাচনের পর তিনি সংবিধান ও সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। সাংবিধানিক অবশ্যকরণীয় কর্তব্য শেষ করার পর রাষ্ট্রপতি পদে এক দিনও বেশি থাকবেন না। দায়িত্ব পালন শেষ হলে তিনি নিজের মূল কর্মস্থল, অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যাবেন। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সরকার পরিচালনা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি কর্মকর্তাদের সর্বাত্মক সাহায্য কামনা করেন।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণ শেষে কয়েকজন সচিব রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের তখনকার প্রচলিত কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অনেকেই ওই সচিবালয়ের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যক্ত করেন।

তাঁরা বলেন, এ ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মে বাধার সৃষ্টি করছে এবং অবিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছে। আমি লক্ষ করি, ক্যাবিনেট সচিব এম কে আনোয়ার সবশেষে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে এই মতের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জানান। কিন্তু প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের প্রধান অর্থাৎ মুখ্য সচিব সাদেক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চুপচাপ থাকলেন। আমি আশা করছিলাম, তিনি বিদ্যমান ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলবেন। তবে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়ে আলোচনা শেষ করেন, পরে তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ দেবেন।

অতীতে আমি সচিবালয়ের এ ধরনের কিছু কিছু বৈঠকে উপস্থিত থেকেছি। সেখানে সচিব, বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনাররা উপস্থিত থাকতেন। এসব বৈঠকে দেশের প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। রীতি অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট এরশাদ বৈঠকে বক্তব্য দিতেন এবং আলোচনায় অংশ নিতেন। প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের ভূমিকা-সম্পর্কিত বিতর্ক ওই সব বৈঠকেও মাঝেমধ্যে উত্থাপিত হতে দেখেছি। অধিকাংশ সচিবই প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের ভূমিকার বিরুদ্ধে ছিলেন বলেই মনে হতো। একজন বহিরাগত হিসেবে, সাইডলাইনে বসে আমি দেশের আমলাতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেক মজার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় বিডিআরে কর্মরত থাকাকালে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশাসনের সংস্পর্শে থেকে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। পরবর্তী সময়েও উচ্চপর্যায়ের বেসামরিক প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করার কিছু কিছু সুযোগ আমার হয়। এখন সামরিক সচিব হিসেবে বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেলাম। আমি লক্ষ করেছি, অধিকাংশ সিনিয়র কর্মকর্তাই প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের ভূমিকার সমালোচনা করতেন। কিন্তু পরে যিনিই ওই সচিবালয়ে নিযুক্তি পেতেন, তখন তিনি আবার দৃঢ়ভাবে এর সমর্থন করতেন। তবে আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হলো, সরকারপদ্ধতি সংসদীয় কিংবা রাষ্ট্রপতিশাসিত হোক, যে দেশে এক ব্যক্তিই সর্বেসর্বা ও তাঁর হাতেই পুরো কর্তৃত্ব, সেখানে তাঁকে ঘিরে একটা পরাক্রমশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ও অনিবার্য। আমাদের দেশে 'বসের' হুকুম ছাড়া ভালোমন্দ কিছুই নড়ে না। 'বস' সব সময়ই নিজের চারপাশে 'জি হুজুর' ধরনের লোক পছন্দ করেন, যাঁর ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা কখনো তাঁর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না এবং যিনি নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সম্ভবত প্রশাসনের সবকিছুই কেন্দ্রীকরণ করেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নয়, জরুরি

কিংবা জরুরি নয়, এমন প্রায় সব ফাইলই প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের পাঁচজন ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) ও মুখ্য সচিবের মাধ্যমে বাছাই হতো। ফাইল পৌঁছাতে দেরি হওয়া, ফেরত পাঠানো এবং হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে মন্ত্রী ও সচিবদের অসন্তোষের ব্যাপারটি প্রায়ই লক্ষ করেছি। এ ব্যাপারে সময়ে সময়ে কোনো কোনো মন্ত্রী ও সচিব আমার সাহায্য চাইতেন। অন্যদিকে কয়েকজন মন্ত্রী ও সচিবকে সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য ফাইল হাতে নিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছেও যেতে দেখেছি। এর উল্টো পিঠের কাহিনিও শুনেছি। কোনো কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুরো দায়িত্ব মন্ত্রীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলে কেউ কেউ অনেক সময় অসংগত, ধারাবাহিকতাহীন ও অন্যায়ধর্মী সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছেন। তবে একটা বিষয় আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হলো, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এ ধরনের রীতি তখনই চালু হয়, যখন উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় না এবং বিশ্বাস করা হয় না। আমাদের স্বাধীনতার শুরু থেকেই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নীতি চলে আসছে এবং তেমন কোনো পরিবর্তন বা পরিমার্জন ছাড়া ওই ধারা এখনো অব্যাহত আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জেনারেল জিয়াউর রহমানের মতো দুই প্রেসিডেন্ট বড় একটা রাখঢাক না করেই রাষ্ট্র পরিচালনায় এই রীতি অনুসরণ করেছেন। জেনারেল এরশাদও তা-ই করেছেন, তবে আরও বেশি কার্যকরভাবে। বেশির ভাগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার অদম্য ইচ্ছেটা কেবল শীর্ষ নেতার নয়, অধস্তনরাও এ ধরনের ব্যবস্থা মেনে নেন তাঁদের সুবিধার কথা ভেবে। শীর্ষ নেতার কাছ থেকে সিদ্ধান্তটা নিতে পারলে নিজেদের জন্য তা নিরাপদ ও স্বস্তিকর হয়। তা ছাড়া তিনি প্রেসিডেন্ট হন বা প্রধানমন্ত্রী হোন বা অন্য স্তরের যিনিই হন, অধস্তনরা যদি কথায় কথায় বা যত বেশি কাজে তাঁদের বসের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন (আসলে অনুমতি), তাহলে তিনিও তৃপ্তি বোধ করেন এবং ওই সব অধস্তনকে তিনি বেশি অনুগত ও বিশ্বস্ত বলে মনে করতে পারেন।

রাজনীতিতে এরশাদের পুনঃপ্রবেশ ও বিবিসিতে বিবৃতি

অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রথম দুই দিন ব্যস্ততার মধ্যে থাকায় ক্যান্টনমেন্টের কারও সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি। ৮ ডিসেম্বর রাতে সাবেক প্রেসিডেন্টের অপতৎপরতা-সম্পর্কিত কিছু খবর শুনতে পেলাম। ক্যান্টনমেন্টে তাঁকে ঘিরে নানা গুজব। বুঝলাম, তিনি অলস বসে

নেই। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছেন এবং কোণঠাসা অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছেন। তিনি ও তাঁর পার্টির নেতা-কর্মীরা সবাই মুক্ত, তখন পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে অনেকেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। তিনি যে দ্রুতই তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবেন, কিছু অপ্রত্যাশিতও ছিল না। বিরোধী জোটের নেতারা যখন বিজয় আনন্দে ব্যস্ত এবং অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট প্রশাসনের বিভিন্ন জটিলতাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে চলেছেন, সেই অবসরে সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা পুনর্দখলের লক্ষ্যে কিছু একটা করার বেশ সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। প্রেসিডেন্ট পদ হারানোর দিন থেকে প্রকৃত অর্থে তিনি কর্মহীন। সেনাবাহিনীর একটা কন্টিনজেন্ট তাঁর বাড়ির পাহারায় নিয়োজিত ছিল। আইনি দিক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বা অন্তরীণও রাখা হয়নি। সেনাবাহিনীর সেন্ট্রিরা যেমন তাঁকে বাড়ির বাইরে যাওয়ায় বাধা দিতে পারেন না, তেমনি তাঁর সঙ্গে বা পরিবারের কারও সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে তাঁকেও বাধা দিতে পারেন না। তখন ওই বাসায় সেটেলাইট টেলিফোন কমিউনিকেশন সিস্টেমসহ সব টেলিফোন সচল ছিল। টিঅ্যান্ডটি নেটওয়ার্কের মাধ্যম ছাড়াই তিনি দেশের ভেতরে-বাইরে যেকোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে পারছিলেন।

সেনাবাহিনী সূত্রেই জানতে পারি, তিনি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে চলেছেন। এ ছাড়া দলের নেতা-কর্মী, বন্ধুবান্ধব ও আস্থাভাজন বেসামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গেও টেলিফোনে সংযোগ রক্ষা করে যাচ্ছেন। এ ধরনের তৎপরতা যে কত বিপজ্জনক হতে পারে, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবে তা অপ্রত্যাশিত ছিল না। যাঁরা তাঁকে ভালোভাবে জানেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন, তিনি হারানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে দেরি করবেন না। জেনারেল এরশাদ, তাঁর ঘনিষ্ঠজন ও অনুসারীরা ভালোভাবেই জানতেন, কী ভবিষ্যৎ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। কাজেই স্বল্প মেয়াদের জন্য হলেও যেকোনো উপায়ে ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা করাটাই তাঁর বা তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। অন্যদিকে রাজনীতিবিদ, ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার বিদ্যমান প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা এবং আইনের ফাঁকফোকর সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন ছিলেন। একটা সরকার যদি সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় নিয়মাবলি অনুসরণ করে, তাহলে ওই ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনা কোনো

অভিযোগের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সহজ নয়। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বিচার বিভাগের লোক হওয়ায় আইনি দিক যথাযথভাবে বিবেচনায় না নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে যাবেন না। জেনারেল এরশাদ ও দলীয় নেতারা জানতেন, সরকারের পক্ষে তাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত অভিযোগ আনা সম্ভব হবে না। কাজেই অতি দ্রুত ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ঢাকা সেনানিবাসে তখন গুজব, উত্তেজনা ও আতঙ্কজনক খবরের ছড়াছড়ি। এই অবস্থা আমাকে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান-পরবর্তী ঢাকার পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

রাতে সেনাপ্রধানের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বললাম। তিনি আমাকে যা বললেন, তা শুনে আরও চিন্তিত হলাম। মনে হলো, যেকোনো সময় মারাত্মক ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কোনো ঘটনার সূচনা হতে পারে। তবে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, সম্ভাব্য সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরদিন সকালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার জন্য সেনাপ্রধানকে অনুরোধ করলাম। তিনি সম্মত হওয়ার পর, পরের দিন অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর থেকে ঢাকার বাইরে, ক্যান্টনমেন্টগুলোয় তাঁর সফর শুরু হচ্ছে। তবে সফর সংক্ষিপ্ত করে যত দ্রুত সম্ভব অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে তিনি রাজি হলেন।

৯ ডিসেম্বর সকালে পৌঁছে আমি সেনাপ্রধানকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার আগেই অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের চলমান অবস্থা সম্পর্কে জানানোর অনুরোধ করি। কারণ, রাতে আভাস পেলাম, জেনারেল এরশাদ শিগগিরই তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করে বিবিসিতে একটা বিবৃতি দেবেন। বিষয়টি অতিসত্বর অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে জানানো একান্ত প্রয়োজন। কুমিল্লার উদ্দেশে যাত্রা বিলম্ব করে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেনাপ্রধান প্রেসিডেন্টের দপ্তরে চলে আসেন। তিনি জেনারেল এরশাদের সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি প্রদানের পরিকল্পনার বিষয়টি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে জানালেন। এ খবরে যে আবারও রাজনৈতিক বিক্ষোভের আশঙ্কা রয়েছে, তা বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে বেশ চিন্তিত করে তোলে। সাবেক প্রেসিডেন্ট এত শিগগির রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করবেন, এটা শুনলে রাজনৈতিক দলগুলো ও তাদের কর্মীরা বিশেষভাবে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য উত্তেজনায় ফেটে পড়বেন এবং নিশ্চিতভাবেই তাঁরা সহিংস হয়ে উঠবেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আমাকে

সেনাভবনে গিয়ে বিদেশি পত্রিকা বা রেডিওতে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বিবৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদকে অনুরোধ করতে বললেন। এদিকে আমি দপ্তরে এসে চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গেই সাবেক প্রেসিডেন্টের টেলিফোন পেলাম। তিনি বঙ্গভবন থেকে খাবারদাবারের আয়োজন বিষয়ে কিছু বলার জন্য আমাকে টেলিফোন করলেন। দ্বিধা বা বিলম্ব না করে বিবিসিতে তিনি যে বিবৃতি দিতে যাচ্ছেন, সে প্রসঙ্গে আমি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আমাকে যা বলতে বলেছেন, তা তাঁকে জানালাম। বিশেষ করে জানালাম, যত দিন তিনি ক্যান্টনমেন্টে আছেন, তত দিন যেন কোনো রাজনৈতিক বিবৃতি না দেন। আমার কথা শুনে জেনারেল এরশাদ রেগে গেলেন। বললেন, তিনি একটা রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান, দলের পক্ষে কথা বলার রাজনৈতিক অধিকার তাঁর আছে, রাজনীতি করার অধিকার এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য দলীয় লোকদের নির্দেশদানের অধিকার তাঁর আছে। আমি তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললাম, সক্রিয় রাজনীতি করার সব অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে, তবে এ সময় অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের পরামর্শ তাঁর শোনা উচিত। জবাবে তিনি বললেন, সাধারণ নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

আমি ভেবেছিলাম, তাঁর ও তাঁর দলের প্রতি রাজনৈতিক বিরোধিতা যখন চরম আকার ধারণ করেছে, তখন অন্তত কিছুদিনের জন্য শান্ত থেকে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন। কিন্তু তাঁকে নিজের শক্তি ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে খুবই আস্থাশীল মনে হলো। কথা শেষ করার আগে তাঁকে গণমাধ্যমে রাজনৈতিক বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য আবারও অনুরোধ করি। তাঁকে আরও মনে করিয়ে দিই, এর ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবার জটিল হয়ে পড়বে এবং তাঁর জন্য তা অপ্রীতিকর কিছু বয়ে আনতে পারে। মনে হলো, তিনি আমার কথা বুঝতে পারলেন।

ওই দিন সন্ধ্যায় বিবিসির বাংলা খবরে বলা হলো, সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদ রাজনীতিতে ফিরে আসছেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে নেতৃত্ব দেবেন। মনে হয়েছিল, আমার কথা শোনার পর তিনি কোনো বিবৃতি দেবেন না। আমার ধারণা আবারও ভুল প্রমাণিত হলো। আমি তাঁর আত্মবিরোধী ও দ্রুত পরিবর্তনশীল মনের ধারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি। এমন অপমানজনক ক্ষমতাচ্যুতির পরও তিনি নিজের অবস্থানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা সম্ভবত বুঝিয়েছেন, রাজনৈতিক সক্রিয়তা প্রদর্শনের মাধ্যমেই তিনি তাঁর

বিরোধীদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। অতএব, দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর ঝটপট উপস্থিতি দেখাতে হবে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তিনি নিজের জন্য আরও বেশি ঝামেলা বয়ে আনছেন এবং নিজের জন্য ভয়ানক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন। সব ঘটনার তিনিই মূল নায়ক, তিনিই সব ঘৃণা-বিদ্বেষের কেন্দ্রবিন্দু। আমি ভেবে পাই না, যাঁর বিরুদ্ধে এত সব অভিযোগ, যাঁর রাজনৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে, তিনি এত শিগগির ধসে পড়া শক্তি প্রদর্শনের সাহস পাচ্ছেন কেমন করে! বোঝাই যাচ্ছে, উপদেষ্টাদের পরামর্শেই তিনি এই পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁরা তাঁর জন্য নয়, বরং নিজেদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তাঁকে আরও ব্যবহার করতে চাইছেন। এরশাদ ছাড়া জাতীয় পার্টি ও নেতাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। তবে নিষ্ক্রিয় থাকার পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া অব্যাহত রাখা এবং বিরোধী শিবিরের আক্রমণের চাপ মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নীতিগতভাবে তিনি ঠিক কাজই করেছেন। কিন্তু রাজনীতিতে এরশাদের পুনরায় যোগদান এবং আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত বিবিসির খবরে সব রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

ক্ষমতাচ্যুতির মাত্র তিন দিনের মধ্যে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর পুনরাবির্ভাবের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সব মহল থেকে তাঁকে জেলে পাঠানোর দাবি তোলা হলো। সর্বদলীয় ছাত্রসমাজ দুই দিনের মধ্যে তাঁকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বহিষ্কার করার জন্য সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট দাবি জানায়। সময়মতো সরকার দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে তাঁকে সেখান থেকে বের করার জন্য মিছিল করে ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ করার হুমকিও দেওয়া হয়। এরশাদবিরোধী মনোভাব যখন তীব্র ও জ্বলন্ত, তখন এমন ধরনের প্রতিক্রিয়া অপ্রত্যাশিত ছিল না। হয়তো জেনারেল এরশাদ তাঁর ঘনিষ্ঠ চক্র ও পার্টির নেতাদের প্ররোচনায় জনমত যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সাবেক প্রেসিডেন্টকে নিয়ে এমনিতেই বিব্রতকর অবস্থায় ছিলেন। এখন তিনি আরও সমস্যায় পড়ে গেলেন। কয়েক দিন ধরে জেনারেল এরশাদকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরানোর ব্যাপারে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু এখন সাবেক প্রেসিডেন্ট নিজেই একটা অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁকে বরং সাহায্য করলেন।

১০ ডিসেম্বর সকালে আমি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর দপ্তরে যাই। এদিন পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় রাজনীতিতে এরশাদের পুনরাবির্ভাব

বিষয়ে হেডিংসহ প্রচুর পার্শ্বখবর দেখতে পাই। এ ধরনের ঘটনার মুখে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট খুবই বিরক্ত হলেন। এরই মধ্যে বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের প্রতিক্রিয়া তাঁকে জানান। সবাই তাঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরার দাবি জানান। সকাল ১০টা নাগাদ নগরের বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ ও মিছিল শুরু হয়ে যায়। ১১টা ১৫ মিনিটে সাবেক প্রেসিডেন্ট আমাকে টেলিফোন করেন। তাঁর বিরুদ্ধে বের হওয়া মিছিল ও আন্দোলন চাঙা হয়ে ওঠার জন্য আমার কাছে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর চাপ, ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে গোলযোগ ও উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টির আশঙ্কা এবং দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদকে অবিলম্বে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরানো যে খুবই জরুরি, সেটা বিচারপতি সাহাবুদ্দীন দ্রুতই উপলব্ধি করেন। ওই দিন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় বিষয়টি আলোচনার পর তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তাঁর পক্ষে অবশ্য এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা বেশ কঠিনই হয়েছিল। কিন্তু জনস্বার্থ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে জেনারেল এরশাদকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরিয়ে অন্তরীণ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি যে এ ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তার কারণও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি মনে করতেন, যিনি মাত্র চার দিন আগেও দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তাঁকে জেলে নেওয়াটা শোভনীয় হবে না। সামাজিক ও মানবিক দিক বিবেচনার পাশাপাশি তিনি বিদেশি রাষ্ট্রের চোখে আমাদের দেশের সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি নিয়েও ভেবেছেন। যা-ই হোক, জেনারেল এরশাদকে পরের দিন রাতে, অর্থাৎ ১১ ডিসেম্বর (১৯৯০) ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরানোর ব্যবস্থা করতে স্বরাষ্ট্রসচিবকে নির্দেশ দেওয়া হলো। সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারকে সরিয়ে নেওয়ার কাজটি সহজ ছিল না। এর সঙ্গে জড়িত ছিল বহু ধরনের কার্যক্রম, যা ছিল বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিছু আইনি জটিল প্রশ্নও এ ক্ষেত্রে দেখা দিল। জেনারেল এরশাদকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য যত দিন সেনাবাহিনীর হেফাজতে রাখা হয়েছে, তত দিন আইনত ডিটেনশনের প্রশ্ন ওঠেনি। এখন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হলে বা ডিটেনশনে পাঠাতে হলে আইনানুগ নির্দেশ তৈরি বা জারি করতে হবে। তাঁকে যদি জেলে রাখা না হয়, তাহলে তাঁর জন্য একটা উপযুক্ত বাড়ি খুঁজতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ-

সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। গুলশানে সরকারের একটি খালি বাড়ি এ জন্য বাছাই করা হয়। কিন্তু সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারকে অন্তরীণ রাখতে হলে বাড়িটিকে উপযোগী করে তুলতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থাগুলোর সম্মিলিত প্রয়াস সত্ত্বেও ১১ ডিসেম্বর রাতের মধ্যে বাড়িটিকে উপযোগী করা সম্ভব হলো না।

এদিকে যখন সাবেক প্রেসিডেন্টকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরানোর প্রস্তুতি চলছে, তখন ১১ ডিসেম্বর (১৯৯০) সকালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সেনা সদর দপ্তরে তিন বাহিনীর মাঝারি ও সিনিয়র পর্যায়ের অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হন। ক্যান্টনমেন্টে এটা ছিল তাঁর প্রথম গমন। তিনি অফিসারদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। ক্ষমতার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন। শৃঙ্খলা ও উচ্চমানের দক্ষতা বজায় রাখারও আহ্বান জানান তিনি। দেশে একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তিনি সব বাহিনীর সদস্যদের সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানান। পরের দিন, অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর (১৯৯০) সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রী বেগম রওশন এরশাদকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে গুলশানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এরশাদের পরিবারকে তাঁদের সরকারি বাসভবন থেকে সরানোর সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত হয়ে পড়ে। তা হলো রান্নাঘর থেকে ড্রয়িংরুম বা অফিস রুম পর্যন্ত জিনিসপত্র। এসব কিছুর হিসাব-নিকাশ করা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা জরুরি হয়ে পড়ে। এরশাদের পরিবার ওই স্থান ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো বাড়ি ও প্রতিটি রুম সিলগালা করে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১২ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে এরশাদ ও তাঁর পরিবারকে সেনাভবন থেকে সরিয়ে গুলশানের সরকারি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন ও আমাদের আমলাতন্ত্র

আমাদের প্রশাসনযন্ত্রের আসল চেহারা বুঝে ফেলতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের পক্ষে বেশি সময় লাগেনি। তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাজ শুরু করার দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন তিনি বেশ বিরক্তিকর অবস্থায় আছেন বলে মনে হলো। মন্ত্রণালয়ের সচিবেরা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে কী রকম ব্যস্ত রাখছিলেন, সেটা লক্ষ করছিলাম। অবশ্য সচিবেরাও অসহায় ছিলেন। কারণ, রাজনৈতিক বিক্ষোভ-আন্দোলন ইত্যাদির কারণে প্রায় এক মাস যাবৎ মন্ত্রণালয়গুলো স্বাভাবিক দাপ্তরিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে।

এরশাদবিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে, বলতে গেলে সব ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। ফলে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বহু ফাইল আটকে ছিল। প্রয়োজন ছিল দ্রুত সেগুলো ছেড়ে দেওয়ার। তা ছাড়া প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার ধারা অব্যাহত ছিল। কাজেই অতীতের সব চাপ তখন তাঁর ওপর এবং টেবিল থেকে স্তূপীকৃত ফাইল কমানোর দায়িত্বও ছিল তাঁর। এ রকম অবস্থায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তখন সব ধরনের পুঞ্জীভূত কর্মকাণ্ডের ক্রমাগত চাপের সম্মুখীন ছিলেন। সরকারের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজকর্ম নির্বাহ করার পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়েও তাঁকে মনোযোগ দিতে হচ্ছিল। ফলে বহুবিধ সমস্যা ও জটিলতার চাপ তাঁর ওপর এসে পড়তে থাকে।

প্রেসিডেন্টের দিনের কার্যসূচি কেবল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁকে আরও বহু ধরনের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা হয়। এসবের মধ্যে কখনো যৌথভাবে, কখনো এককভাবে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া, বিভিন্ন সংগঠন, ইউনিয়ন ও পেশাজীবী গ্রুপ ইত্যাদির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মতো ব্যাপারও ছিল। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হতো তাঁকে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের ওই তপ্ত ও কণ্টকময় আসনে বসার পর তাঁর অবস্থাটা আমি ভালোভাবে টের পাচ্ছিলাম।

ওই সময় একদিন মনের অবস্থা আঁচ করতে পেরে কিছুটা টেনশনমুক্ত করতে তাঁর অফিসে যাই। তিনি তাঁর অপকর্মের জন্য জেনারেল এরশাদকে শুধু দোষারোপ করাই নয়, প্রেসিডেন্টের পদটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার জন্যও আক্ষেপ করছিলেন। বললেন, আইয়ুব খান যেমন ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দেন, সে রকম এরশাদ কেন নূরউদ্দীনের হাতে ক্ষমতা দিলেন না? কেন তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন? এরশাদ সবখানে এবং সবকিছু লেজেগোবরে করে ফেলেছেন। আর এখন তাঁর তৈরি সব জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হচ্ছে তাঁকে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নয় বছর ধরে এরশাদ এই প্রশাসনকে নিয়ে কী করেছেন! এই পচে যাওয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে কীভাবে তিনি পরিচালনা করেছেন! প্রকৃত অর্থে সে সময় সবকিছুই তালগোল পাকানো অবস্থাতেই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি অবশ্য বুঝতে পারছিলাম, তার এই মনোভাব বা খেদোক্তি সাময়িক এবং ঠিক হতে বেশি সময় লাগবে না। মন্ত্রণালয়ের সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ঘন ঘন আসা-যাওয়া বেশ লক্ষণীয় ছিল। তাঁরা তুচ্ছ বিষয় থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ও পরস্পরবিরোধী পরামর্শ দিতে আসতেন। দু-একটা বিষয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কয়েকজন সচিবের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করতে বাধ্য হন। আমি বললাম, তিনি যা দেখছেন তা সমুদ্রে ভাসমান তুষারখণ্ডের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। যা দেখছেন, তা প্রশাসনের সামান্য অংশ মাত্র। শিগগিরই তিনি আমাদের আমলাতন্ত্রের আসল চেহারা দেখতে শুরু করেন। ওই সময়টায় আসলে রাজনৈতিক কারণে আমাদের আমলাতন্ত্রের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছিল। চলমান রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের সিনিয়র আমলাদের যথেষ্ট ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিক্ষোভও অব্যাহত ছিল। তাঁদের চাকরিচ্যুত করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও উঠছিল ক্রমাগত।

জেনারেল এরশাদ ও বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের শাসনামলে আমি সরকারের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনের মজার আচরণ লক্ষ করেছি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমলা (সামরিক ও বেসামরিক), মন্ত্রী, সাংসদ ও রাজনৈতিক নেতা। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ যখন হঠাৎ ক্ষমতার উচ্চাসনে বসলেন, তখন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে যে শুধু জমানো ফাইল ছাড়াতে যেতেন, তা নয়। আসলে এর মাধ্যমে নতুন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার এবং সুবিধাজনক মুহূর্ত খুঁজে নিজের স্বার্থ হাসিল করার একটা সুযোগ নেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। কোনো না কোনো উপায়ে ন্যায্য বা অন্যায্য যেভাবেই হোক, উচ্চতর পদ ও সুযোগ-সুবিধা হাসিলের একধরনের অশালীন প্রতিযোগিতা চলছিল তখন। একে অন্যকে জব্দ করা বা দোষারোপ করার চেষ্টাও কম চলত না। একজন সিনিয়র সচিব অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর পূর্ব সম্পর্ক এবং তখনকার পদাধিকারগত ঘনিষ্ঠতার পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেন। হঠাৎ করেই তিনি অতিমাত্রায় অনুগত এবং কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর অব্যাহত চাপের মুখে তিনি বেশি দিন টিকে থাকতে পারলেন না। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁকে চাকরিচ্যুত করতে বাধ্য হলেন।

তিন সপ্তাহের মধ্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে তাঁর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। তিনি খুব দ্রুতই নতুন দায়িত্বগত নানা বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে সক্ষম হন, যা সাধারণত কোনো নব-অধিষ্ঠিত কারও জন্য অনেক বেশি সময় নিয়ে থাকে। তিনি জানতেন, তাঁকে দ্রুত চলতে হবে। সীমিত সময়ের মধ্যে অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তিনি আরও জানতেন, অল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় এলেও তাঁর কাছে জাতির অনেক

বেশি প্রত্যাশা। কিছুদিনের মধ্যেই অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জাতীয় পার্টিসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতা, বিভিন্ন ছাত্র, শ্রমিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আলোচনা করেন এবং তাঁদের কথা শোনেন।

অন্যদিকে দুটি প্রধান রাজনৈতিক গ্রুপের প্রতিনিধিত্বকারী তাঁর উপদেষ্টারা সাধ্যমতো তাঁকে সহায়তা করতে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কিছু বিতর্কিত ব্যক্তিকে অপসারণ ও তাদের শূন্যপদে নতুন করে লোক নিয়োগ করা হয়। প্রশাসনের উচ্চ পদগুলোও নিয়োগ ও বদলির মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়। এদিকে আরও কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করার দাবি অব্যাহত থাকে। কিন্তু অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন। তিনি বুঝতেন, প্রশাসনে বেশি ও ঘন ঘন নিয়োগ-বদলির ফলে জটিলতা সৃষ্টি হবে। এরই মধ্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় এবং নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৯১) জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আবদুর রউফ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর আগে বিচারপতি মসউদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। জেনারেল এরশাদের সময়কার বিতর্কিত দুটি নির্বাচনই তাঁর অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সমালোচিত হলেও সব দোষই তাঁর প্রাপ্য ছিল না। জেনারেল এরশাদ ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর জায়গায় বিচারপতি সুলতান হোসেনকে নিয়োগ দিলেও তাঁর অধীনে কোনো নির্বাচন হয়নি।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচন পরিচালনার প্রস্তুতি

বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ বাতিল প্রসঙ্গ

সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতনের পর বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিলের দাবি উঠেছিল দলমত-নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক মহলের তরফ থেকে। ১৯৭৪ সালে এই আইন জারি হওয়ার পর থেকে এর ব্যবহার, অপব্যবহার ও ভালোমন্দের দিকে কিছুটা মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। এই আইন যখন বলবৎ হয়, তখন আমি বিডিআরে কর্মরত ছিলাম এবং চোরাচালান দমনের ক্ষেত্রে এর যথার্থ কার্যকারিতা লক্ষ করেছি। বিগত বছরগুলোয় এবং সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ আমি দেখেছি। পাশাপাশি এর অপব্যবহারের অনেক ঘটনার কথাও শুনেছি। কিন্তু আমি মনে করি, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো একটা আইন থাকা অপরিহার্য। এর অধিকাংশ ধারাই প্রয়োজনীয়। এর সুনির্দিষ্ট কিছু ধারা যথাযথভাবে সংশোধিত হতে পারে। ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার এই আইন জারি করে। কিন্তু পরবর্তী কোনো সরকার এর পরিবর্তন কিংবা বাতিলের উদ্যোগ নেয়নি। বরং তারা জনস্বার্থে এর সঠিক ব্যবহারের পরিবর্তে অপব্যবহারের দিকেই বেশি মনোযোগী ছিল। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও পরবর্তীকালে জেনারেল এরশাদ তাঁদের নিজস্ব দল গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বাগে আনার কাজে এবং ক্ষমতার দলীয়করণ ও সংহতকরণে এই আইনকে ব্যবহার করেছেন। আইন প্রয়োগকারী কিছু

সংস্থা কর্তৃক এই আইনের বিধানের অপব্যবহারের দিকটা যত সমালোচিত হয়েছে বা হচ্ছে, সেই তুলনায় এর সদ্ব্যবহারের দিকটা খুব কমই জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ওই সময় বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্ভবত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি সব মহল থেকেই নানা অভিযোগে সাবেক প্রেসিডেন্টের সহযোগী ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের গ্রেপ্তার এবং তাঁদের শাস্তিদানের জন্য প্রবল চাপের সম্মুখীন হন। অন্যদিকে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে পেশাদার অপরাধী ও দুষ্কৃতকারী শ্রেণীর লোকদের মোকাবিলা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং, জাতীয় স্বার্থে ও জননিরাপত্তার খাতিরেই সাবেক প্রেসিডেন্ট, তাঁর স্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের কিছু সদস্য ও দুষ্কৃতকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের প্রয়োজন দেখা দেয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আইনের ধারার যথাযথ সমর্থন না পাওয়া গেলে এ ধরনের গ্রেপ্তারে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সম্মত হতেন বলে মনে হয় না। এদিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট যেদিন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, সেদিন একটা মজার ঘটনা ঘটে। ৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) সকালে বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করে তিনি একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। জেনারেল এরশাদের দিক থেকে এটা ছিল খুবই চতুর একটা পদক্ষেপ। তিনি জানতেন, বিশেষ ক্ষমতা আইনের ব্যবহার করা ছাড়া তাঁকে বা তাঁর সহযোগীদের দ্রুত গ্রেপ্তার কিংবা অন্তরীণের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অন্য কোনো আইনের উপযুক্ত ধারা সরকারের হাতে নেই। সাবেক প্রেসিডেন্টের তাড়াহুড়ো করে জারি করা ওই অর্ডিন্যান্সটি মোটেই আইনসিদ্ধ ছিল না। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে অর্ডিন্যান্সটি প্রস্তুত করা হয়। একটা সাদা কাগজে কোনো সিরিয়াল নম্বর না দিয়ে সঠিক আইনের উল্লেখ ছাড়াই এটা জারি করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে আইনটি বাতিল করা হয়, সেটাকে '১৯৭৪-এর ১২ নং আইন' নামে উল্লেখ করা হয়। আসলে ওই আইনটি ছিল সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণে যাওয়ার আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত, ছিল না বিশেষ ক্ষমতা জাতীয় আইন। বিশেষ ক্ষমতা আইন হচ্ছে '১৯৭৪ সালের ১৪ নং আইন'। দ্বিতীয়ত, সরকারি গেজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো আইন বা অর্ডিন্যান্স বৈধতা লাভ করে না। অর্ডিন্যান্সটির সরকারি গেজেট প্রকাশিত হয়নি। সাবেক প্রেসিডেন্ট তাঁর পদত্যাগের মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে ৬ ডিসেম্বর সকালে এটি স্বাক্ষর করেন। তড়িঘড়ি করে তাঁর নিজের ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে যাতে প্রয়োগ করা

না যায়, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য থেকেই তড়িঘড়ি করে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের জন্য শেষ মুহূর্তে জারি করেছিলেন এই 'অর্ডিন্যান্স'। কিন্তু সেটা কোনো কাজে এল না। পরে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনেই তাঁর ডিটেনশনের ব্যবস্থা করা হয়।

পরবর্তী সময়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পত্রিকা ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ ক্ষমতা আইনের ধারাগুলো সংশোধনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ওই ধারাগুলো বাতিল করে দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে আসছিল দেশের প্রতিটি মহল। এটা ছিল তাদের দীর্ঘদিনের দাবি। ভারত ও অন্যান্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সংশ্লিষ্ট আইনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত এই জনপ্রিয় দাবি পূরণের উপায় বের করার জন্য বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সরকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মাহমুদুর রহমানের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পথে সব বাধা দূর করতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিলেন। সুষ্ঠ সব সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেই তিনি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক বিধিবদ্ধ সব আইন সংশোধন করার ব্যাপারে সচেষ্ট হন। ১৯৯১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ নির্বাচনের মাত্র ১৬ দিন আগে কমিটি সুপারিশগুলো পেশ করে। কমিটির এই সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সংশোধন করার জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট অর্ডিন্যান্স জারি করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রস্তাবিত পদক্ষেপকে কার্যকর করার জন্য অন্তত ১০টি আইন ও অর্ডিন্যান্স সংশোধন করা হয়। ১৬ দিনের মধ্যে নতুন অর্ডিন্যান্স জারি এবং সরকারি গেজেট প্রকাশের কাজ শেষ হয়। অর্ডিন্যান্সগুলোর মধ্যে ছিল বিশেষ ক্ষমতা আইন, প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স, প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড ও পেনাল কোড। আমার মনে হয় না, কোনো রাজনৈতিক সরকার এ ধরনের জটিল সব সংস্কার বা সংশোধনের জন্য এত দ্রুত অগ্রসর হতে পারত।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচন

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা এবং নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের মধ্য দিয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির ব্যাপারে পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নির্বাচনী কর্মকর্তা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের

কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা এবং তিন সার্ভিসের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিনি কয়েক দফা বৈঠক করেন। অবাধ, নিরপেক্ষ ও ঝামেলামুক্ত একটা নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি গ্রহণ করেন বেশ কিছু পদক্ষেপ। এর মধ্যে ছিল নির্বাচনী আইন সংশোধন এবং অবৈধ অস্ত্রধারী ও নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনকারীদের কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থামূলক অর্ডিন্যান্স জারি। অতি দ্রুত অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান শুরু করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়। হাবভাবে দেশে সত্যিকার অর্থে একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রায় অসম্ভব মনে হলেও বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শুরু থেকেই তাঁর এই উদ্দেশ্য-সহায়ক পদক্ষেপগুলো সফল করার জন্য মনেপ্রাণে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। নির্বাচনের নিরপেক্ষ আয়োজনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এমন বহু বিষয় নির্বাচনী কালচার হিসেবে আমাদের দেশে প্রচলিত। অথচ সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চাকারী প্রত্যেকেই চান, বাংলাদেশে পাশ্চাত্য মানের প্রকৃত গণতন্ত্রের কালচার গড়ে উঠুক। কিন্তু গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, আদর্শগত ও ধর্মীয় মূল্যবোধ কিংবা নির্বাচনী আইনের বিধিবিধান লঙ্ঘন করার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে নির্বাচনের সময়ই। দেশের আইন প্রণয়নের জন্য যাঁরা নির্বাচিত হন, তাঁরাই প্রথম নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আইন লঙ্ঘনের ব্যাপক প্রতিযোগিতায় নিজেদের জড়িত করেন। এমন পরিবেশে একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং গণতন্ত্র বিকাশের প্রত্যাশা করা অবাস্তব কল্পনামাত্র।

নির্বাচন কমিশন দেশে বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত একটা স্বাধীন সংস্থা হলেও তা সরকারের অন্যান্য সংস্থার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন কেবল কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কয়েকজন কমিশনার, সচিব, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং জেলা পর্যায়ে অতি স্বল্পসংখ্যক কর্মচারী। ভোটার রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে পোলিং স্টেশনগুলোয় মাঠপর্যায়ে ভোট গ্রহণ ও গণনা পর্যন্ত সব কাজে নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন ক্যাডার, বিভাগ ও সংস্থার জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত করতে হয়। তাঁদের ওপর কমিশনের নিয়ন্ত্রণ থাকে অতি সামান্যই। মাঠপর্যায়ের নির্বাচনী-প্রক্রিয়ায় যাঁরা সবচেয়ে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা হলেন : জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশের প্রধান (এসপি)। জেলার প্রিসাইডিং ও রিটার্নিং অফিসার হিসেবে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নির্বাচনে মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অন্যদিকে আইন

প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর প্রধান হিসেবে পুলিশের প্রধান সব আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁরা আইন বা বিধিবিধানগতভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনের সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বা অধীনে থাকলেও বাস্তবে নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধানুযায়ী কাজ পরিচালনা করে থাকেন। কোনো নির্বাচনকে প্রভাবিত করার মতো, অর্থাৎ নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুযোগ অধীন কর্মকর্তাদের হাতে থাকে। দৃশ্যত নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে তাঁরা কাজ করলেও প্রকৃত অর্থে তাঁদের অনেকেই দেশের প্রধান নির্বাহী বা সরকারপ্রধান ও দলীয় রাজনৈতিক সরকারের প্রতিই বেশি আনুগত্যশীল হয়ে পড়েন। এর কারণ মূলত কিছুটা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা-সম্পৃক্ত হলেও অনেকাংশই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধাসম্পৃক্ত। তবে আমি বিশ্বাস করি, এ ধরনের প্রতিকূল অবস্থায়ও দেশে একটা অবাধ, নিরপেক্ষ ও ঝামেলামুক্ত নির্বাচন আয়োজন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সদিচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। নির্বাচনী আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে, দেশে সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ বজায় রাখতে এবং প্রশাসনযন্ত্রকে প্রভাবমুক্ত রাখতে সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তির ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে কিংবা অন্য কোনো সংস্থার অধীনে যেসব কর্মকর্তা কাজ করেন, তাঁদের যেমন পক্ষপাত ও ভীতিমুক্ত হয়ে সততার সঙ্গে নির্বাচনী কর্তব্য পালন করা একান্ত কাম্য, তেমনি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, তাঁদের কর্মী ও সমর্থকদের আইনশৃঙ্খলা, ন্যায়নীতি ও অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নামাও একান্ত প্রয়োজন।

নির্বাচনী অনিয়ম ও অসদুপায়ের ঘটনা বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার আগে কিংবা পরে যেসব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার কোনোটাই কারচুপি থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত ছিল না। ১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলেই প্রথম 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোটের একটা প্রহসনমূলক ও কারচুপিপূর্ণ নির্বাচন দেশের নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। 'অভূতপূর্ব' বিজয় নিশ্চিত করার জন্য ফলাফলের মাধ্যমে চমক সৃষ্টির মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় গোয়েন্দা সংস্থা ও সেনা কমান্ডারদের ওপর, যাঁরা তখন সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করতেন। এরই পরিণতিতে পরবর্তীকালের প্রতিটি নির্বাচনে প্রশাসনের পরোক্ষ সহায়তায় ভোট চুরি, জালিয়াতি ও বিভিন্ন দুষ্কর্মজনিত প্রবণতা বাড়তে থাকে। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনামলে এই প্রবণতা বোধ হয় চূড়ান্ত রূপ

পরিগ্রহ করে। ওই সময় নির্বাচনী-প্রক্রিয়াকে পুরোপুরিভাবে প্রহসনে পরিণত করা হয়। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্থানীয় সেনা কমান্ডার ও বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় ভোট চুরি ও ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে ভোটের ফলাফল নির্ধারণ ও সমন্বয় করা হয়। ওই সময় একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনের সুযোগে আর্থিক সুবিধা লাভেরও চমৎকার সুযোগ পেয়ে যান। নিজে কারচুপি করেছেন এমন প্রার্থীর পাশাপাশি বিভিন্ন সূত্র থেকে ভোট কারচুপির বহু ধরনের কাহিনি আমি শুনেছি। কীভাবে সরকারি কর্মকর্তারা বিভিন্ন নির্বাচনী দুষ্কর্ম সম্পাদনে সাহায্য করেছেন, তা শুনলে রীতিমতো অবাক হয়ে যেতে হয়। ওই সময়ের দুই সাংসদের মুখে শোনা নির্বাচনী কারচুপির দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। প্রথম ঘটনার নায়ক যিনি, তিনি বললেন, জাতীয় পার্টির প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও (১৯৮৬) নির্বাচনে তিনি হেরে যান। তিনি আরও জানান, প্রেসিডেন্ট এরশাদের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ায় স্থানীয় ডিসি ও এসপি তাঁর পক্ষে থাকার পরও তিনি হেরে যান। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এর কারণ আর কিছুই নয়, স্থানীয় থানার ওসি তাঁর পক্ষে ছিলেন না। ওসি তাঁর ব্যাপারে নজর দেননি। এর অর্থ হলো ওসিকে ওই ভদ্রলোক যথেষ্ট টাকা-পয়সা দেননি। আমাকে তিনি আরও জানালেন, ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করার জন্য প্রথমেই তিনি স্থানীয় থানার ওসিকে তিন লাখ টাকা ঘুষ দেন। দ্বিতীয় কাহিনিটি বলেছেন জাতীয় পার্টির নন, এমন একজন সাংসদ। তাঁর বর্ণনামতে, রিটার্নিং অফিসার অর্থাৎ ডিসি নির্বাচনের আগের দিন সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রগুলোয় নিয়ম অনুযায়ী সব ব্যালট পেপার পাঠালেন না। ৪০ শতাংশ নিজের কাছে রেখে দিলেন। অনুরোধ বা যুক্তি প্রদর্শনে এ ক্ষেত্রে কোনো কাজ হলো না। শেষে এক লাখ টাকা দেওয়ার আশ্বাস পেয়ে তিনি বাকি ব্যালট পেপার নিজের দখলে নিতে সক্ষম হলেন। আমার কাছে তিনি স্বীকার করেছেন, এসব ব্যালট পেপার নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি।

সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে আমার কয়েকটি পরামর্শ ছিল। কিছু নির্বাচনী এলাকায় তৎকালীন কোনো কোনো সেনা কমান্ডার ভোট কারচুপির আশ্রয় নিয়ে বিশেষ বিশেষ প্রার্থীর অসাধারণ বিজয় কীভাবে নিশ্চিত করেছিলেন, এ-সংক্রান্ত কাহিনি আমি সেনাপ্রধানসহ আমার কিছু বন্ধু জেনারেলকে মাঝেমধ্যেই মনে করিয়ে দিতাম। জেনারেল এরশাদের অধীনে দুটো সাধারণ নির্বাচনে কী ঘটেছিল, সেটা আরও সবাই জানতাম বলেই এ ঘটনার সত্যতা কেউ অস্বীকার

করেননি। আরও অনেকেই ছিলাম ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে সংঘটিত অসংখ্য নির্লজ্জ নাটকের নীরব দর্শক। কেউ কেউ এসব ব্যাপারে এত বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠেন যে, কারচুপির মাধ্যমে তাঁরা জাতীয় পার্টির প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রীতিমতো এক অশুভ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। তাঁদের মনোভাবটা ছিল এ রকম—বসকে যত বেশি খুশি করা যাবে, ভবিষ্যতে তত বেশি আনুকূল্য পাওয়া যাবে। কর্তাকে খুশি করার কোনো কোনো সেনা কমান্ডারের একধরনের অতি আগ্রহ জেনারেল এরশাদকে স্বভাবতই আরও উৎসাহী করে তোলে। জাতীয় পার্টির প্রার্থী বাছাই করা, নির্বাচনী প্রচার পরিচালনা, তহবিল সংগ্রহ এবং অবৈধ উপায়ে চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করার মতো কাজগুলোর সঙ্গে দুটি গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ সম্পৃক্তিগত ভূমিকার কথা তখন কারও অজানা ছিল না। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রায় সব পর্যায়ের কর্মকর্তাই মুখ্যত সেনা কর্মকর্তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ পরিচালনা করেছেন। সেনা কর্মকর্তাদের অনেকেই আবার সাবেক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। নির্বাচন পরিচালনার জন্য তাঁদের লাখ লাখ টাকা দেওয়া হয়। নির্বাচনের পর জুনিয়র অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে ভোট কারচুপি ও টাকা লেনদেনের ঘটনা সাধারণ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। এসব তৎপরতা যে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও পেশাগত দক্ষতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে, সে কথা তখন বিবেচ্য ছিল না। জেনারেল এরশাদের পরিকল্পিত নির্বাচনীপ্রক্রিয়া যে একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল, বিরোধী রাজনীতিকদের এ দাবি মোটেও অতিরঞ্জিত ছিল না।

এই প্রেক্ষাপটে আমি আন্তরিকভাবে চাইছিলাম, এরশাদবিরোধী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে, বিশেষ করে সাধারণ নির্বাচনের সময় কোনোভাবেই যেন সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি কলঙ্কিত বা বিতর্কিত না হয়। সামরিক সচিব হিসেবে যদিও আমার কোনো নির্বাহী ক্ষমতা ছিল না, তবু সেনা কমান্ডারদের প্রভাবান্বিত করার মতো অবস্থান অন্তত ছিল। ওই দিনগুলোয় যখনই সেনাপ্রধান, সিজিএস ও অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তখন আমি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি, দেশের সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা যেন সেনাবাহিনী তথা সশস্ত্র বাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিত করেন। সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দীন খান, সিজিএস মে. জেনারেল আবদুস সালাম এবং ওই সময় সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সবাই আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত ছিলেন।

অন্যদিকে শুরু থেকেই আরেকটি বিষয়েও আমার সজাগ দৃষ্টি ছিল। সেটা হলো, সেনাবাহিনী ক্ষমতালোভী—এমন ভুল ধারণা যেন অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের মনে না জন্মায়। তাঁর পারসোন্যাল স্টাফ হিসেবে কর্মরত অন্য অফিসারদের নিয়ে আমি এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া আরও সবাই সাবেক প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত ছিলাম বলে আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত কোনো পদক্ষেপের ফলে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের মনে অবিশ্বাস ও আস্থার অভাব সৃষ্টি হতে পারত। জেনারেল এরশাদের ক্ষমতাচ্যুতির মধ্য দিয়ে এটা বিশেষভাবে বোঝা গেছে, দেশ শাসনের রাজনীতিতে সশস্ত্র বাহিনীর হস্তক্ষেপ সাধারণ মানুষ চায় না। সশস্ত্র বাহিনীর সে সময়কার সব পর্যায়ের সদস্য, বিশেষ করে অফিসার শ্রেণী এই সত্যটি ধরতে পারে। সশস্ত্র বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও সুনামের বিনিময়ে একটা ক্ষুদ্র গ্রুপ বিশেষভাবে লাভবান হয়ে আসছিল। কাজেই রাজনীতিকদের হাতে এখন রাজনীতি এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের হাতে বেসামরিক প্রশাসনের ভার তুলে দেওয়ার সময় এসেছে। ওই সময় নির্বাচন-সম্পৃক্ত কোনো ক্ষেত্রে সেনা কমান্ডারদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ ব্যাপারে কারও অতি আগ্রহের প্রকাশ রাজনীতিবিদদের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভূমিকাকে বিতর্কিত করে তুলতে পারে বলে আমার মনে হতো। ওই সময় আমি এ বিষয়ে সেনাপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

এরশাদ আমলের দুর্নীতি

এরশাদবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সব মহলই নানা ধরনের অপকর্মের অভিযোগ এনে সাবেক প্রেসিডেন্ট, তাঁর বন্ধু, সহযোগী ও আত্মীয়স্বজনের বিচার দাবি করে। তাঁদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ওপর ক্রমে চাপ বাড়তে থাকে। তবে অত দ্রুত তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আনা সম্ভব ছিল না। কাজেই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করা বা তাঁদের গ্রেপ্তারও করাও সহজ নয়। তবে জাতীয় পার্টির বহু নেতা ও সাবেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ডিটেনশনের নির্দেশ জারি হয়। জেনারেল এরশাদ ও তাঁর স্ত্রীকে এরই মধ্যে হেফাজতে নেওয়া হয়। অন্যরা গা-ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সাবেক প্রেসিডেন্টের ক্যান্টনমেন্টের বাসা থেকে ১৬টি লাইসেন্সবিহীন অস্ত্র ও নগদ প্রায় দুই কোটি টাকা পাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা রুজু করা হয়। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নির্দেশে দুর্নীতি দমন ব্যুরো তাঁর দুর্নীতি ও অন্যান্য দুষ্কর্মের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত শুরু করে। এদিকে দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোয় এরশাদ ও

তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ নিয়ে খবর প্রকাশিত হতে থাকে। বিভিন্ন মহলের ধারণা, সাবেক প্রেসিডেন্ট, তাঁর স্ত্রী, মন্ত্রী ও বন্ধুবান্ধব দুর্নীতির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছেন এবং বিরাট পরিমাণ টাকা বিদেশি ব্যাংকে গচ্ছিত রেখেছেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট আমিনুল হককে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেন। এরশাদ কর্তৃক এই পদে নিযুক্ত ব্যারিস্টার রফিক-উল হক এর আগেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। নিজের শাসনামলে এরশাদের করা দুষ্কর্মের তদন্ত ও অনুসন্ধানের বিষয়টি তদারক করা এবং এ-সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সাধন করার জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আমিনুল হককে দায়িত্ব দেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা ছাড়ার সময় প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব পদে আমার চাকরির মেয়াদ প্রায় দুই বছর হয়েছিল। তাঁর দুর্নীতিমূলক তৎপরতার বিষয়টি যখন ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া শুরু করে, তখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনা আমার জানা ছিল না। তবে কিছু কিছু তৎপরতা আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হতো। ওই পদে যোগ দেওয়ার আগে সেনাবাহিনীর অন্যদের মতো আমিও তাঁকে নিয়ে অসদাচরণের বহু ঘটনা শুনেছি। তবে এটা আমার সৌভাগ্য এবং জেনারেল এরশাদের কাছে আমি কিছুটা কৃতজ্ঞও এ জন্য যে, তিনি কখনো আমাকে কোনো গর্হিত কাজের সঙ্গে জড়িত করেননি। তিনি বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ আস্থাভাজন লোকদের নিয়োগ করতেন। তাঁর পারসোন্যাল স্টাফদের মধ্যে আমি ছাড়া আমার জানামতে আরও অনেকেই ছিলেন, যাঁদের অফিশিয়াল দায়িত্ব আইনসিদ্ধ ও সুচারুভাবে পালনে অসুবিধা হয়নি। জেনারেল এরশাদের পতনের পর থেকে আমি অনেক কাহিনি শুনতে শুরু করি এবং দু-একটা ঘটনা সম্পর্কেও জানতে পারি। এ ধরনের একটা ঘটনা আমার নজরে আসে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের কাছে প্রেসিডেন্ট এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের মাত্র ৩০ মিনিট আগে। প্রেসিডেন্টের অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে লেনদেনের দায়িত্ব পালন করতেন একজন পিএস (প্রাইভেট সেক্রেটারি)। ৬ ডিসেম্বর বিকেলে ক্ষমতা হস্তান্তরের সব ব্যবস্থা নিয়ে আমি যখন প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে আমার অফিসকক্ষে ব্যস্ত, তখন এই পিএস বেশ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে আমার সাহায্য প্রার্থনা করে জানান, তাঁর কাছে সাবেক প্রেসিডেন্টের এক কোটি ২৭ লাখ টাকা আছে। এই টাকা নিয়ে তিনি কী করবেন, তা বুঝতে পারছেন না। এখন তিনি এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ চান। এই বিপুল অঙ্কের নগদ টাকা তাঁর কাছে আছে শুনে আমি বিস্মিত হই।

এই পিএস প্রেসিডেন্ট এরশাদের অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখাশোনা করতেন, বিশেষ করে প্রেসিডেন্টের ত্রাণ তহবিল পরিচালনায় সাহায্য করতেন এবং কিছু নগদ অর্থ তাঁর অফিসকক্ষে চেস্ট অব ড্রয়ারে রাখা হতো, এটা জানতাম। কিন্তু কখনো ভাবতে পারিনি, চেস্ট অব ড্রয়ারে রাখা সেই টাকার পরিমাণ এক কোটিরও বেশি হতে পারে। টাকাগুলো তখন কোথায় জানতে চাইলে বললেন, গতকাল (৫ ডিসেম্বর) সকালে যখন তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অফিসে এসেছিলেন, তখন পুরো টাকাটা তাঁর বাড়িতে সরিয়ে নিয়ে রেখেছেন। কথাটা শুনে আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে তিনি এত টাকা বাড়ি নিয়ে যেতে সাহস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তখন তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। বুঝে উঠতে পারছিলেন না এই টাকা নিয়ে কী করবেন! আমি তাঁকে তখনই পুরো টাকা এনে তাঁর অফিসের যথাস্থানে রাখতে বলি। আমাকে নিরাপত্তাহীনতা বোধের কথা বলে এক দিন সময় চাইলে আমি রাজি হই। তবে বিশেষভাবে বললাম, কোনো অবস্থায় যেন সাবেক প্রেসিডেন্টকে টাকাগুলো তিনি না দেন। উল্লেখ্য, আমি তাঁকে এ-ও স্মরণ করিয়ে দিলাম, ওই টাকার মালিক বাংলাদেশের জনগণ এবং তা যথাসময়ে ট্রেজারিতে জমা দিতে হবে।

কয়েক দিন পর যখন ওই টাকার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে নিঃসংকোচে বললেন, ওই টাকা সাবেক প্রেসিডেন্টের। তাই সমস্ত টাকা তিনি তাঁকে ফেরত দিয়েছেন। কৈফিয়ত চাইলে তাঁর একটাই উত্তর, ওগুলো জেনারেল এরশাদের টাকা।

আমি তৎক্ষণাৎ বিষয়টি সেনা সদর দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই। তাঁকে পিএসের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেনা সদর দপ্তরের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শেষে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নির্দেশে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। পরে আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে স্বীকার করেছেন, ওই টাকার সর্বমোট পরিমাণ ছিল চার কোটি আট লাখ ৬৫ হাজার। সেনা তদন্ত কমিটির কাছে স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেছেন, ৬ ডিসেম্বর রাতে সমুদয় টাকা তিনি প্রেসিডেন্ট এরশাদের কাছে তাঁর বাসভবনে গিয়ে হস্তান্তর করেছেন। পরে বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, তিনি সামান্য টাকাই তাঁর 'বস'কে দিয়েছিলেন।

ওদিকে জেনারেল এরশাদ ও তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের যেসব অভিযোগ ছিল, তা তদন্তের ব্যাপারে নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুল হক অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর কাজ শুরু করে দিলেন। বিদেশে

অর্থ পাচারের ব্যাপার-স্যাপার উদ্ঘাটনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত অনুসন্ধানী সংস্থা ফেয়ার ফ্যাক্সের সহায়তা নেন। আইনের পেশায় বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই বিনয়ী ও বন্ধুভাবাপন্ন মানুষটি খুবই একাগ্রতার সঙ্গে সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার কাজ করতে থাকেন। দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী আমিনুল হক জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তাঁকে সব ধরনের অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি এবং নিজের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালনে ব্রতী হতে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে প্রথমে দুটি মামলার তদন্তকাজ শুরু করা হয় এবং দুটি কেসেই তিনি জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে সরকারি পক্ষে মামলা পরিচালনা করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। উভয় মামলায় সাবেক প্রেসিডেন্টের পক্ষাবলম্বী দেশের অভিজ্ঞ আইনজীবীদের তিনি মোকাবিলা করেন। দুটি মামলাতেই জেনারেল এরশাদ দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। উল্লেখ্য, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মধ্য ডিসেম্বরে যখন অ্যাডভোকেট আমিনুল হককে অ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত করেন, তখন বিএনপির নেতারা তাঁকে আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে ওই নিযুক্তির বিরোধিতা করেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এ কথা মনে রেখেছিলেন এবং ১৯৯১ সালের ২৩ মার্চে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর প্রথম বৈঠকে তিনি জানতে চান, বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলে আমিনুল হকের জায়গায় কোনো বিএনপি-সমর্থক অ্যাডভোকেটকে নিয়োগ করবেন কি না। অ্যাডভোকেট আমিনুল হক তাঁর পদত্যাগপত্র সঙ্গে নিয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বেগম জিয়া জনাব হককে বললেন, 'আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে।' এরপর ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে তাঁর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে কাজ করে গেছেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি বিখ্যাত জনতা টাওয়ার মামলাসহ আরও কয়েকটি মামলা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেন এবং জাতীয় পর্যায়ে নানা জটিল সমস্যার সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন

নির্বাচন-পূর্ব প্রশাসন

অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের জন্য সময় যত পার হতে থাকে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, দাবি আর অভিযোগও ততই বাড়তে থাকে এবং তাঁর ওপর চাপও বাড়তে থাকে। ব্যস্ত থাকতে হয় রাত-দিন এবং সব ব্যাপারেই দিতে হয় মনোযোগ। এদিকে সামগ্রিকভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গন্ডগোল দেখা দেয়। তাতে একজন ছাত্র নিহত হন এবং আহত হন বেশ কয়েকজন। কিছুদিনের মধ্যে সেখানকার পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাকর হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোর কারাগারের ভেতরেও কয়েদিদের নিয়ে হাঙ্গামা বাধে। কয়েকজন কয়েদি নিহত হয়। এসব কিছুর পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলের নেতারা অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে দোষারোপ করে বিবৃতি দিতে শুরু করেন। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার কারণে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের পক্ষে সব ঘটনার সঠিক চিত্র বা বিবরণ পাওয়া সব সময় সম্ভব হচ্ছিল না। মিরপুরে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগে গেলে দুজন শ্রমিক তাতে মারা যান। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে এ খবর কেউ দেয়নি। তিনি আমার কাছ থেকে খবর পেয়ে দুর্ঘটনার শিকার হওয়া লোকজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখতে যান। সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের অপকর্মকে কেন্দ্র করে চাপ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেখলাম, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদির চেয়ে তুচ্ছ ও ছোটখাটো বিষয় নিয়েই অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রেসিডেন্টের তপ্ত

আসনটিতে যিনি বসেন, সর্ববিদ্যাবিশারদ (অলরাউন্ডার) না হলে তাঁর উপায় নেই। সব দিকে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয়। উত্থাপিত দাবিদাওয়া ও যাবতীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান করার ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষমতাবান হবেন, সবাই এমনটাই আশা করে থাকে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদও প্রতিটি বিষয় যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেন, তুচ্ছ বিষয়গুলো মূল বিষয়ের কেন্দ্র থেকে তাঁর মনোযোগ সরাতে পারেনি।

মধ্য জানুয়ারি নাগাদ সারা দেশ নির্বাচনী কর্মযজ্ঞে মেতে ওঠে। একদিকে যেমন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে নানা দলের, প্রধান ও অপ্রধান দলের নেতা-নেত্রী, কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে তিক্ততা ও শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মতো দুই প্রধান রাজনৈতিক দল পরস্পরের মরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী। এরশাদের জাতীয় পার্টি উভয়ের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হওয়া সত্ত্বেও প্রধান রাজনৈতিক দল দুটির মূল আক্রমণ পরস্পরের বিরুদ্ধেই কেন্দ্রীভূত থাকে। সন্ত্রাস, ভীতি প্রদর্শন, পেশিশক্তি প্রদর্শন এবং আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘনের অন্যান্য ঘটনা ঘটার খবর দ্রুত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। এসব সত্ত্বেও একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন। নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন-সম্পর্কিত সহিংস ঘটনা মোকাবিলা করার জন্য নতুনভাবে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয় এবং দেওয়া হয় নির্বাচন পরিচালনার পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সব রাজনৈতিক দল ও নেতাদের নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা প্রদান ও নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলার জন্য আহ্বান জানান। তাঁকে বিশেষভাবে হতাশ করে প্রধান প্রধান দলের নেতাদের মনোভাব। শক্তি প্রয়োগ ও অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে নির্বাচনে জেতার প্রবণতা প্রধান দলগুলোর মধ্যেই ছিল সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়।

১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক দলগুলোর কথা উল্লেখ করে নেতাদের আচরণ সম্পর্কে বলেন, 'কঠিন জেল-সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে আমি কোনো সহযোগিতা পাইনি।' সরবরাহ করা আহারাদির পাশাপাশি তাঁদের বসবাসগত অবস্থার অতি নিচুমান থেকে শুরু করে আইনের ধারা ও জেলের বিধিবিধান সম্পর্কে কারাবন্দীদের বহু অভিযোগ ছিল। তাঁদের অভিযোগ পরীক্ষা করে দেখার জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ঢাকা বিভাগের কমিশনারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে দেন। কারাবন্দীদের অনেক অভিযোগের একটি ছিল এ রকমের—বিচারাধীন আসামিদের দীর্ঘদিন যাবৎ হাজতে রাখা

হয়, অনেক ক্ষেত্রেই বিচার-প্রক্রিয়া শেষ হতে বেশ কয়েক বছর লেগে যায় এবং এ সময় তাঁদের হাজতবাস করতে হয়। তাঁদের দাবি ছিল, বিচারে সাজা হলে কারাদণ্ডের মোট মেয়াদ থেকে যেন হাজতবাসের সময়টা বাদ দিয়ে তাঁদের দণ্ড ভোগ করতে হয়। তাঁদের দাবি যথার্থ ও ন্যায্য হলেও দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী বিগত সময় থেকে কার্যকর (রিট্রোস্পেকটিভ) হতে পারে না। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সিআরপিসির প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো সংশোধনার্থে এক অর্ডিন্যান্স জারি করে পরোক্ষভাবে ভুক্তভোগীদের অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা করেন। এই ধারার মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ হাজত বাসকারীদের কারাদণ্ডের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য আদালতকে অধিকার দেওয়া হয়।

প্রশাসনের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এ সময় প্রতিপক্ষ দলের পক্ষাবলম্বনের অভিযোগ সবচেয়ে বেশি শোনা যেত। অন্যদিকে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলতে থাকে। ৭ ফেব্রুয়ারি মাইজদী কোর্টে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'বর্তমান সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।' এমনকি তিনি ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজপথে নামার হুমকি পর্যন্ত দিয়ে বসেন। এসব কিছুর জবাবে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁর এক ভাষণে বলেন, 'কেউ কেউ আমার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষতা বলতে তাঁরা কী বোঝান, সেটা তাঁদের বিবৃতি থেকে স্পষ্ট নয়। আমি প্রত্যেককে খুশি করতে পারব না। দেশে এক শরও বেশি রাজনৈতিক দল আছে এবং রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে আমাকে যেসব সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেটা তাদের সবাইকে খুশি করবে—এটা কল্পনাতীত।'

১৯৯১-এর নির্বাচন ও নতুন সরকার

মৃত্যুজনিত কারণে স্থগিত দুটি নির্বাচনী এলাকা ছাড়া সারা দেশে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো সহিংসতা ছাড়া নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়। অল্প কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত থাকে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোট পুনর্গণনার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের বহু অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তার পরও বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯১ সালের ওই সাধারণ নির্বাচন বাংলাদেশের

ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে দেশ ও বিদেশে স্বীকৃতি পায়। বিভিন্ন দেশের পাঁচটি পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন-পূর্ব কর্মকাণ্ড ও চূড়ান্ত ভোট গ্রহণপর্ব পর্যবেক্ষণ করে। তারা অভিমত প্রকাশ করে, নির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ ও পক্ষপাতমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা এ-ও দাবি করে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় এটি একটি মডেল হতে পারে। কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দল, জাপানি টিম ও সার্ক দেশগুলোর পর্যবেক্ষক টিম নির্বাচনের আগে ও পরে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে একটি ঐতিহাসিক সাদৃশ্য বলে অভিহিত করে এবং এ জন্য তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রশংসা করে। নির্বাচনের ফলাফল সারা দেশের কাছে এক বিরাট বিস্ময় সৃষ্টি করে। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়, অন্যদিকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে পরাজয় বরণ করতে হয়। প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায়, বিএনপি ১৪০টি আসন এবং আওয়ামী লীগ ৮৬টি আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে। মাত্র ১১টি আসনের জন্য বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। আওয়ামী লীগের সামনের সারির বহু নেতা পরাজিত হন। শেখ হাসিনা ঢাকায় দুটি আসনেই পরাজিত হন। আওয়ামী লীগের পক্ষে এই পরাজয় মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তারা দেশে সরকার গঠনের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, কিন্তু এখন তাদের বিরোধী দলের আসনে বসতে হবে। উদার মনে পরাজয় মেনে নেওয়ার পরিবর্তে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বিএনপির বিরুদ্ধে 'চাতুর্যপূর্ণ ভোট কারচুপি'র অভিযোগ উত্থাপন করেন। এদিকে দেশে নির্বাচনোত্তর পরিবেশ ভালো হওয়ার পরিবর্তে জটিল থেকে জটিলতার হতে থাকে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের জন্য আরও কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নির্বাচনের পর সত্যিকার অর্থে একটা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে—এই আশা নিয়ে সারা দেশ অপেক্ষা করছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে হাতে হাত ধরে কাজ করবেন—এটাই ছিল জনগণের প্রত্যাশা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত ঘোলাটে হয়ে উঠতে থাকে। পুরোনো কায়দায় ক্ষমতার লড়াই আবার শুরু হয়ে যায়।

১৯৯১ সালের ৩ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির সামনের সারির নেতাদের নিয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন। বিএনপির পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা হওয়ার পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক

সাক্ষাৎ। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বহু সন্দেহ ও ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বেগম খালেদা জিয়াকে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিনন্দন জানান। তবে কৌতুক করে বলেন, 'আপনি তো ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজপথে নামতে চেয়েছিলেন।' কথাটার অর্থ এই যে, রাজপথে নামার পরিবর্তে এখন তো তিনি সরকার পরিচালনা করবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে বলে তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেন। ওই দিনই সন্ধ্যায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ১৯৯১ সালের ৬ এপ্রিল নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু এদিকে বিএনপির নেতাদের মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে সন্দেহ থেকে যায় বলে মনে হয়। বঙ্গভবনে ১৯৯১ সালের ১৮ মার্চ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট প্রদত্ত ইফতার পার্টিতে তাঁরা যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। বিএনপি ছাড়া সব দলের নেতারাই ইফতার পার্টিতে যোগ দেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন এই ইফতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত সবার সঙ্গে মতবিনিময় ও ঘনিষ্ঠতার একটা সুযোগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৩৩ সদস্যের মন্ত্রিপরিষদ ১৯৯১ সালের ২০ মার্চ শপথ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ বিএনপির সরকার গঠনের বিরোধিতা করে এবং অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা ভঙ্গের অভিযোগ আনে। বঙ্গভবনে শপথ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এমনকি জামায়াতে ইসলামীর নেতারাও (যাঁরা সংসদে বিএনপির পক্ষে) ওই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়

নির্বাচিত সরকারের শাসন শুরু হলো যেভাবে

প্রথম সংসদ অধিবেশন

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এখন নির্বাচনের আগের অবস্থার তুলনায় অনেক বেশি মারমুখো রাজনৈতিক পরিস্থিতির হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ছিল তাঁর সর্বপ্রধান দায়িত্ব। সেটা দক্ষতার সঙ্গেই সম্পাদিত হয়েছে। পরবর্তী কাজ ছিল, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনপুষ্ট একজন নেতা বা নেত্রীর অধীনে একটা সরকার গঠন করা। সেটাও তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে করতে পেরেছেন, তবে যথেষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে। এখন তাঁর সামনে আসছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সবচেয়ে কঠিন কাজটি। এই চূড়ান্ত পর্বের কাজ শেষ করে তিনি আগের কর্মস্থলে, অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যাবেন। তিনি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। সব ধরনের ভয়ভীতি, আনুকূল্য, প্ররোচনা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে আইন ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সরকার গঠনের পরপরই বিএনপির নেতারা এই অভিমত ব্যক্ত করতে শুরু করলেন যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের উচিত পার্লামেন্টের স্পিকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। এতে করে আওয়ামী লীগসহ সব বিরোধী দল (জাতীয় পার্টি ছাড়া) ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে। তাদের ধারণা, প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতি বহাল রাখাই বিএনপির আসল লক্ষ্য। কাজেই বিএনপির এই প্রচেষ্টা নস্যাৎ করতে তারা নিয়োগ করে তাদের সর্বশক্তি। বিচারপতি

সাহাবুদ্দীন আহমদ আবারও রাজনৈতিক মতবিরোধগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শিকার হলেন। এ রকম একটা উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে ৬ এপ্রিল সকালে নবনির্বাচিত পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। চতুর্থ জাতীয় সংসদের স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরী এতে সভাপতিত্ব করেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের জন্য নতুন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনই ছিল এই অধিবেশনের প্রথম এজেন্ডা। তারপর নতুন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে শপথ নেবেন। সংসদের কর্মসূচিতে দিনের শেষ ও প্রধান বিষয় ছিল অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণ। তিনি ঠিক ওই দিন সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে জাতীয় সংসদে পৌঁছান। তাঁর বাসা থেকে আমি তাঁর সঙ্গী হই। তাঁকে নিয়ে সোজা ছয়তলায় অবস্থিত প্রেসিডেন্টের দপ্তরে পৌঁছি। জাতীয় সংসদ ভবনের ওই দপ্তরে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের এই প্রথম উপস্থিতি। আমরা যখন সংসদ ভবনে পৌঁছাই, তখন সাংসদেরা যাতে তাঁদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন, সে জন্য অবিরাম ঘণ্টা বাজানো হচ্ছিল।

সংসদে প্রেসিডেন্টের দপ্তরে আমি ও সংসদসচিব আবুল হাসেম অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বসেছিলাম। অডিও মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ অধিবেশনের সব কথাবার্তাই স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম। বেলা ১১টা থেকে স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরী হাউসে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সাধ্যমতো তাঁর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। চলতে থাকে হইচই, চিৎকারের মতো বিশৃঙ্খল অবস্থা। অনেকক্ষণ ধরেই চলে এই অবস্থা। এ রকম একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতির যে উদ্ভব হবে, সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। কখনো কখনো তা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। প্রথমেই শুরু হয় তুমুল বাদানুবাদ, বিশেষত বিদায়ী স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরীকে নিয়ে। অনেকেই তাঁর উপস্থিতি ও সভাপতিত্ব মানতে চান না। কারণ, তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিতর্কিত পার্লামেন্টের স্পিকার ছিলেন। তবে সরকার ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে পঞ্চম সংসদে আসল লড়াই শুরু হয় স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। তুমুল বিরোধিতা এবং বিরোধী শিবিরের অধিবেশন বর্জনের মধ্য দিয়ে আবদুর রহমান বিশ্বাস ও শেখ রাজ্জাক আলী যথাক্রমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। যে সার্বভৌম পার্লামেন্ট গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি ও চর্চার মাধ্যমে দেশ পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেবে, সেখানে সব মহলের মতৈক্যের ভিত্তিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য দুই ব্যক্তিকে নির্বাচন করা সম্ভব হলো না।

নবনির্বাচিত স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার একটু পরই অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। জাতীয় সংসদের পরবর্তী কার্যক্রম হলো অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের উদ্বোধনী ভাষণ।

সকাল ১০টার পরিবর্তে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সংসদ অধিবেশনে ভাষণ দিতে ফিরে আসেন বেলা তিনটায়। তিনি বাসায় চলে গিয়েছিলেন। যখন সংসদ ভবনে অবস্থিত প্রেসিডেন্টের অফিসে তিনি পুনরায় ঢোকেন, তখন অধিবেশন চলছিল। অডিও সিস্টেমে তখন শুনতে পাচ্ছিলাম নতুন জাতীয় সংসদে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণদানের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তুমুল বিতর্ক। কয়েকজন সাংসদ তাঁর ভাষণ দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা প্রকাশ করেন। এই বিরোধিতার নেতৃত্ব দেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। তাঁর বিরোধিতা প্রকাশের ভাষা ছিল বিদ্বেষে ভরা ও তিক্ততাপূর্ণ। শুনে আমি কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শান্তভাবেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা ক্ষোভ ও নিন্দার কথাগুলো শোনেন। জনাব চৌধুরী কেন অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের প্রতি এত বিরূপ হলেন, তা জানি না। আমি আশঙ্কা করছিলাম, তিনি ভাষণ না দিয়ে যেকোনো মুহূর্তে জাতীয় সংসদ ছেড়ে চলে যেতে পারেন। এই আশঙ্কা অমূলক না হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। লক্ষণীয় যে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মন্তব্যের কোনো বিরোধিতা করা হয়নি এবং তাঁর ওই বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবিও করা হয়নি।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে জাতীয় সংসদে ভাষণ দেওয়া থেকে নিরস্ত করার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে তাঁর জন্য অপমানজনক ঘটনা ছিল। যিনি এত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাতে সফল হয়েছেন, সেই ব্যক্তিকে সংসদে ভাষণ দিতে এনে রীতিমতো উপহাস করা হচ্ছে! বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রধান হলের উদ্দেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময়ও আমি সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর উচ্চকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন খুবই সংযত ছিলেন এবং তাঁর চোখেমুখে কোনো ধরনের অসন্তোষের চিহ্ন না থাকলেও আমি তাঁর আবেগতাড়িত মনোভাব বুঝতে পারছিলাম। জাতীয় সংগীতের মধুর সুর শেষ হলে তিনি বক্তৃতামঞ্চে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আমি কিছুটা শঙ্কিত হই। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তেমন শক্ত-সমর্থ্য লোক নন এবং এ ধরনের মানসিক ও শারীরিক চাপ সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। আস্তে আস্তে তিনি তাঁর

লিখিত ভাষণ পড়তে শুরু করেন, তবে তাঁর মধ্যে স্বভাবসুলভ স্বাচ্ছন্দ্য ও আস্থাশীল ভাবটি ছিল না। তাঁর স্বরে কিছুটা উত্তেজনা ও আবেগমথিত। অন্য কারণ বাদ দিলেও মাত্র কয়েক মিনিট আগে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর কথাগুলো নিঃসন্দেহে তাঁর মনকে আঘাত করেছে। আমার অনুমান অংশত ঠিক ছিল।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর এই অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁর ৩৩ মিনিট দীর্ঘ ভাষণে বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ পায়। ভাষণের একপর্যায়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ কিছুটা আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। ফলে লিখিত ভাষণের বাইরেও কিছু কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত কোনো রকম বিরতি বা অঘটন ছাড়াই তাঁর চমৎকার ভাষণ শেষ করতে তিনি সক্ষম হন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের জাতীয় সংসদে দেওয়া ভাষণ দেশের ওই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ছিল। তাঁর ভাষণে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তিনি অতিসত্বর ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি সাংসদদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির বিদ্যমান সরকারব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ২২ অক্টোবরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে আরও বলেন, 'যে পরিস্থিতিতে স্পিকার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন, সেই পরিস্থিতি বর্তমানে বিদ্যমান নেই।' স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ সৃষ্টির জন্য সংবিধানের চতুর্থ অংশে একটা অন্তর্বর্তীকালীন ও সাময়িক প্রতিবিধান সংযোজনের জন্য তিনি সাংসদদের প্রতি অনুরোধ জানান।

সরকারপদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক

সরকারপদ্ধতির ইস্যুতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দুই প্রতিপক্ষ গ্রুপের পারস্পরিক আক্রমণের মধ্যে পড়ে যান। বিএনপিকে সরকার গঠন করতে দেওয়ায় আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্ররা তাঁর ওপর নাখোশ ছিল। এখন সরকারে অধিষ্ঠিত হয়ে বিএনপি স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তাঁর ওপর সুকৌশলে চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া বিএনপির অন্য নেতারা খোলাখুলি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির প্রতি সমর্থন জানাতে শুরু করেন। আওয়ামী লীগের নেতারা বুঝতে পারেন, বিএনপি প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার অব্যাহত রাখবে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে

বুঝিয়ে, চাপ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে যদি স্পিকারের কাছে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার অর্পণ করানো যায়, তাহলে বিএনপি সহজে তাদের এই লক্ষ্য হাসিল করতে সক্ষম হবে। একবার যদি স্পিকার, যিনি বিএনপি থেকে নির্বাচিত, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, তাহলে বর্তমান ব্যবস্থা, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি অব্যাহত রাখা সহজ হবে। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলের সমর্থন ছাড়া বিএনপির পক্ষে সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব নয়। কারণ, তাদের প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তবে জনমত যে সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে, বিএনপির নেতারা সেটা বুঝতে পারেন এবং সে কারণে তাঁরা ধীরে চলো নীতির আশ্রয় নেন।

এ সময় বহু রাজনৈতিক নেতা, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পেশার লোকজন অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং অনেকে সরকারপদ্ধতি সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর মতামত জানার জন্য আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে বসতেন। তাঁদের অধিকাংশের ধারণা ছিল, সামরিক বাহিনী প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতির পক্ষে এবং বেগম জিয়াকে তারা এ ব্যাপারে সমর্থন দিচ্ছে। অবশ্য এ ধরনের সমর্থন বা প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমি ব্যাখ্যা করে বলি, এ ধরনের রাজনৈতিক ইস্যুতে গ্রুপভিত্তিতে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে মতামত দেওয়ার কোনো সুযোগ সশস্ত্র বাহিনীর নেই। রাজনৈতিক ইস্যুতে সশস্ত্র বাহিনী কিংবা অন্য কোনো পেশাজীবী গ্রুপের অভিমত চাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানেও নেই। তবে সম্ভবত এটা অসত্য নয় যে সেনাবাহিনীর অধিকাংশই প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতির পক্ষে থাকবে। কারণ, তারা দুজন সামরিক প্রেসিডেন্টের অধীনে কাজ করেছে এবং সেই সময় কিছু বিশেষ সুবিধাও ভোগ করেছে। এ কথা বলাও অসংগত হবে না যে আমলাতন্ত্র সাধারণত স্থিতাবস্থারই (স্ট্যাটাস কো) পক্ষে থাকে। দেশের আমলাতন্ত্রের অংশ হিসেবে সামরিক বাহিনীরও প্রচলিত ব্যবস্থার পক্ষে থাকাই স্বাভাবিক। আমি অনেক সময় আলোচনা প্রসঙ্গে সেনাপ্রধানসহ কোনো কোনো সেনা সহকর্মীর কাছে আমার ব্যক্তিগত মতামত ব্যাখ্যা করেছি। যদিও আমি প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতির বিরুদ্ধে ছিলাম না, তবু সব সময়ই অনুভব করতাম, আমাদের দেশের জন্য সংসদীয় পদ্ধতির সরকারই ভালো হবে। প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতিতে কী ঘটেছে এবং প্রেসিডেন্ট এরশাদের ঝামেলাপূর্ণ সরকার পরিবর্তনের চিত্র দেখে আমার মনে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়।

১৯৯০-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের, বিশেষত ৪ ও ৫ ডিসেম্বর রাতের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে যাঁদের জানা আছে, তাঁরা সম্ভবত অস্বীকার করতে পারবেন না, দেশ তখন একটা মারাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। ৪ ডিসেম্বর রাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগের কথা ঘোষণার পর প্রকৃত অর্থে দেশে কোনো সরকার ছিল না। একটা প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে হঠাৎ করে দেশের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, স্পিকার ও পার্লামেন্ট নিষ্ক্রিয় ও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। দেশ আইনগত বা সংবিধানগতভাবে কর্তৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্ট না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদের রাজনৈতিক সরকার অনুপস্থিত ছিল (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি ওই রাতের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছি)। ঢাকা তখন নৈরাজ্যের চরম প্রান্তে। বঙ্গভবনে আমি, সেনা সদর দপ্তরে সেনাপ্রধান এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে পুলিশ কমিশনার ছাড়া কার্যকরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কোনো প্রশাসনযন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। সেনাভবনে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব ও সামর্থ্যহীন পলায়নপর অবস্থা দেখে বঙ্গভবনে বসে আমি (যা আমার দায়িত্বের বাইরে) ক্রম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি শান্ত করার উদ্যোগ নিই। তৎকালীন নৌবাহিনীর প্রধান, বিডিআরের প্রধান, বহু সরকারি কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রদূত যখন প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, এমনকি সরকারের কোনো সচিবের সঙ্গে পর্যন্ত যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন, তখন তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দেশের ঊর্ধ্বতন প্রশাসনের তখন অসহায় অবস্থা, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো সাংবিধানিক কোনো বিশেষ ফর্মুলা বা কর্তৃত্ব ছিল না; একবার সংকট যখন উতরে গেছে, স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে, একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, এখন একটা নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর অতীতের সব দুর্ভোগ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ঝঞ্ঝাট ও সমস্যার কথা সবাই বেমালুম ভুলে গেছেন। পরে এমনও দেখা গেছে, কিছু কিছু নেতা দেশে যে এমন একটা মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছিল, যা থেকে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারত, তা উপলব্ধি করতেও অপারগ।

বাংলাদেশের মতো একটা আন্দোলনপ্রবণ দেশে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ১৯৯০ সালে বিরোধী দলের আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট গণরোষ কেবল প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ছিল না, তাঁর

দলের যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের সবার বিরুদ্ধেই ছিল; এমনকি উচ্চপদস্থ কিছু আমলার বিরুদ্ধেও। সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী সব পদ হঠাৎ করে অকার্যকর হয়ে পড়লে প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক সংকটজনিত কারণে ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। দেশ-বিদেশে সবাই দেখল, হঠাৎ প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সব সদস্যসহ প্রশাসন থেকে সরে পড়েছেন এবং সংবিধান অনুযায়ী যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন, তিনিও অনুপস্থিত বা গ্রহণযোগ্য নন। তাঁর বদলে কে আসবেন, তা নির্ধারণে এক দিন সময় লেগে যায়। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলন সাধারণত প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়ে থাকে। আন্দোলনের ফলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন বা জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়াই হচ্ছে সরকার পরিবর্তনের প্রচলিত আইনানুগ ধারা। ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি চললেও বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকেন প্রেসিডেন্ট এবং সর্বোচ্চ সাংবিধানিক কর্তৃত্বের বহাল থাকেন তিনি। আমার ধারণা হলো, যদি কেউ ১৯৯০-এর ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি দেখতে না চান এবং দেশকে সংকটমুক্ত রাখতে চান, তাহলে তিনি প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতি অব্যাহত রাখতে চাইবেন না। এ পদ্ধতিতে এক ব্যক্তিকে হটিয়ে দেওয়া খুবই সহজ। সম্ভবত প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতির কারণেই অতীতে অভ্যুত্থানকারী নেতারা দু-দুজন প্রেসিডেন্টকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে এবং ক্ষমতাসীন সরকারকে উৎখাতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। সুতরাং, আমার ব্যক্তিগত অভিমত ছিল, সংসদীয় সরকারপদ্ধতিই আমাদের দেশের জন্য উপযোগী হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, বিএনপি প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতি অব্যাহত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে সামনের সারির অধিকাংশ নেতাই প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতির সমর্থনে মত প্রকাশ করলেও দলের ক্ষুদ্র একটি শক্তিশালী গ্রুপ সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে কাজ করতে থাকে। অবশ্য বিএনপির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই এ ব্যাপারে নীরব থাকেন। কারণ, তখন পর্যন্ত দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সুস্পষ্টভাবে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেননি। সম্ভবত, তিনি নিজের অবস্থানের ব্যাপারে সতর্ক থেকে রাজনৈতিক বিতর্ক পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তবে এটা অজানা ছিল না, বেগম জিয়া নিজে প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতির পক্ষে এবং দেশের প্রেসিডেন্ট হতেই বেশি আগ্রহী। সবকিছু মিলিয়ে বোঝা গেল, বিএনপি সংবিধান

পরিবর্তনের জন্য আশু কোনো পদক্ষেপে উদ্যোগী হবে না। ফলে ব্যাপারটা অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের প্রধান চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তিনি সংবিধান মেনে চলার বিষয়ে যেমন দৃঢ় অবস্থান নেন, তেমনি বিরোধী জোটগুলোর প্রতিশ্রুতির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে তিন জোটের যৌথ ঘোষণার কথা সাংসদদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'যদিও এই ঘোষণা কোনো সাংবিধানিক বৈধতা বহন করে না, তবু তাতে রয়েছে বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্ব।' সবশেষে তিনি বলেন, 'সংঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা যেহেতু দেখা দিচ্ছে, সেহেতু আমি অতি দ্রুত চলে যেতে আগ্রহী।'

জাতীয় সংসদে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের প্রথম ভাষণের পর প্রায় দুই মাস কেটে যায়, কিন্তু সরকারপদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয় না। বরং ১৯৯১ সালের ১৪ এপ্রিল আওয়ামী লীগ সংসদীয় সরকারপদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে যে একটা সংবিধান সংশোধনী বিল আনে, তা নিয়ে পদ্ধতিগত ভুলত্রুটির অজুহাতে আলোচনা বিলম্বিত করা হতে থাকে। ৪১ দিন চলার পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আশা করছিলেন, ওই অধিবেশনে তাঁর পূর্বতন পদে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু একটা করা হবে। এদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কোনো সুস্পষ্ট সাংবিধানিক পদক্ষেপ (সংশোধনীর মাধ্যমে) গ্রহণের পরিবর্তে বিএনপির কিছু নেতা অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে স্পিকারের হাতে প্রেসিডেন্টের পদ ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে কৌশলে তিক্ত প্রচারণা চালাতে থাকেন। এমনকি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ক্যাবিনেটের সদস্য হয়েও প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা প্রকাশ্যে বলেন, স্পিকারের কাছেই প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ ধরনের আচরণে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মর্মাহত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ামাত্রই বিএনপির নেতাদের মধ্যে একধরনের অতি আস্থাশীল দাম্ভিক ভাব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। নিজেদের রাজনৈতিক সমর্থন ও প্রশাসনিক দক্ষতা সম্বন্ধে নবনিযুক্ত মন্ত্রীরা খুবই নিশ্চিত ছিলেন। তাঁদের আচার-আচরণ, কাজকর্ম ও কথাবার্তায় বিরোধী দলগুলোর প্রতি, বিশেষত আওয়ামী লীগের প্রতি অতিমাত্রার বিদ্বেষভাবই প্রকাশ পেতে থাকে। ক্ষমতা লাভের গর্বে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সহযোগিতা ও সমঝোতাকে তাঁরা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করেন। এমনকি প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দৃশ্যত তাঁর প্রতি সৌজন্য ভাব বজায়

রাখলেও তাঁদের মধ্যে কাজের সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল না। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে দূরত্ব দিন দিন বাড়ছে, সেটা আমি লক্ষ করছিলাম। ব্যাপারটা দেখে আমি যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক হই এবং যেখানেই সম্ভব ভুল-বোঝাবুঝি দূর করার এবং ছোটখাটো স্পর্শকাতর ও বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো কখনো কোনো মহলের প্ররোচনায় যাতে আরও প্রবল হয়ে উঠতে না পারে, তা সামলানোর চেষ্টা করতে থাকি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরোধের কারণ দূর করতে এবং দূরত্ব হ্রাস করতে সফলও হই। তবে লক্ষ করলাম, প্রধানমন্ত্রীর আশপাশে কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তিও দুজনের সম্পর্কের অবনতি ঘটাতেই বেশি আগ্রহী।

১৯৯১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের অবস্থান আরও নাজুক হয়ে পড়ে। তিনি শুধু রাজনৈতিক বিষয়ে নয়, প্রশাসনিক বিষয়েও চাপের সম্মুখীন হন। আমি লক্ষ করি, বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত তাঁকে মেনে নিতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীরা তাঁকে বেশ চাপের মধ্যে রাখছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে। দেশে তখনো প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতির শাসন চলছে। ক্যাবিনেটের সব সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট মানতে বাধ্য নন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে সুবিবেচনাপ্রসূত বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তিনি নীতিগতভাবে বাধ্য। প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়গুলো থেকে বহু ফাইল আসতে থাকে। বিএনপির সরকার আশা করতে থাকে, কোনো ধরনের প্রশ্ন ছাড়াই তাদের সব সিদ্ধান্ত তিনি অনুমোদন করবেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ যত দূর সম্ভব দ্বন্দ্ব ও ভুল-বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। বিদ্যমান নীতির সঙ্গে বড় মাত্রার অসংগতি না থাকলে তিনি কোনো ফাইল ধরে রাখতেন না। তিনি তুচ্ছ বিষয়াদি উপেক্ষা করতে থাকেন এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে যেমন—ক্ষমতা হস্তান্তর ও তাঁর পূর্বতন পদে ফিরে যাওয়ার ওপরই তিনি তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন। তবে সংকট এড়ানোর জন্য তিনি যথাযথ নয়, বিএনপি সরকারের এমন সব সিদ্ধান্তও নীরবে অনুমোদন করেন। তবে তিনি সময় সময় যে বিএনপি সরকারের কিছু কিছু অবিবেচনাপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য বিক্ষুব্ধ হতেন না, তা নয়।

মন্ত্রিসভা গঠনের পরপরই অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সংসদীয় পদ্ধতির একজন সরকারপ্রধানের মতোই পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দেন।

প্রেসিডেন্টের বদলে প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করতে বলেন। নবগঠিত সরকার প্রথম থেকেই একটা সংসদীয় গণতান্ত্রিক পরিবেশে কাজ শুরু করুক, এটাই তিনি চেয়েছিলেন। তবে পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছিল, বিএনপি সরকার অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের অবস্থানের যথোপযুক্ত সৌজন্য বজায় রেখে তাঁর পরামর্শের প্রতি মনোযোগী হবে এবং সংবিধান ও তিন জোটের চুক্তি অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে সহযোগিতা করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, কেবল ফাইল ও রেকর্ডের আদান-প্রদান ছাড়া মন্ত্রীদের সঙ্গে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের যোগাযোগ খুবই কম হতো। তবে প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রিসভার দু-একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের শেষ ভাষণ

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন ও ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের মধ্যে যখন সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে, সে সময় অর্থাৎ মে মাসের শেষ দিকে আমি আভাস পাই, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার কথা ভাবছেন এবং সে সময় নিজের পদত্যাগের ঘোষণাও হয়তো দিতে পারেন। এ ধরনের আভাস পেয়ে আমি কিছুটা শঙ্কিত না হয়ে পারলাম না। বিএনপি সম্ভবত যা চাইছে, তিনি তা-ই করতে যাচ্ছেন। এতে করে দেশে প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতির সরকার বহাল রাখারই সুবিধা হবে এবং বেগম জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে সক্ষম হবেন। কিন্তু এভাবে সরকারপদ্ধতি-সংক্রান্ত বিষয়টির মীমাংসা হলে তাতে করে আবারও রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে। দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার পক্ষে। জনমতও এই পরিবর্তনের পক্ষে। কাজেই এই ইস্যুতে যদি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পদত্যাগ করেন, তাহলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তা অনুমান করতে বিশেষ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। এ সময় একদিন প্রেসিডেন্টের তথ্যসচিব তোয়াব খান আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দেওয়া সম্পর্কে কিছু জানি কি না। আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি জানান, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা লিখছেন এবং সম্ভবত শিগগিরই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। এর কয়েক দিন পর তোয়াব খান আমাকে বললেন, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর বক্তৃতা লেখা শেষ করেছেন। তবে ভাষণ প্রচারের কোনো তারিখ তখনো ঠিক

করেননি। বোঝা গেল, তিনি প্রস্তুত হয়ে আছেন, অবস্থা দেখছেন, সময়মতো ভাষণ দেবেন।

৪ জুন দুপুরে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ঘটনার অবতারণা হলো। সংস্থাপনসচিব হাসিনুর রহমান আমার দপ্তরে আসেন এবং আমার সাহায্য চান। তাঁকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক পদে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হকের নিয়োগ অনুমোদনের জন্য তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সুপারিশ করলেও অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তা অনুমোদন করেননি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা, যেভাবেই হোক এটা অনুমোদন করাতে হবে। সংস্থাপনসচিব আমাকে ফাইলটা দেখালেন। নিয়োগ অনুমোদন করতে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট যে মন্তব্য লিখেছেন, তা আমার কাছে খুবই যুক্তিসংগত ও অকাট্য মনে হলো। সরকারের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পদে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের নয় বছর পর ওই কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। সংস্থাপনসচিব বললেন, ভুল-বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুমোদন করা উচিত। আমি মন্তব্য পড়ে তাঁকে বললাম, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ যা লিখেছেন, তা কখনো পরিবর্তন করবেন না। সংস্থাপন সচিবের বিব্রতকর অবস্থা দেখে আমি ফাইলটি নিয়ে প্রেসিডেন্টের অফিসরুমে ঢুকলাম। সচিবও আমার পেছন পেছন এলেন। বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ফাইলটি আমার হাত থেকে নিয়ে শান্তভাবে সংস্থাপনসচিবকে বললেন, 'আপনি কি মনে করেন, আমি যা লিখেছি, তা ঠিক নয়? যদি তা ঠিক হয়, তাহলে আমি তা কখনো পরিবর্তন করব না। আপনি যেতে পারেন এবং এ কথা প্রধানমন্ত্রীকেও বলতে পারেন।'

সংস্থাপনসচিব দ্রুত প্রেসিডেন্টের অফিস ছেড়ে চলে গেলেন। এর কয়েক মিনিট পরই আমি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ড. কামাল সিদ্দিকীর টেলিফোন পাই। তিনি আমাকে বললেন, ওই সিদ্ধান্তে প্রধানমন্ত্রী খুবই আহত হয়েছেন, ফাইলসহ তিনি পুনরায় সংস্থাপনসচিবকে পাঠিয়েছেন। আমি যেন উল্লিখিত নিয়োগের অনুমোদনে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে সম্মত করাই। সংস্থাপনসচিব ফিরে এলে আবার তাঁকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের রুমে ঢুকলাম। এবার বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। যে কথা লেখা হয়েছে তাঁর উল্লেখ করে তিনি বললেন, 'হাকিম

পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু হুকুম পরিবর্তন হয় না। প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে বলতে পারেন, আমি চলে যেতে পারি; কিন্তু আমার নির্দেশ পাল্টাব না।' সংস্থাপনসচিব চলে যাওয়ার পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আমাকে বললেন, পরের দিন (অর্থাৎ ৫ জুন ১৯৯১) সন্ধ্যায় তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়।

চাপের মুখে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট

জাতির উদ্দেশে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণদানের আকস্মিক ঘোষণায় রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক যে হৃদ্যতাপূর্ণ নয় এবং যথেষ্ট টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে, তা অনেকটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ৫ জুন মধ্যাহ্ন নাগাদ ঢাকা নানা জল্পনাকল্পনা ও গুজবের নগরে পরিণত হয়। কেউ ভাবলেন, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পদত্যাগ করবেন, আবার কেউ ধরে নিলেন যে তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবেন। বিএনপির নেতারা নিশ্চিতভাবে ধরে নেন, মন্ত্রিসভা ভেঙে তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট যেহেতু দু-দুবার প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অগ্রাহ্য করেছেন এবং আকস্মিকভাবে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেহেতু তাঁদের এমন আশঙ্কা করার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বা অমূলক কিছু ছিল না। এ ঘটনার সঙ্গে আরেকটি বিষয়ের অপ্রত্যাশিত সংযুক্তি মন্ত্রিপরিষদের ওই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করে তোলে। ৩০ এপ্রিলের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বহু বিমান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কিছু জাহাজ ডুবে যায়। সংবাদমাধ্যম, জনমত এবং মন্ত্রীসহ রাজনৈতিক নেতারা এমন ক্ষতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে পূর্বাহ্নে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে ব্যর্থতার জন্য দুই বাহিনীর প্রধানদের দায়ী করেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং এর জন্য কে বা কারা দায়ী, তা বের করার জন্য দুটি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেন। একটা গঠন করা হয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে এবং অন্যটি সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল নুরুল হকের নেতৃত্বে। পৃথকভাবে প্রদত্ত উভয় কমিটিই কর্তব্যে অবহেলার জন্য দুই বাহিনীর প্রধানদ্বয় ও অপর কিছু সিনিয়র কর্মকর্তাকে দায়ী করে। আবহাওয়া অফিসের পূর্বসতর্কতা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদর দপ্তর পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়নি বলে মন্তব্য করা হয়।

দুটি তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সশস্ত্র বাহিনীগুলোর সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কর্তব্যে অবহেলার জন্য দায়ী অফিসারদের বিরুদ্ধে কঠোর শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর দুই প্রধানকে ৩ জুন চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয় এবং তাঁদের স্থলে নতুন প্রধান নিয়োগ করা হয়। এসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করেননি। তিনি মনে করলেন, দেশের সশস্ত্র বাহিনীর শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদিতে অনভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রীদের জড়িত করা উচিত হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিএনপির ঊর্ধ্বতন মহলে এ রকমের আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, কোনো দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ অবস্থানে তাঁর নিজের পছন্দের অফিস্যরদের বসাচ্ছেন (তাঁদের ধারণা ছিল সেনাপ্রধান জেনারেল নূরউদ্দীন খানও তাঁর সঙ্গে আছেন)। কাজেই রাজনৈতিক সতর্কতামূলক প্রতিরোধব্যবস্থা হিসেবে বিএনপি হাইকমান্ড ৫ জুন বিকেলে ঢাকায় একটা জনসভা অনুষ্ঠানের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ভাষণ দেবেন। ৪ জুন রাত থেকেই বিএনপির কর্মীরা রিকশায় মাইক লাগিয়ে বিএনপির জনসভার কথা প্রচারের জন্য নেমে পড়েন। পরের দিনও সকাল থেকেই পুরোদমে প্রচারাভিযান চলতে থাকে। মজার ব্যাপার হলো, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বাসভবনের চারপাশে এই প্রচারের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি ছিল।

৫ জুন সকালে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে পৌঁছার পর থেকে মন্ত্রীসহ বহু লোকের টেলিফোন পাই। কী ঘটছে, তা জানার জন্য অনেকেই উদ্বিগ্ন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কী করতে যাচ্ছেন, পদত্যাগ না অন্য কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তা জানতে তারা খুবই আগ্রহী। কোনো কোনো মন্ত্রীও জানতে চান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে কি না। আমি আমার অজ্ঞতার কথা প্রকাশ করি, তবে তাঁদের অনুমানমতো সে রকম কিছু ঘটছে না বলে আশ্বস্ত করি। মন্ত্রীদের খুবই শঙ্কিত মনে হলো। উত্তেজনা ও ভুল অনুমানের বিষয়টি লক্ষ করে আমি একবার বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সামনে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, তিনি একেবারেই উত্তেজনামুক্ত ও পুরোপুরি স্বাভাবিক মেজাজে। তবুও বললাম, তাঁর ভাষণকে কেন্দ্র করে চারদিকে প্রচুর জল্পনাকল্পনা ও গুজবের ছড়াছড়ি। বিএনপি মনে করছে, তিনি হয়তো মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবেন। রাজনৈতিক মহলে প্রচুর ভুল-বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির ছড়াছড়ি।

তিনি হেসে বললেন, 'তাদের জল্পনাকল্পনা ও অনুমান করতে দিন। রাতে যখন তারা আমার ভাষণ শুনবে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।' তিনি আরও বললেন, 'আপনি কি মনে করেন, আমি বোকার মতো কিছু করব?'

আমার অফিসে ফিরে এসেই দেখি তোয়াব খানের হাতে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণের একটা কপি। পড়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। আমি বিকেলে যখন গাড়িতে তাঁর সঙ্গে বাসায় যাচ্ছিলাম, তখন আমার আশঙ্কার যথার্থতা স্বীকার করে হেসে তিনি বললেন, 'জানেন, বিএনপির কর্মীরা কী করেছে? তাদের প্রচারকর্মীরা আমার বাসার চারদিকে বারবার রিকশায় করে মাইকে জনসভার কথা প্রচার করে চলেছে।'

১৯৯১ সালের ৫ জুন রেডিও ও টেলিভিশনে প্রদত্ত অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণের সুবাদে বিএনপির ক্ষমতা হারানোর অনুমান দূর হয়ে যায়। তবে ওই ভাষণ প্রধানমন্ত্রী, তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও সাংসদদের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর-সংক্রান্ত সংবিধানসম্মত ফর্মুলা উদ্ভাবনের দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশ যে একটা সাংবিধানিক সংকটে রয়েছে, এই ভাষণে তারও প্রতিফলন ঘটে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অনিশ্চয়তার প্রশ্নে তাঁর গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কথা গোপন করেননি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং দেশের অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল নাগরিকেরা তাঁর ভাষণের প্রশংসা করেন। প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পথ বের করার ব্যাপারে পরবর্তী বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই সাংবিধানিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদের প্রতি আহ্বান জানান। সরকারপদ্ধতির বিষয়ে দ্রুত একটা সমাধানে পৌঁছার জন্য বিশেষ আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সব রাজনৈতিক দলের মতৈক্যই ছিল প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের ভিত্তি। কিন্তু যেহেতু সেই ভিত্তির আর অস্তিত্ব নেই, সেহেতু তিনি আর কোনো বিতর্ক সৃষ্টির আগেই এই পদ থেকে সরে দাঁড়াতে আগ্রহী। তিনি উল্লেখ করেন, জাতীয় সংসদের গত অধিবেশনে একজন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে তিনি নিজের ইচ্ছায় তাঁর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন। অত্যন্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে তিনি বলেন, 'এর অর্থ দাঁড়ায়, আমি ইচ্ছা করে ক্ষমতা আঁকড়ে আছি। এ ধরনের বিবৃতিকে শুধু এক ব্যক্তির মতামত হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, কারণ, সংশ্লিষ্ট দল এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেনি।' তিনি আরও বলেন, 'একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কে দেশ চালাচ্ছে—প্রধানমন্ত্রী না অস্থায়ী

প্রেসিডেন্ট? কেউ কেউ বলেন, শয়তানি ভূত জাতির ওপর ভর করেছে, এ অবস্থা আমাকে অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে।' তিনি তাঁর ১১ মিনিটের ভাষণে পূর্ববর্তী তিন মাসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং তাঁর বর্তমান পদ থেকে সরে যাওয়ার আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ৬ এপ্রিল (১৯৯১) জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, সংবিধান অনুযায়ী তিনি কারও কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন না এবং যখন একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এই পদে অধিষ্ঠিত হবেন, কেবল তখনই তাঁর মেয়াদ শেষ হবে। প্রেসিডেন্টের অসুস্থতা কিংবা মৃত্যুসংক্রান্ত কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শুধু স্পিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই পদে অধিষ্ঠিত হবেন। তিনি ১৫০ ধারা অনুসারে সংবিধানের চতুর্থ সিডিউলে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ও সাময়িক ধারা সংযোজনের জন্য জাতীয় সংসদের প্রতি আহ্বান জানান। এ ধরনের ধারা সংযোজনের ফলে কোনো বিতর্ক ছাড়া ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো এবং তাঁর পূর্ব পদে প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম হবে।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে আরও উল্লেখ করেন, পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন ৪১ দিন চললেও এ ধরনের কোনো ধারা সংযোজন ছাড়াই তা শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং গণতান্ত্রিক বিধি অনুসারে দেশ পরিচালিত হোক, সেটা চাই...। সংবিধানে প্রদত্ত সব ক্ষমতা যদি আমি প্রয়োগ করতে যাই, তাহলে মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে।' তিনি বলেন, সংবিধানের অধীনে মন্ত্রিপরিষদকে যথেষ্ট ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং বিশ্বে দেশের সম্মান বাড়ানোর লক্ষ্যেই তিনি এটা করেছেন। তিনি তাঁর ভাষণে উদ্বেগ প্রকাশ করে আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক মতভিন্নতা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও গণতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। বিশেষভাবে, তিনি সরকারপদ্ধতির ব্যাপারে বিদ্যমান বিরোধমূলক অভিমতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। একজন নির্দলীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যে এই বিতর্কে নিজেকে জড়াতে চান না, সে বিষয়টিও সুস্পষ্ট করে বলেন। তিনি ব্যাখ্যাসহকারে এ-ও বলেন, সংসদীয় পদ্ধতিতে উত্তরণ ঘটলে তাঁর পক্ষে প্রেসিডেন্টের পদ ছাড়ার প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হবে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণ বিএনপিকে ঘুম থেকে জাগানোর ছিল। এবার তারা বুঝতে পারে, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট খুবই সিরিয়াস, তিনি যা

বলেছেন, তিনি তা সত্যি সত্যিই বাস্তবায়ন করতে চান। এ ছাড়া জনসাধারণ এ ভাষণের মাধ্যমে তাঁর বর্তমান নাজুক অবস্থাটাও উপলব্ধি করতে পারে। বিএনপি কেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ঠেলে ফেলতে চায়, সেটাও মানুষ বুঝতে পারে। প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতি অব্যাহত রাখার সুযোগ লাভ করাই বিএনপির লক্ষ্য। তবে বিএনপির নেতারা দ্রুত উপলব্ধি করেন, এ ধরনের উদ্যোগ তাঁদের জন্য আরও সমস্যারই জন্ম দেবে। তাঁরা এ-ও বুঝতে পারেন, সংসদীয় পদ্ধতি ছাড়া তাঁদের আর কোনো বিকল্প নেই। তখন পর্যন্ত বিএনপি ও জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি ছাড়া সব রাজনৈতিক দল সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। এমনকি জামায়াতে ইসলামী, যারা সরকার গঠনের ব্যাপারে বিএনপিকে সাহায্য করেছে, সরকারপদ্ধতি পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নেয়। এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, জনমত সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বেগম জিয়াকে এটাও বোঝাতে সক্ষম হন, সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলে তিনি একজন শক্তিশালী সম্ভাব্য প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবেন। এখনো গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর প্রচুর সমর্থক আছে, অর্থ ও পেশিশক্তি আছে, সর্বোপরি সামরিক-বেসামরিক আমলা ও ব্যবসায়ী মহলের মধ্যেও তাঁর জোরালো সমর্থন রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংসদীয় সরকারপদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন

বিতর্কের অবসান

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষণের পর সবকিছু বেশ দ্রুত চলতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন পর তাঁর নীরবতা ভাঙেন। জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত রেডিও-টেলিভিশন ভাষণে তিনি দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার সরকার চালুর পক্ষে বিএনপির সমর্থনের ঘোষণা দেন। ১৯৯১ সালের ২ জুলাই জাতীয় সংসদে দুটি বিল উত্থাপিত হয়, যা একাদশ ও দ্বাদশ সংবিধান সংশোধনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এর প্রথমটিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নিয়োগ ও পরবর্তীকালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যেসব আদেশ-নির্দেশ দেন, তার বৈধতা দানের লক্ষ্যে সংবিধানের চতুর্থ সিডিউলে সংশোধনী আনার প্রস্তাব করা হয়। উত্থাপিত এই বিলে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর মূল পদে প্রত্যাবর্তনেরও প্রস্তাব করা হয়। সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল অনুমোদনের ব্যাপারে কোনো সমস্যাই দেখা দেয় না, এটা ছিল একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। কিন্তু সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল, যাতে সংসদীয় সরকারপদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব করা হয়, তা নিয়ে প্রকৃত সমস্যার উদ্ভব ঘটে। আওয়ামী লীগ শুরু থেকে এ পদ্ধতির পক্ষে বলে আসছিল, কিন্তু দ্বাদশ সংশোধনী বিল যখন উত্থাপিত হয়, তখন তারা এই বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল করা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই বিলের পক্ষে ভোট

দেবে না। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের বিচারানুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছিল।

ওদিকে জাতীয় সংসদে বিতর্ক চলার সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে নতুন করে আরও মতভেদ দেখা দেয়। খোলা ব্যালটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, অসাংসদ মন্ত্রীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা রাখা এবং এমপিদের দল বদল প্রভৃতি বিষয়ে আওয়ামী লীগ আপত্তি প্রকাশ করে। সরকারপদ্ধতি পরিবর্তনের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টির জন্য বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগকে দোষী করে এ ব্যাপারে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সাহায্য কামনা করেন। ১৯৯১ সালের ২ আগস্ট কয়েকজন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্ট করেই বললেন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল যদি অনুমোদিত না হয়, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করবেন। এর পরের দিন তিনি আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগের নেতাদের ডাকেন। শেখ হাসিনা বিল অনুমোদনে বাধা প্রদানের অভিযোগ খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, বিলে কোনো অগণতান্ত্রিক ধারা সংযোজিত হোক, এটা আওয়ামী লীগ চায় না। ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট দুটি বিলই জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। কেবল জাতীয় পার্টি এর বিপক্ষে ভোট দেয়। জাতীয় সংসদ কর্তৃক দুটি বিল গ্রহণের পর প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন বিল সংসদে আবার জোরালো বিতর্কের সৃষ্টি করে। অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে বিরোধী দলগুলো এর বিরোধিতা করে। তবে ১৯৯১-এর ১৪ আগস্ট এই বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়—১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর। এদিকে বড় ধরনের কোনো বিরোধিতা ছাড়াই ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়। যদিও ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম (৩৫ শতাংশ), তবু দেখা যায়, ৮৫ শতাংশ ভোটার সংশোধনীর পক্ষে মত দেন। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সম্মতির পর দেশে আবার সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের বিধান কার্যকর হলো। সংশোধিত সংবিধানের অধীনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ ১৯ সেপ্টেম্বর শপথ নেয়। অতঃপর একজন নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগ পর্যন্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ একজন নামেমাত্র প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে বহাল থাকেন।

এদিকে এক বিতর্কের অবসান হতে না হতেই আরেক বিতর্কের সৃষ্টি হলো। হঠাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের জারি করা প্রেসিডেন্ট

নির্বাচন (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স ১৯৯১ নামে একটা অর্ডিন্যান্স বিশেষ গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এটা ছিল মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে অনুমোদিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বিল ১৯৯১-এর সংশোধনী। রাজনৈতিক মহল ও প্রচারমাধ্যমে এই অর্ডিন্যান্স নিয়ে দারুণ হইচই শুরু হয়ে যায়। অর্ডিন্যান্সটি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। বিএনপির সব সাংসদ কর্তৃক তাঁদের প্রার্থীকে সমর্থনদানের বিষয়টি সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য থেকেই এই অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এতে একটি ধারা রাখা হয়, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিষয়টি জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর অর্থ হলো, যদি কোনো সাংসদ ভোট দিতে দলীয় সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করেন, তাহলে তিনি সংসদ সদস্যপদ হারাবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বার সমিতি কঠোরভাবে এই অর্ডিন্যান্স জারির নিন্দা এবং এর বিরোধিতা করে। তারা একে সংবিধানের লঙ্ঘন এবং স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারের অস্বীকৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করে। নির্বাচিত সাংসদদের প্রতি ও সার্বভৌম পার্লামেন্টের প্রতি অনাস্থাও প্রকাশ পায় এর মধ্য দিয়ে। যদিও সমালোচনার লক্ষ্য ছিল ক্ষমতাসীন দল, তবু অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভূমিকাও কম বিতর্কিত হলো না। বিএনপি তাদের প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাসের নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্যই এই বিধান করে। বিএনপির হাইকমান্ড আশঙ্কা করছিল, বিএনপির অনেক সাংসদ তাঁর পক্ষে ভোট দেবেন না। নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত তারিখের মাত্র ১০ দিন আগে এই অর্ডিন্যান্স জারি করার ফলে বিএনপির নেতারা যে তেমন একটা গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নন, সেটাই প্রকাশ পায়। এই অর্ডিন্যান্স কার্যকর করতে গিয়ে যা করা হয়েছে, তাতে করে তিনি অনেক মহলের সমালোচনার শিকার হন। দেখা যায়, ২৮ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এই অর্ডিন্যান্সে সই করেন, অথচ তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ৩০ সেপ্টেম্বর।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে অনেকে এই বলে দায়ী করেন যে তিনি তাঁর নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন। এটা ঠিক নয়, কেননা সংসদীয় সরকারপদ্ধতির অধীনে প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। যা হোক, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এই অর্ডিন্যান্স অবিলম্বে বাতিল করে ক্ষতি হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেন। আমার মনে আছে, ২৮ সেপ্টেম্বর বিকেল থেকে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। তিনি ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অফিস করতে পারেননি।

এই জ্বর তাঁকে খুবই দুর্বল করে ফেলে এবং শয্যাশায়ী থাকতে বাধ্য করে। আমি নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে যেতাম এবং চিকিৎসার তদারকি করতাম। প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত চিকিৎসক কর্নেল আনোয়ার হোসেন নিয়মিত তাঁর দেখাশোনা করতেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, প্রেসিডেন্ট কেন অফিসে যাচ্ছেন না, এ ব্যাপারে মন্ত্রী বা সচিবদের কেউ খোঁজও করতেন না। ১ অক্টোবর সকালে আমি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর অসুস্থতার কথা জানাই এবং তাঁকে দেখতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি। মন্ত্রিপরিষদের তিনজন সদস্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ওই দিন সন্ধ্যায় তাঁর বাসভবনে তাঁকে দেখতে যান। এ সময় তিনি শারীরিক অসুস্থতার চেয়েও কয়েক দিন আগে যে অর্ডিন্যান্সটি জারি করেছিলেন, সেটা নিয়েই মানসিকভাবে বেশি বিপর্যস্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর অসন্তোষের কথাও ব্যক্ত করেন এবং অতিসত্বর অর্ডিন্যান্সটি বাতিল করতে চান। যথাযথভাবে পরীক্ষা ছাড়া এ ধরনের একটা বিতর্কিত অর্ডিন্যান্স কীভাবে অনুমোদিত হলো, এটা জানতে আমি কৌতূহলী ছিলাম। আমি এডিসির কাছ থেকে জেনেছি, ২৮ অক্টোবর রাতে আইন ও বিচারমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাসায় যান। যদিও তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন, তবু মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আমাকে বলেছেন, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর কাছে আনা কাগজগুলো তিনি ভালোভাবে দেখতেও পারেননি। এতে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশকৃত সই ছিল দেখে পরীক্ষা না করেই তিনি তাতে সই করে দেন। তবে পরবর্তীকালে এই অর্ডিন্যান্সটি প্রত্যাহার করা হয়।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বিদায়

১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর সংবিধানের সংসদীয় পদ্ধতির বিধানমতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির প্রার্থী হিসেবে আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। মোট ভোট পড়ে ২৬৪টি। দেখতে দেখতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সামনে এসে গেল প্রেসিডেন্টের পদ থেকে তাঁর সরে যাওয়ার দিনটি। পরের দিন আবদুর রহমান বিশ্বাস শপথ গ্রহণ করবেন, অন্যদিকে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর আগের পদে ফিরে যাবেন। তাঁকে বঙ্গভবন থেকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে আমি খুবই উৎসাহী ছিলাম। অতীতে কোনো প্রেসিডেন্টই আনুষ্ঠানিক

বিদায় সংবর্ধনা পাননি এবং এর কোনো দৃষ্টান্তও নেই। এ বিষয়ে আমি সেপ্টেম্বরেই সেনাপ্রধানের সঙ্গে আলোচনা করি এবং সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তাব করি। তিনিও এতে আগ্রহী হন। বিদায় সংবর্ধনার অংশ হিসেবে ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে পুরান বিমানবন্দরে তাঁর সম্মানে আন্তসার্ভিসের একটা গার্ড অব অনারের ব্যবস্থা করা হয়। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং গার্ড পরিদর্শন করেন। পরে তিনি সেনা সদর দপ্তরে তিন বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং চা-চক্রে মিলিত হন। এর অনুসরণে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এবং সরকারের সচিবেরা বঙ্গভবনে তাঁকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানান।

৯ অক্টোবর সকালে নতুন প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণের আগে বঙ্গভবনে একটা অনাড়ম্বর, ভাবগাম্ভীর্য অথচ আন্তরিকতাপূর্ণ এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর আগে ৮ অক্টোবর রাতে আমি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে বিদায় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করি। তিনি আনন্দের সঙ্গে আমার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ওই দিন সকালে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বঙ্গভবনে পৌঁছলে তাঁকে প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের একটি দল গার্ড অব অনার প্রদর্শন করে। এরপর তিনি বঙ্গভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বাহিনী ও গার্ড রেজিমেন্টের অফিসারদের উদ্দেশে বিদায়ী ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের আগে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে বিদায় জানিয়ে কিছু কথা বলি এবং নতুন প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে একটি বঙ্গভবন ক্রেস্ট উপহার দিই। রোগভোগের কারণে তাঁকে খুবই বিষণ্ন ও দুর্বল দেখাচ্ছিল, কিন্তু মানসিকভাবে তিনি অত্যন্ত সজীব ছিলেন। বক্তৃতায় তিনি তাঁর দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সহযোগিতা ও সদিচ্ছার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। আমাদের প্রশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কিছু মন্তব্য স্মরণ রাখার মতো ছিল। তিনি বলেন, 'কারও প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ না হয়ে স্বল্প মেয়াদের মধ্যে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবং পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'সর্বাধিক জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে যেমন কোনো সরকারের ভীত হওয়া উচিত নয়, তেমনি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করতেও দ্বিধান্বিত

হওয়া উচিত নয়।' তিনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে চা পান করেন এবং বঙ্গভবন জাদুঘর (তোশাখানা হিসেবে পরিচিত) পরিদর্শন করেন। তোশাখানা পরিদর্শন শেষে তিনি একটি আনুষ্ঠানিক মোটর শোভাযাত্রাসহকারে বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। আমি, এডিসি, নিরাপত্তা বাহিনী ও গার্ড রেজিমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাসা পর্যন্ত যাই। বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এই প্রথম একজন প্রেসিডেন্ট তাঁর পদের শোভনতা রক্ষা করে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বঙ্গভবন থেকে বিদায় নিলেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন মাত্র ১০ মাস তিন দিন। এত অল্প সময়ে তিনি যে কর্ম সম্পাদন করে রেখে গেছেন, তা বহু দিক থেকেই ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁকে অনেক কঠিন ও স্পর্শকাতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু সব সময়ই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অটল এবং তাঁর লক্ষ্যের প্রতি আস্থাশীল। সময়ে সময়ে তিনি একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা, নিন্দা ও চাপের শিকার হয়েছেন। অনেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য তাঁর আন্তরিকতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে তাঁর মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেননি। আমি তাঁকে দেশের প্রশাসন পরিচালনা করতে দেখেছি। একজন বিচারক হিসেবে তিনি যেমন সুখ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন; তেমনি তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি সরল প্রকৃতির একজন পুরোনো ধাঁচের মানুষ, আধুনিক যুগের জীবনধারার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। উচ্চপদের অবস্থান তাঁর কিংবা তাঁর পরিবারের আচার-আচরণকে পাল্টাতে পারেনি। নিজের জন্য নতুন পোশাক কেনার প্রস্তাব তিনি অবলীলায় অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর বাসার ড্রয়িংরুম ও অফিস রুমের কিছু আসবাবপত্রের পরিবর্তন ও সংযোজনে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। চাকচিক্য ও বিলাসব্যসন কিংবা একাধিক অফিস বজায় রাখলেই কারও কাজের মান উন্নত হবে—এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন।

একবার তিনি মিন্টো রোডে প্রেসিডেন্টের জন্য নির্মাণাধীন বিতর্কিত বাসভবনটি পরিদর্শন করতে যান। সাবেক প্রেসিডেন্টের আমলে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়, কিন্তু বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এর কাজ স্থগিত থাকে। গণপূর্ত বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী ভবনটির

পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন এবং নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু করার পরামর্শ দেন। এমন ব্যয়বহুল প্রকল্পের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ নির্বাচিত সরকারই সিদ্ধান্ত নেবে—এ কথা বলে তিনি উল্লিখিত প্রস্তাবে সম্মত হননি। ওই সময় ভবনটির আনুমানিক নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩ দশমিক ৮৫ কোটি টাকা (পরে কাজ সম্পূর্ণ হতে মোট ব্যয় হয় ১৩ কোটি টাকা)। তিনি প্রায়ই বলতেন, বাংলাদেশের মতো একটা গরিব দেশের প্রেসিডেন্টের কখনো জমকালো ধরনের কর্মপদ্ধতি বা জীবনধারা অনুসরণ করা উচিত নয়। সুষ্ঠু প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, উপযুক্ত রীতিনীতি ও সৌজন্য বজায় রেখে তিনি সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। অফিসে আসার ব্যাপারে তিনি সর্বদাই নিয়মানুবর্তী ছিলেন। আমি তাঁকে কখনো কোনো অনুষ্ঠান বা বৈঠকে দেরিতে যেতে দেখিনি। অফিসের কাজকর্মের বাইরে তিনি যেটুকু সময় পেতেন, তার অধিকাংশ ব্যয় করতেন বাসায় রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড-সম্পর্কিত কাজে। সাধারণত তিনি ফাইলের কাজ দ্রুত শেষ করতেন এবং খুব কম কাজই ফেলে রাখতেন। জটিল বিষয় হলে তিনি সতর্ক বিবেচনার জন্য ফাইল বাসায় নিয়ে যেতেন এবং পরের দিন সকালে তা ফেরত নিয়ে আসতে ভুলতেন না। জাতীয় স্বার্থে সময়মতো সাহসী ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে তিনি দ্বিধা করতেন না, তবে ন্যায়নীতি ও সংবেদনশীল মনোভাব কখনো তাঁকে ছেড়ে যায়নি। 'সুপারিশ', 'তদবির' ইত্যাদির চাপ কখনো তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি।

দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদাধিকারবলে যেসব সুযোগ-সুবিধা তাঁর প্রাপ্য ছিল, তা গ্রহণে তিনি সতর্ক ছিলেন। বঙ্গভবনের সরকারি গৃহস্থালি-বিষয়ক সেবা খুব কমই গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেতন-ভাতার মতো কোনো আর্থিক সুবিধা এবং অন্যান্য সহায়তা নেননি। বঙ্গভবন থেকে খাদ্য কিংবা পরিবেশনসেবাও গ্রহণ করেননি। সাধারণত অফিসে এবং ঈদের মতো অনুষ্ঠানে কিংবা তাঁর বাসায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ অতিথিকে ডাকা হলে শুধু চা ও হালকা খাবার পরিবেশন করা হতো। তিনি সরকারি কাজে একটি প্রেসিডেনশিয়াল গাড়ি এবং তাঁর পরিবারের জন্য একটি সাধারণ গাড়ি ব্যবহার করতেন। বিদেশে আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলতে যে টেলিফোন কল করেছিলেন, সেই বিলগুলো পরিশোধ করে গেছেন। কোনো সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে কখনো দেখা যায়নি। এমনকি বঙ্গভবনে বিজয় দিবস কিংবা জাতীয় দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, সরকারি প্রটোকলের অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর

পাশে থাকার জন্য স্ত্রীকে রাজি করানো যায়নি। দেশের প্রধান নির্বাহী পদে উন্নীত বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের পরিবারের কোনো সদস্যের মধ্যে গর্বস্ফীত মনোভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে তাঁর বাসায় যাওয়ার ব্যাপারটি অনুমোদন করতেন না। স্পষ্ট করেই বলতেন, প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। বোঝাই যায়, নিজের সুনাম রক্ষা করা এবং অসংগত হস্তক্ষেপ ও অশুভ ধরনের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্যই পারিবারিক পর্যায়েও তিনি এ ধরনের একটা অপ্রীতিকর আচরণগত পন্থা অনুসরণ করতেন। পারিবারিক সুনাম রক্ষা করতে হলে পরিবারের সবাইকে কিছু না কিছু ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার করতেই হয়। আমাদের সমাজে আমরা এটা দেখতেই অভ্যস্ত, কেউ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলে তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সুযোগসন্ধানীরা তাঁকে ঘিরে রাখেন। অন্যায়ভাবে সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেওয়াই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছিলেন এসব কিছু থেকে মুক্ত এক দুর্লভ ব্যতিক্রম। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এড়িয়ে চলতে পেরেছিলেন। স্তাবক ও মোসাহেব, আনুকূল্যপ্রত্যাশী ও সুযোগসন্ধানীদের বেশ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

একদিন তাঁর কাছে আমি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক ও সামাজিক অবস্থানের গুরুত্ব আমার কাছে ব্যাখ্যা করে বলেন, বাংলাদেশের মতো সাংবিধানিকভাবে কর্তৃত্ববঞ্চিত ও ক্ষমতাহীন প্রেসিডেন্ট উপমহাদেশে কিংবা সংসদীয় পদ্ধতি রয়েছে, এমন কোনো দেশের কোথাও নেই। এমনকি ভারতে, যেখানে প্রায় ৪০ বছর ধরে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান, সেখানেও দেশের প্রেসিডেন্টের অবস্থানকে এতটা খাটো করা হয়নি। মনে হয়, রাজনৈতিক দলগুলো অন্য ক্ষেত্রে না হলেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐক্যের পরিচয় দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের অবস্থান সম্বন্ধে সবকিছু শোনার পর আমার মনে হয়েছে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী হবেন না। পরে একদিন এক বক্তৃতায় তিনি প্রেসিডেন্টের অবস্থানের প্রতি বিরূপ মনোভাব

প্রকাশ করে বলেন, 'মাজার জিয়ারত ছাড়া বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের আর কোনো কাজ থাকবে না।'

৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় আবদুর রহমান বিশ্বাস সংসদীয় সরকারপদ্ধতির অধীনে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এভাবে প্রেসিডেন্ট এরশাদের পর সাংবিধানিকভাবে প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হলো। সন্ধ্যায় নতুন প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস দেখা করার জন্য বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বাসায় যান এবং জাতির মঙ্গলের জন্য তিনি যে দায়িত্ব পালন করেছেন, সে জন্য তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট বিশ্বাসকে ধন্যবাদ জানান। বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনাসহ অধিকাংশ খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য, সাইফুর রহমান ও লে. কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন ছাড়া বিএনপি ও জাতীয় পার্টির কোনো নেতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাননি। অতি স্বল্প মেয়াদে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কার্যকরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে যে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন, বাংলাদেশের মানুষ নিশ্চয়ই তা মনে রাখবে।

সপ্তম অধ্যায়

সেনাবাহিনীতে শেষ দিনগুলো

একটি শাস্তিমূলক বদলি

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বিদায়ের পর আবদুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি হন। তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়ার পঞ্চম দিনে সেনাবাহিনীতে আমার বদলির নির্দেশ আসে। বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার প্রধান হিসেবে আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ পদে আমি আগেও দুই বছর দায়িত্ব পালন করেছি। তারপর আমাকে প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব করা হয়েছিল। এখন আবার আমাকে সেখানেই পাঠানো হলো। এই বদলি আমাকে খুবই মর্মাহত করে। যথেষ্ট মানসিক যন্ত্রণারও কারণ ঘটায়। ভেবে পাচ্ছিলাম না, কেন আমাকে স্বাভাবিক বদলির বদলে শাস্তিমূলক বদলি করা হলো। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগ ঘোষণার আগে ও পরে আমি যে ভূমিকা পালন করেছি, তার বিবরণ এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে তুলে ধরেছি (যা *ভোরের কাগজ* ও *ডেইলি স্টার*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে বই আকারে বের হয় *এরশাদের পতন ও সাহাবুদ্দীনের অস্থায়ী শাসন : কাছে থেকে দেখা* নামে)। সে সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় যে দায়িত্ব আমি পালন করেছিলাম, বহুলাংশেই তা সামরিক সচিবের দায়িত্ব-বহির্ভূত ছিল। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলাম আমি। এ পদক্ষেপগুলো সময়মতো নিতে ব্যর্থ হলে দেশে যে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটত এবং চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো,

সে কথা হয়তো এখন আর কারও মনে আসবে না। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৬ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত নানা চক্রান্ত ও অপতৎপরতা চালিয়েছিলেন। মূলত, আমার সময়োচিত পরামর্শে সেনা সদর দপ্তরের তৎকালীন কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দ্রুত কৌশলগত পদক্ষেপ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে তিনি তাঁর পরিকল্পিত অপতৎপরতা সফল করতে পারেননি। এর ফলে সেদিন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের পক্ষে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ সহজতর হয়েছিল। ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার পরও সাবেক প্রেসিডেন্ট এমন কিছু কূটকৌশলী চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যা বুঝতে পেরে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সরাতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য, ঢাকায় প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন চলাকালে সেনাবাহিনী যে প্রেসিডেন্টের পেছনে নেই, এ তথ্যটি ৪ ডিসেম্বর দুপুরে আমিই প্রেসিডেন্ট এরশাদকে জানিয়েছিলাম। সে সময় এমন গুরুত্ববহ সংবাদটি তাঁকে সরাসরি জানাতে সেনা সদর দপ্তরের জেনারেলরা ইতস্তত করছিলেন। বলা বাহুল্য, এ তথ্য জেনে তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আর ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি বলে বেড়িয়েছেন, দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থা পরিহার করতেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন। পদত্যাগের ঘোষণার পরও তিনি মার্শাল ল জারি করে সেনাপ্রধান বা কোনো এক জেনারেলকে প্রধান সামরিক শাসক নিয়োগ করে আরও কিছুকাল ক্ষমতায় থেকে নিজের প্রস্থান নিরাপদ করতে চেয়েছিলেন। এসবের বিবরণ আমার লেখা বইয়ের ওই অধ্যায়ে রয়েছে। তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দীন খান, আমি ও সেনা সদর দপ্তরের মেজর জেনারেল আবদুস সালামসহ কয়েকজন কর্মকর্তার যৌথ প্রচেষ্টায় সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের সব অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরশাদবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে আরও যে কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলাম, পরে নির্বাচিত সরকার তার স্বীকৃতি দেওয়া বা মূল্যায়ন করার পরিবর্তে আমাদের 'সাইজ আপ' করতে শুরু করে। তাঁদের মধ্যে আমাকেই প্রথম শাস্তিমূলক বদলি করা হলো।

মনের কষ্ট ও উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন মন নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলাম। সেখানে তিন বছরাধিক কাল কর্তব্যরত থেকে স্বাভাবিক অবসর গ্রহণ করি। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমি আমার দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে ত্রুটি করিনি। এখানে দায়িত্বগত পরিধি খুবই সীমিত ছিল। প্রথমবার প্রচুর উৎসাহ নিয়ে সমরাস্ত্র কারখানার নানা বিষয়ে, বিশেষ করে সুশৃঙ্খল

পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদনক্রমে কতগুলো বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিয়েছিলাম, যার সুফল এখনো অব্যাহত আছে বলে জানি। এবার তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। এখানে সচরাচর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দিনের কাজ শেষ হয়ে যেত। হাতে থাকত প্রচুর সময়। ভেবে পাচ্ছিলাম না, সময় কাটাব কী করে! বই পড়ার কিছু অভ্যাস ছিল। অতি ব্যস্ত সামরিক সচিবের দায়িত্ব নেওয়ার পর সেটা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই আবার শুরু করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু পারছিলাম না। বারবার মনে আসছিল সদ্য ফেলে আসা ঘটনাবহুল দিনগুলোর কথা। সামরিক সচিবের দায়িত্ব পালন করার সময় যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেসব লেখার একটা প্রবল ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হতে থাকে। বঙ্গভবনে থাকার সময় কম্পিউটার শেখার সুযোগ হয়েছিল। চাকরিজীবনের শুরুর দিকে শখ করে ইংরেজিতে টাইপ করা শিখেছিলাম। পরেও অল্পবিস্তর সেই অভ্যাস বজায় রেখেছিলাম। ফলে কম্পিউটার শিখতে গিয়ে খুবই সুবিধা হলো। ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাতেও টাইপ করা শিখে ফেললাম। এ কাজে বঙ্গভবন ও তৎকালীন প্রেসিডেন্টের দপ্তরের কম্পিউটার শাখার কয়েকজন কর্মকর্তা খুবই সহায়ক হলেন। সমরাস্ত্র কারখানায় এসে লেখালেখির প্রচুর সুযোগ পাওয়া গেল। কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে লেখালেখি শুরু করি। স্বীকার করছি, অকেজো ও অবাঞ্ছিত মনে করে তৎকালীন সরকার আমাকে সমরাস্ত্র কারখানায় নিয়োগ দিয়েছিল। তবে আমার জন্য তা যথেষ্ট ফলদায়ক হয়ে উঠেছিল।

লেখালেখির পাশাপাশি দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করার আগ্রহও বাড়তে থাকে। তিন বছরের মাথায় অবসর গ্রহণের পর লেখালেখি নিয়ে আরও উদ্যোগী হলাম। এর বছর খানেক পর দৈনিক সংবাদপত্রে লিখতে শুরু করি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে সুস্থ রাজনীতির ধারার সূচনা হবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, উন্নয়ন-সমৃদ্ধি ঘটবে এবং সর্বক্ষেত্রে শান্তিশৃঙ্খলা আসবে—একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি এমনটাই আশা করছিলাম। রাজনৈতিক দলের আদর্শ এবং সরকারপ্রধানের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিগত বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে (Establishment) কিছু পরিবর্তন করতে হয়। এর মূল বিবেচ্য থাকে প্রশাসনের শৃঙ্খলা ও দক্ষতা বৃদ্ধি। পরিবর্তনের প্রথম সূচনা হয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার ঊর্ধ্বতন স্তরের কর্মকর্তাদের বদলির মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের দেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় বসেই প্রশাসনব্যবস্থায় পরিবর্তনের যে

ধারা চালু করে চলেছে, তার ক্ষতিকর দিক কারও বিবেচনায় নেই। রাজনৈতিক বিবেচনাই মূল লক্ষ্য, যার সঙ্গে থাকে পছন্দ-অপছন্দ, স্বজনপ্রীতি, এলাকাপ্রীতি, বিশেষ গোষ্ঠীপ্রীতির মতো নানা উপাদান। আমার সর্বশেষ বদলির সূত্র ধরে এবং নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এখানে তৎকালীন সরকারের সেনাবাহিনী তথা সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থাপনা নিয়ে কিছু আলোচনা করছি। নতুন নির্বাচিত সংসদীয় সরকার সেনাবাহিনীতে ঊর্ধ্বতন স্তরে আনা প্রথম রদবদলে, অর্থাৎ পরিবর্তন ও পদায়নে (পোস্টিং) আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এর পেছনে রুটিন ও প্রথাগত পন্থা অবলম্বন কতটা ন্যায়নীতিভিত্তিক ও যুক্তিযুক্ত ছিল, তার রূপ আমি দেখেছি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সেনাপ্রধানের সুপারিশই মূল ভিত্তি হওয়ার বদলে একটি বিশেষ মহল এ ব্যাপারে তখন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে অতি কৌশলে সরকারপ্রধানের নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। পরে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে স্বপক্ষের ঘনিষ্ঠদের প্রমোশন দেওয়া ও পোস্টিংয়ের মাধ্যমে গড়ে তোলে একটি চক্র। তাদের প্রধান লক্ষ্যই থাকে সহযোগী-সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা স্বপক্ষের নন, তাঁদের হয় অগুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে পোস্টিং দেওয়া, প্রমোশনবঞ্চিত করা অথবা তাঁদের বাধ্যতামূলক অবসরের ব্যবস্থা করা। এর ফল যে শুভ হয় না, তার প্রকাশ ঘটে ১৯৯৬ সালে তৎকালীন সেনাপ্রধানের ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার মাধ্যমে (এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : ১৯৯৭ সালের ১৪-২০ জুন দৈনিক *সংবাদ*-এ প্রকাশিত লেখকের 'সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বিপর্যয় ও ক্ষমতার রাজনীতি' এবং ১৯৯৯ সালের ২-২০ জুন পর্যন্ত *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত 'মে ১৯৯৬ সালের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা সরকারের অদক্ষ হাতে সেনাবাহিনী পরিচালনার পরিণতি') লক্ষ করেছি, এমন অপপ্রয়াস পরবর্তী সময়েও চলেছে।

উপসংহার

অবসরজীবন

জীবনের সেরা সময় সামরিক বাহিনীতে কাটিয়ে যখন অবসর গ্রহণ করলাম, তখন থেকে শুরু হলো জীবনের শেষ অধ্যায়। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পেশায় দক্ষতা অর্জন। এ প্রচেষ্টা সব সময়ই অব্যাহত রেখেছি। পেশার প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য ও আস্থা রেখে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি ধারণ ও পালনের চেষ্টা করেছি। আত্মসম্মান ও বিবেকের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। সামরিক জীবনে যখন যে অবস্থানেই ছিলাম, দায়িত্ব সম্পাদনে কখনোই ব্যর্থ হইনি। একজন আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি হিসেবে সব ক্ষেত্রে এবং সব অবস্থায়ই সেনাবাহিনী ও নিজের সুনাম, সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছি এবং তাতে সক্ষম হয়েছি বলে মনে করি। কখনো কখনো ছোটখাটো বাধাবিঘ্ন, বিপদাপদ, অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও তা কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তেমন বেগ পেতে হয়নি। সবই সম্ভব হয়েছে পরম করুণাময় আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপায়। এ জন্য সব সময়ই তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানাই। আমি যে পেশার চাকরিতে নিয়োজিত ছিলাম, সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর সাধারণত দ্বিতীয় কোনো চাকরি বা পেশায় যাওয়ার অবকাশ বস্তুত খুবই সীমাবদ্ধ। চাকরিতে বহাল থাকার সময় অবসরপ্রাপ্তির পর কোনো ধরনের উপার্জনের কথা কখনো ভাবিনি। কিন্তু যে বয়সে (৫৫) ও যে পারিবারিক দায়দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অবসর নিতে হয়েছিল, তাতে করে অল্প সময়ের মধ্যেই উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগলাম। তা ছাড়া ব্যস্ত জীবন ছেড়ে

কর্মহীন হয়ে পড়ার যাতনাও টের পেলাম। অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রথমে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, পরে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। অচিরেই বুঝতে পারলাম, সেখানে আমি কতটা বেমানান (মিসফিট)! উভয় প্রতিষ্ঠান থেকেই স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই সটকে পড়তে হলো। সরকারি চাকরি করে অর্থাৎ সেনাবাহিনীতে এত বছর কাটিয়ে ঊর্ধ্বতন অবস্থানে পৌঁছানোর পর, বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে (যেখানে করপোরেট কালচার বলতে কিছু নেই) কাজ করা তেমন সুখকর কিছু নয়। আরও বুঝতে পারলাম, চাকরি, ব্যবসা বা রাজনীতি করার মতো যোগ্যতা আমার নেই। শেষমেশ কয়েকজন বন্ধু সংবাদপত্রে নিবন্ধ লেখায় আমাকে উৎসাহ দিতে থাকেন। সেই থেকে আমার লেখালেখির শুরু। সময় ভালোই কাটতে লাগল। অনেক বিষয় দেখার, জানার, শোনার ও বোঝার সুযোগ হলো।

ছাত্রজীবনে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকলেও রাজনীতিসচেতন ছিলাম। যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করি, তখন চলছিল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের যুগ। তারপর কালক্রমে এল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন অর্থাৎ পাকিস্তানি শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাসংগ্রামের কাল। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটল স্বাধীন বাংলাদেশের। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে অলিখিত 'পাকিস্তান ফেরত' অফিসার হয়ে গেলাম। তখন চলছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কিছু কুচক্রী রাজনীতিকের সহায়তায় কয়েকজন বিপথগামী ক্ষমতালোভী অফিসারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশের সহায়তায় পরিচালিত অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীদের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর শুরু হলো বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ও স্বৈরশাসনের যুগ। ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও তাঁর সামরিক ও বেসামরিক দোসরেরা তিন মাসের মধ্যে উৎখাত হলেন রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষমতায় আসীন হলেন দেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকারী মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি সামরিক শাসন অব্যাহত রেখে রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং চালু করেন বহুদলীয় রাজনীতি। তবে তিনি প্রেসিডেনশিয়াল সরকারপদ্ধতি চালু রাখেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে প্রায় ছয় বছর দেশ শাসন করেন। তাঁর শাসনামলে বেশ কয়েকটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা চলে। পরে তাঁরই অন্যতম বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা মেজর জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে

সংঘটিত অভ্যুত্থানে তিনি নৃশংসভাবে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর সিএমএইচে চিকিৎসাধীন ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে এর আগে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের একটি মৃদু উদ্যোগ ছিল, তখন এর বিরোধী মনোভাব প্রকাশের সুযোগ হয়েছিল এই লেখকের (এর পূর্ণ বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে)। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারকে দিয়ে সামরিক শাসন জারি করান এবং নিজেকে প্রধান সামরিক শাসক নিয়োগ করিয়ে বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। জেনারেল জিয়া যেমন কিছুদিন বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে কাজ করতে দিলেন, পরে নিজে দুটি দায়িত্বই নিজের কাঁধে তুলে নিলেন—জেনারেল এরশাদও তা-ই করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা রেখে যে সেনাবাহিনী বিশ্বজুড়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল, সেই সেনাবাহিনীর দুই প্রধান একজনের পর আরেকজন (স্বল্প বিরতি দিয়ে) দেশে পাকিস্তানি স্টাইলে প্রথমে সামরিক শাসন এবং পরে বেসামরিক লেবাসে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালিয়ে যান। তাঁদের প্রায় এক যুগের শাসনামলের দুর্নামের ভার সেনাবাহিনীকে বইতে হচ্ছে। এই অনুযোগ আমাকে ব্যথিত করে। আমি এই সেনাবাহিনীতে প্রায় ১৯ বছর কর্মরত ছিলাম। তাঁদের সহযোগীও ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রশংসনীয় কাজ করে আসছে। দুই সামরিক শাসকের আমলে দেশের যে উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, তা অস্বীকার করার নয়। কিন্তু তাঁদের আমলের দুর্নীতি, জেলজুলুম, অনিয়ম-অনাচার-স্বজনপ্রীতি ও নানা স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তিও যথেষ্ট দীর্ঘ। ওই সময়ে কৃত অপকর্মের দায়ভার ওই সময়কার কমান্ডারদের, বিশেষ করে সেনাদেরই বহন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে অনেক প্রশ্নই সামনে আসে। দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানেরা কেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠেন! তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে রাজনীতিকদেরই একটি অংশ। দেখা গেছে, এ ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা আর পাকিস্তান-ফেরত সেনানায়কদের মধ্যে পাকিস্তানি মনোবৃত্তির অপূর্ব মিল রয়েছে। জেনারেল জিয়া থেকে এরশাদ এবং সর্বশেষ নাসিম (যদিও ক্ষমতা দখলে ব্যর্থ হন) পাকিস্তানি জেনারেলদের অনুসরণ করতে একটুও দ্বিধা করেননি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার দাবিদার হলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের বেলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মডেলকেই অনুসরণ করেছেন। এই ধারা বন্ধ করার

ও গণতান্ত্রিক ধারা চালু রাখার মূল দায়িত্ব রাজনীতিকদের। এখানেই তাঁদের ব্যর্থতা বাড়ছে বৈ কমছে না। যুদ্ধোত্তর নতুন সেনাবাহিনী সংগঠনে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে যে কারণে ব্যর্থ হয়েছিল, সে দিকগুলো ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণে বিবেচনায় না রাখা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যেসব কারণে সুশৃঙ্খল বাহিনীতে সে সময়ে উচ্ছৃঙ্খলতা ঢুকে পড়েছিল, কমবেশি সে কারণগুলোরই রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় পরিসরেই আবারও অনুপ্রবেশ ঘটছে। সেনাবাহিনীতে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্ম ঘটে স্বাধীনতার পরপরই। সামরিক বাহিনী তথা দেশের স্বার্থেই এর কারণ অনুসন্ধান, নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করা প্রয়োজন। সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নিলেও এ বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি তুলে ধরা প্রয়োজন বলে মনে করে এখানে কয়েকটি দিকের অবতারণা করছি।

স্বাধীনতা-উত্তর সেনাবাহিনী পুনর্গঠন নিয়ে কিছু কথা

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ছিল দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের মূল চেতনা, কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানেই তার বিনাশ সাধন করে শুরু হলো স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। দুর্ভাগ্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির বদলে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা চালু করে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখনই দেশে স্বৈরশাসনের বীজ বপন করা হয়েছিল। পরে খন্দকার মোশতাক ও তাঁর কিছু সহযোগীর চক্রান্তের বাস্তব রূপের বহিঃপ্রকাশ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এতে অংশ নেয় কয়েকজন মেজরের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ। তাদের সফল হওয়ার প্রধান কারণ, সে সময়কার অতি দুর্বল কমান্ড কন্ট্রোল ও পেশাদারি দক্ষতার অভাব। এরই ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনীতে আবির্ভাব ঘটে আরও উচ্ছৃঙ্খলতা, হত্যাকাণ্ড, ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নানা অপতৎপরতা। সেনাবাহিনীর তথা জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে এখানে স্বাধীনতা-উত্তর সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বিপর্যয়ের মূল কারণগুলোর প্রতি আলোকপাত করাই আমার বিনীত উদ্দেশ্য।

নয় মাস স্থায়ী মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অপূর্ব সাহসী অবদান চিরদিন জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই অবদানকে ছোট করে দেখা, অস্বীকার করা বা অবমূল্যায়ন করার কোনো অবকাশ নেই। যাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামে সরাসরি নিয়োজিত থেকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জীবন বাজি

রেখে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, যাঁরা শাহাদাতবরণ করেছেন, যাঁরা আহত হয়েছেন, ইতিমধ্যে যাঁরা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যাঁরা এখনো জীবিত আছেন, তাঁদের সবাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র। সে সময়কার অন্যতম নেতৃস্থানীয় সেনানায়কেরা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী গঠনের হাল ধরেন। যাঁরা যুদ্ধকালে বিভিন্ন সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন, তাঁরাই এর গঠনপ্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এ কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ, জটিল ও সময়সাপেক্ষ। এমন অবস্থায় প্রয়োজন ছিল প্রজ্ঞাবান, অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সামরিক নেতাদের, যাঁদের পেছনে থাকবে ততোধিক গুণাগুণসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এ জায়গাটিতেই ছিল চরম ঘাটতি। সবচেয়ে বড় ঘাটতি ছিল অভিজ্ঞতার। যেকোনো যুদ্ধের পর শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। দেশকে দখলদার বাহিনীর হাত থেকে উদ্ধারের ডাকে সমাজের নানা অংশ থেকে আসা যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত কিছু দলীয় বাহিনীর উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণে সরকারকে প্রচুর বেগ পেতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ড নিয়মিত বাহিনী, অর্থাৎ সামরিক বাহিনীতেও দেখা দেয়। এদের সংগঠিত ও সুসংহত করা অতি প্রয়োজন ও গুরুত্ববহ হলেও খুবই কঠিন ছিল। তবে দ্রুততার সঙ্গেই তিন বাহিনী গঠিত হয়ে যায়। এ জন্য কমান্ডাররা কৃতিত্বের দাবিদার। কিন্তু কতগুলো অবিবেচনাপ্রসূত, অযৌক্তিক, অদূরদর্শী ও ব্যক্তি-গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষাকারী নীতি গ্রহণ করার ফলাফল হয়ে দাঁড়াল আত্মধ্বংসী। এর অন্যতম হলো সব মুক্তিযোদ্ধাকে ঢালাও দুই বছরের সিনিয়রিটি ও দ্রুত প্রমোশন দেওয়া। এর ফলে অতি সুবিধাপ্রাপ্ত কিছু অফিসার উচ্ছৃঙ্খলপ্রবণ ও উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠেন। এ সময় সরকারকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তা ছিল পাকিস্তানে আটক সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৩০ হাজার সদস্যকে বাংলাদেশের তিন বাহিনীতে আত্তীকরণ। সরকারের এই সিদ্ধান্ত সঠিক, বাস্তবসম্মত ও ন্যায়ানুগ হলেও অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা অফিসার এতে ক্ষুব্ধ হন। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সিদ্ধান্তগুলো সশস্ত্র বাহিনীতে বিভক্তির পথ প্রশস্ত করে তোলে। এরই সুবাদে কুচক্রী মহল ও উচ্চাভিলাষীরা সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে যাঁরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মহৎ অবদান তো বৈষয়িক প্রাপ্তির জন্য ছিল না। তাঁদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল যে তাঁরা দেশ স্বাধীন করেছেন, যাঁর স্বীকৃতি পাওয়াই ছিল মুখ্য বিষয়। বাদবাকি সবকিছুই ছিল গৌণ। এই মহৎ অবদানকে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব দ্বারা কলুষিত করা কাম্য ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকালে কেউই মেজর পদবির ওপরে ছিলেন না। প্রয়োজনের তাগিদে তাঁদের দু-এক ধাপ পদোন্নতি দেওয়া অসংগত বা অন্যায্যও ছিল না। কিন্তু দেড় বছর সময়ের ব্যবধানে দুই থেকে পাঁচটি প্রমোশন পেয়ে গেলেন সবাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বীরত্বসূচক খেতাব এবং এক ধাপ বা দুই ধাপের দ্রুততর (অ্যাকসিলারেটেড) প্রমোশন সব দেশের সশস্ত্র বাহিনীতেই প্রচলিত। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীতে যা কিছু ঘটেছে, তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। মেজর জিয়া ও মেজর সফিউল্লাহর মেজর পদ থেকে মেজর জেনারেল হতে সময় লাগে দেড় বছর মাত্র। উভয়ই যখন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন, তখন তাঁদের চাকরির বয়স ১৬ বছর। আর মেজর জেনারেল হন ১৮ বছরে। লক্ষ করার বিষয়, পাকিস্তান থেকে আটক হওয়া ব্যক্তিদের দেশে পৌঁছার আগেই দ্রুত প্রমোশন দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়। কারণ বোধগম্য, পাকিস্তান-ফেরত কোনো সিনিয়র অফিসারকে যেন ওই র‍্যাংক ও পদে বসানোর সুযোগ না থাকে। তারপর এল দুই বছরের ঢালাও সিনিয়রিটি। বঙ্গবন্ধু যে যথেষ্ট চাপে পড়ে দুই বছরের সিনিয়রিটি ও দ্রুত প্রমোশন দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, সেটা বোঝা যায়। এর একটি দৃষ্টান্ত জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিনকে সেনাপ্রধান নিয়োগ এবং পরে তা বাতিল করার ঘটনা। হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলাফল কত ভয়ংকর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, সেই ইতিহাস জাতি প্রত্যক্ষ করেছে। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের একটি বড় অংশই চায়নি যে পাকিস্তানে আটক হওয়া ব্যক্তিদের বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে গ্রহণ করা হোক। তাদের যুক্তি ছিল, দেশ স্বাধীন করেছেন তাঁরা, এই সেনাবাহিনী (অন্য বাহিনীসহ) গঠিত হবে কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। যাঁরা পাকিস্তানিদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, স্বাধীন দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁদের নেওয়া যেতে পারে না। কেউ কেউ তাঁদের ভারতে আটক হওয়া পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের সমকাতারের ভাবতেও দ্বিধা করেননি। এই যুক্তি যে নিতান্তই ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থতাড়িত ছিল, তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। নবগঠিত সশস্ত্র বাহিনীতে পাকিস্তান-ফেরত প্রায় দুই ডিভিশন শক্তিতুল্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যদের আত্তীকরণ না করলে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বিরূপ পরিণতি ডেকে আনত। একটি কারণই এখানে উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করছি। যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা বেকার হয়ে পড়লে তাঁদের অনেকে যে তখনকার সরকারবিরোধী সন্ত্রাসীদের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হতেন, সেই আশঙ্কা ছিল শতভাগ।

দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যেসব সেনাসদস্য অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান ও নন্দিত, কিন্তু যাঁরা পাকিস্তানে প্রায় দুই বছর যুদ্ধবন্দীর মতো আটক ছিলেন এবং মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদের সদ্য মুক্ত দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে গ্রহণ না করার উদ্যোগটি ছিল নিতান্তই ক্ষুদ্রস্বার্থপ্রণোদিত। সবাই নিতান্ত অবস্থানগত কারণে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। তাঁদের সবাই বাংলাদেশের সন্তান, মনেপ্রাণে ও রক্তমাংসে গড়া বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে না পারলেও তাঁদের কারও মনে দেশের স্বাধীনতার প্রতি আন্তরিক সমর্থনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ঘাটতি ছিল না। তাঁদের দেশপ্রেম, মাতৃভূমির প্রতি দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠা নিয়ে সন্দেহ পোষণ, অবজ্ঞা বা খাটো করে দেখা এবং সশস্ত্র বাহিনীতে আত্তীকরণ না করার দাবি বাঞ্ছনীয় ছিল না। দেশের জন্য বা সেনাসহ সব বাহিনীর জন্য তাঁদের বড় সহায়কশক্তি হওয়ার কথা। স্বস্তির বিষয়, বঙ্গবন্ধু ওই উদ্যোগ সমর্থন করেননি। চাপ সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নয় মাসের যুদ্ধে জয়ী হলেও একটি শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল ও দক্ষ সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের জন্য কতটা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় কিছু ছাঁটাইয়ের পর পাকিস্তান-ফেরত অধিকাংশ সদস্যকেই বিভিন্ন বাহিনীতে আত্তীকরণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সিদ্ধান্ত মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। তৎকালীন বৈরী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাব এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের টানাপোড়েনে সশস্ত্র বাহিনীগুলোয়, বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে বিবাদবিসম্বাদ, বিভাজন ও দলাদলি বাড়তেই থাকে। নড়বড়ে হয়ে পড়ে কমান্ড স্ট্রাকচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়তে থাকে।

সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের অভিজ্ঞতা, পরিপক্বতা, কমান্ড কন্ট্রোল (শৃঙ্খলা অন্তর্ভুক্ত) ও দক্ষতা এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ঘাটতি ধরা পড়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নিষ্ঠুর ঘটনার মধ্য দিয়ে। নয় মাসের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেই এবং অতিদ্রুত প্রমোশন পেলেই উচ্চতর দায়িত্বের জন্য সবাই যোগ্য হয়ে যান না। কমান্ড চ্যানেল রক্ষা করে পেশাগত দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার চেয়ে একশ্রেণীর কমান্ডার (মেজর-উর্ধ্ব) ব্যস্ত থাকতেন নিজেদের অনুগত-সমর্থক বৃদ্ধির কাজে। উর্ধ্বতন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেকেরই নিজ নিজ গ্রুপ ছিল। এরই পুনর্বহিঃপ্রকাশ ঘটে চট্টগ্রামে মেজর জেনারেল মঞ্জুরের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে। বেশির ভাগ পাকিস্তান-ফেরত অফিসার চাকরিতে যোগ দিলেও তাঁদের পক্ষে অস্বাচ্ছন্দ্যকর বৈরী পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অপেক্ষাকৃত সিনিয়র অফিসারদেরই সবচেয়ে বেশি মনের কষ্টে সময় কাটাতে হয়েছে। অবশ্য ধীরে ধীরে এমন অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, বৈরী অবস্থার অবসান হয়নি। ওপরের অনুচ্ছেদে যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছি, যাতে ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষা বিষয় তথা সশস্ত্র বাহিনী-বিষয়ক নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নিতে গণতান্ত্রিক সরকার বিস্তারিত আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। কোনো হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে জাতিকে যেন আর কখনো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে না হয়। আমার ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি সম্পর্কে কেউ হয়তো দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, তবে আমি যা দেখেছি, শুনেছি ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, তা-ই এখানে ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরেছি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে প্রয়োজন ছিল ভেদাভেদ ভুলে, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা একাত্ম হয়ে প্রচলিত ধারায় সব স্তরের সদস্যকে নিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী গঠন এবং পরিচালনা করা। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন রাজনৈতিক সরকার যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন আমাদের সেনানায়কেরাও। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ভারত বিভক্তির পর ভারত ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বেশ কিছু অফিসার ও অন্য সদস্যদের আত্তীকরণ করা হয়েছিল দেশের স্বার্থেই। দুই দেশেরই প্রথম সি-ইন-সিরা ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ জেনারেল স্যার ম্যাকডোনাল্ড লোখারট (১৫ আগস্ট-৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৭) ও জেনারেল স্যার রয় বুচার (১ জানুয়ারি ১৯৪৮-১ জানুয়ারি ১৯৪৯) এবং পাকিস্তানে জেনারেল ডগলাস গ্রেসি। স্বাধীনতা লাভের পর দক্ষিণ আফ্রিকাসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশও এই রীতি অনুসরণ করেছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যিটা এই যে, আমাদের পক্ষে তেমন কিছু করা সম্ভব হয়নি।

গণতান্ত্রিক পরিবেশে সশস্ত্র বাহিনী

১৯৯১ সালের পর দেশ নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে শাসিত হচ্ছে। দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নির্দিষ্ট মেয়াদে সরকার পরিচালনা করার সুযোগ পাচ্ছে। জনগণের সচেতনতার ফলে নির্বাচনে কোনো দলই পরপর জেতার সুযোগ পায়নি। তিন তিনটি নির্বাচিত সরকারের আমলে আরও দেখে এসেছি, সামরিক বাহিনীকে নিজ নিজ দলের পক্ষে রাখার নানা কৌশল। তাঁদের নিজ নিজ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীরা প্রকাশ্যেই বলেছেন, প্রমোশন ও পোস্টিংয়ে মেধা ও যোগ্যতাই হবে একমাত্র মাপকাঠি এবং সেনাবাহিনীর বিধিবিধান তাঁরা মেনে চলবেন। কিন্তু তা মানা হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে না, বিশেষ করে ঊর্ধ্বতন

র‍্যাংক ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে। বরং স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়প্রীতি ও 'নিজেদের লোক' বসানোর চেষ্টা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনৈতিকীকরণের ঊর্ধ্বে রাখার নীতি ব্যর্থ হচ্ছে। বাহিনীগুলো সংখ্যায়, পরিসরে, সমরশক্তিতে অনেক উন্নত হয়েছে। সদস্যরা দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভ করছেন। বিভিন্ন দেশে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সুনাম অর্জন করে চলেছেন। চলমান রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির প্রভাবে এ বাহিনীতে যদি শৃঙ্খলায় কোনোভাবে চিড় ধরে, তাহলে তা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। আশা করি, রাজনৈতিক সরকার যে দল, জোট বা মহাজোটেরই হোক না কেন, তারা অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সশস্ত্র বাহিনীগুলোর পরিচালনায় বাস্তবতা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেবে। অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে লক্ষ করছি, স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম দিকে যেসব কারণে ও যে পথে উচ্ছৃঙ্খলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, এত বছর পর অনেকটা সে রকমভাবে না হলেও ভিন্নরূপে তেমন কিছুরই প্রবেশ ঘটার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। সেবার সশস্ত্র বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা বলে বিভক্তি ঘটেছিল। এখনকার বিভক্তি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগত রূপ ধারণ করলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। রাজনৈতিকীকরণের প্রভাব বেসামরিক প্রশাসনের চেয়ে সামরিক বাহিনীতে অনেক বেশি ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহের আশঙ্কা সৃষ্টি করে থাকে। মনে রাখতে হবে, আমাদের অফিসার ও সাধারণ সদস্যরা সবাই রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থান-সচেতন। আরও কখনো চাই না, ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটুক। একজন প্রবীণ সেনা কর্মকর্তা হিসেবে সব পক্ষের স্বচ্ছ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের প্রতি আমার আবেদন, সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে আপনারা সব ধরনের রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে রেখে সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে ব্রতী হন। মনে রাখতে হবে, দেশে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন রাজনৈতিক মহলের কুচক্রীরাই সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষীদের সঙ্গে যোগসাজশে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এমন অবস্থার পরিহারে ভেদাভেদ ভুলে প্রধান দুই রাজনৈতিক পক্ষের পাশাপাশি প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকুল আবেদন রেখে আমি এ বইয়ের সমাপ্তি টানছি।

পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে ফার্স্ট টার্ম ক্যাডেট মনজুর রশীদ খান, ডিসেম্বর ১৯৬১

দুই কোর্সমেটের সঙ্গে, ডিসেম্বর ১৯৬২। বাঁ থেকে শাফায়াত জামিল (মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য বীর বিক্রম খেতাব পান। কর্নেল হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন), মাঝখানে খায়রুল বাসার (মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান বাহিনীর হাতে শহীদ হন)

পাকিস্তান আর্মিতে শেষ ছবি, মার্চ ১৯৭২

সেক্টর কমান্ডার, বাংলাদেশ রাইফেলস
দিনাজপুর সেক্টর, ১৯৭৫-৭৭

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মেজর
জেনারেল, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৬

প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগ এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নিয়োগ-প্রক্রিয়ার একজন সাক্ষী হিসেবে লেখক। বাঁ থেকে নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মুস্তফা, সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দীন খান ও সদ্য পদত্যাগকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদ

রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, ডিসেম্বর ১৯৮৮-১৯৯১

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের শেষ দিন। বঙ্গভবনে তাঁর অফিসে ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের সঙ্গে, ৯ অক্টোবর ১৯৯১। বাঁ থেকে আজিজ আহমেদ-পিএস, লে. ইকবাল-এডিসি, লেখক, ক্যাপ্টেন কামাল রেজা-এডিসি

সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। বাঁয়ে প্রিন্স ফিলিপ ও ডানে প্রয়াত মেজর জেনারেল মোনেম, ১৯৮৪

১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচারের দেওয়া নৈশভোজে, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

এলিসি প্যালেসে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁর দেওয়া নৈশভোজে, ২৮ মার্চ ১৯৮৯

প্যারিসে মালেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের সঙ্গে, ১৩ জুলাই ১৯৮৯

বঙ্গভবনে নৈশভোজে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো, ১ অক্টোবর ১৯৮৯

বাগদাদে ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের নৈশভোজে, ১৪ আগস্ট ১৯৮৯

জেদ্দায় সৌদি বাদশাহ ফুয়াদের সঙ্গে, ১৯৯০

ভ্যাটিকান সিটিতে পোপ জন পলের সঙ্গে, ২০ মার্চ ১৯৯০

লেখকের কোর্সমেট পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মোশাররফের ঢাকা সফরকালে সস্ত্রীক লেখক এবং সস্ত্রীক পারভেজ মোশাররফ, ৩০ জুলাই ২০০২